সুধারানী ও নবীন সন্ন্যাসী

সমরেশ মজুমদার

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — ১৯৬১

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ

দেবাশীষ রায়

সুধারানী ও নবীন সন্ন্যাসী

তিন নম্বরের সুধারানী

সুধারানী দাসী, থ্রি হরিচরণ মিটার লেন, সোনাগাছি, ক্যালকাটা। ইংরেজিতে টাইপ করা ঠিকানাটা একটা সুন্দর খামের ওপর ঝকঝক করছে। পোস্ট অফিসের যে পিয়নটি এপাড়ায় মাঝেমাঝে টেলিফোনের বিল কিংবা মনিঅর্ডারের রসিদ পৌঁছে দিতে আসে তার বয়স অল্প, উৎসাহ বেশী। চিঠিপত্র কদাচিৎই তাকে বিলি করতে হয় এখানে। তিন নম্বরে টেলিফোন নেই, ওবাড়ির কেউ মনিঅর্ডার সম্ভবত করে না বলেই ছেলেটির যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অতএব এই খামটি হাতে পাওয়ামাত্র সে বেশ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ভারতবর্ষের ভেতর থেকে এই চিঠি পোস্ট হয়নি, চিঠিটা এসেছে সাগরপারের দেশ থেকে।

হরিচরণ মিত্র লেন বেরিয়েছে সেন্ট্রাল এভিন্যুর বাসস্টপ থেকে। খানিকটা সোজা গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে ঘোড়ার নালের মত। ওই মোড়ে প্রায় নব্বুই বছরের একটা চায়ের দোকানের নাম 'নেশা'। পিয়নটি এপাড়ায় এলে মাঝে মধ্যে নেশায় বসে চা খায়। দোকানের মালিকের একটু কৌলীন্য আছে। তাঁর পিতামহের নামেই ওই রাস্তার নামকরণ হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। এককালে বেশ কয়েকটি বাড়ির মালিকানা তাঁদের ছিল। রেসকোর্সের কল্যাণে সেগুলো হাত বদল হলেও তিনি রেস-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেননি। কলকাতা বম্বে ম্যাড্রাস, ব্যাঙ্গালোর যেখানেই রেস হোক না কেন ওঁর দোকানে হলুদ বই হাতে চর্চাকারীদের ভিড় বসে যায়। এপাড়ার সমস্ত মেয়ে, দালাল এবং রইসী খদ্দেরকে তিনি চেনেন। ষাট পেরিয়েছে বয়স, চুলের রঙে কালোর বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই, কিন্তু এখনও লাল পাঞ্জাবি এবং আলিগড়ি পাজামা ছাড়া পরেন না। পুলিশ থেকে মাস্তান কোন এক অজ্ঞাত কারণে মানুষটিকে খাতির করে। পিয়নটি প্রয়োজনেই এই মিত্তিরদার সাহায্য নিয়ে থাকে। ভর সকালে সে উত্তেজিত হয়ে হাজির হল নেশায়।

অবশ্য এগারটাকে কলকাতার অন্যত্র সকাল বলা না হলেও এপাড়াতে তো তা না বলে চলবে না। বিবিদের ঘুমই ভাঙ্গে দশটার পরে। অনেক বাড়িতে চায়ের পাট নেই। কেটলি নিয়ে ঝি-এর দল ভিড় জমায় নেশাতে। মিত্তিরদার একটি ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি আছে। তিনি চা ছাড়া অন্য কোন তরল দ্রব্য দোকান থেকে বিক্রী করবেন না।

কর্মচারী দুজন ভিড় সামলাচ্ছিল, মিত্তিরদা ক্যাশে। পিয়নটি সোজা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'দাদা, দারুণ খবর আছে!'

মিত্তিরদা মাথা নাড়লেন, 'বসো। এইড্‌স এখনও এপাড়ায় আসেনি।'

'মানে?' পিয়নটি ঘাবড়ে গেল।

'এইড্‌স ছাড়া আমাদের পাড়ায় কোন খবর হতে পারে না। খিদিরপুরের সেই মেয়ে তো এখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষের জনতার মধ্যে মিশে গেছে।

কলকাতা অবশ্য এখনও তার প্রতিদান টের পায়নি। এপাড়াতে তো নয়ই।' মিত্তিরদার হাত এবং মুখ সমানে চলছিল।

পিয়নটি এতক্ষণে একটু থিতিয়েছে। কায়দা করে প্রশ্ন করল, 'সুধারানী দাসী কে দাদা?'

'সুধারানী? কোন সুধারানীকে চাও? পাঁচজন আছে।'

'ফরেনে আত্মীয় টাত্মীয় থাকে যার।' পিয়নটি গম্ভীর গলায় বলল।

'তিনজনের ফরেনে আত্মীয় আছে বলে শুনেছি। দুজন পাকিস্তানের সময়ে এসেছিল, একজন বাংলাদেশ হবার পর।'

পিয়নটি শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়ল, 'দাদা, বাংলাদেশ নয়, এ খোদ সাগরপারের চিঠি। এসেছে যে সুধারানী দাসীর নামে তিনি থাকেন তিন নম্বর হরিচরণ মিত্র লেনে।'

'তিন নম্বরের সুধারানী? দেখি চিঠিটা।' টাকা পয়সা থেকে মন তুলে মিত্তিরদা হাত বাড়ালেন চিঠিটার উদ্দেশে। খামটি নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে ঠিকানায় নজর রাখলেন। যে কালিতে টাইপ করা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই কিছুর মিশেল ছিল। ফরেনে আজকাল কত না নতুন কায়দা বেরিয়েছে। খামের ওপর সাঁটা টিকিট দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। এ চিঠি এসেছে খোদ প্যারিস থেকে। স্ট্যাম্পটা ভাল করে পড়া না গেলেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্যারিস থেকে সুধারানীকে কে চিঠি দেবে? খামটাকে কাউন্টারে রেখে ছোট তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ মুছলেন মিত্তিরদা। লাভার! এসেছিল বোধহয় কয়েক রাত। রঙ ধরে আছে মনে এখনও, বিদেশে গিয়েও তার জের টানতে চাইছে। তবে সত্যি ব্যাপারটা অভিনব। এ পাড়ার রাতের অতিথিরা একবার বেরিয়ে গিয়ে সম্পর্ক টানতে চায় না। আগেকার দিনে যেটা ছিল গৌরবের এখন তা হয়েছে লজ্জা, ভয়ের। গাড়িওয়ালা বাবুরা নাম্বার প্লেট চিনে রাখবে এই ভয়ে গাড়ি রেখে আসে বাড়িতে। হঠাৎ মিত্তিরদার মনে হল এই সুধারানী দাসীর মুখ তিনি ভাল করে মনে করতে পারছেন না। মেয়েটা দুপুরের শো-তে সিনেমায় যায় না, বাবু ধরতে বাইরে বের হয় না। যতদূর মনে পড়ছে পুলিশ আজ অবধি ওকে তুলে নিয়ে যায়নি কেস লেখাতে। এসবের একটা হলেই তাঁর মনে পড়ে যেত। মুখে কিছু না বললেও পিয়নের কাছে কথাটা চেপে গেছেন তিনি। তিন নম্বরের ঠিক কোন মেয়েটি সুধা তা তাঁর জানা নেই। যদি থাকে তাহলে পাঁচের জায়গায় ছ'জন সুধারানী আছে এপাড়ায়। অবশ্য তিন নম্বর খুব খানদানী বাড়ি। তাঁর পিতার আমলে আলোময়ীর কাছে রইসী আদমীদের ভিড় লেগে থাকত গান শোনার জন্যে। আলোময়ীর মা লীলাময়ী গান শিখেছিল গহরজানের কাছে। সেসব কালোয়াতী গানের সমজদার তখন ছিল। বড় বড় ওস্তাদ খাঁ সাহেবরা কলকাতায় এলেই লীলাময়ীর কাছে আসত সঙ্গত করতে। আলোময়ী সেইসব কালোয়াতী সুর নিয়ে বাংলা গান বেঁধেছিল। রবিঠাকুরের গানও গাইত সেইসঙ্গে। আলোময়ীর মেয়ে সুরবালার যৌবন ছিল সেই পরিমাণে সুর নয়। এখন নিচের তলাটায় ভাড়াটে বসেছে। তিরিশ চল্লিশে ঘন্টা বিকোয় আর পাঁচটা বাড়ির মতনই। কিন্তু দোতলায় ওঠার আগে আছে কোলাপসিবল গেট। সেখানে তিনগুণ দাম না দিলে উঠতে দেবে না সুরবালা।

যৌবন গেছে তবু মেজাজ যায়নি। সেই সুরবালার মেয়ে কি এই সুধারানী? দেখতে হয়।

মিত্তিরদা বললো, 'ওহে, এ পাড়ায় যা কাজ আছে সেরে ফেলে এখানে এস, আমি না দেখিয়ে দিলে তুমি চিনতে পারবে না। দারুণ ঝামেলার বাড়ি।' খামটাকে তিনি ইচ্ছে করেই ফিরিয়ে দিলেন।

পিয়নটি মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কাজে মন বসাতে পারছিলেন না মিত্তিরদা। কোন সুধা? তার মন বলছিল, এ নির্ঘাৎ সুরবালার মেয়ে। সুরবালার মুখ মনে পড়লেই এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। বাবা বলেছিলেন, 'শুয়োরের বাচ্চা, বেশ্যা পাড়ায় বাড়ি বলে চরিত্রহীন হবে? খবর্দার যদি ওই বাড়িমুখো হস তাহলে জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব।' তখন সুরবালার বয়স বড় জোর পনের। মাথা ঘুরে গিয়েছিল ওকে দেখে। মিত্তিরবাড়ির ছেলে বলে খাতির ছিল পাড়ায়। আলোময়ী তাই নিষেধ করেনি বাড়িতে ঢুকতে। কিন্তু একদিন গান থামিয়ে কাছে ডেকে বলেছিল, 'বাবা, সুরোর তো গান হল না চেষ্টা করেও। কি যে হবে ওব জানি না। তবে যাই হোক ওর সর্বনাশ করো না।'

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু উচ্চারণ করেছিলেন বাইশ বছর বয়সে, 'সর্বনাশ মানে?'

'এই বয়সে মনে রঙ ধরলে সারাজীবনেও উঠবে না। এখনও সবুজ হয়ে আছে, তোমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখবে। আমরা বাঈজী নই, বেশ্যা বলতে বাধে। কিন্তু গান গলায় না থাকলে ওকে তো তাই করেই খেতে হবে। তোমার বাবা এমন মেয়েকে ঘরে তুলবেন কেন? তার চেয়ে এক কাজ করো, তোমার বাবাকে বলি একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করতে, তোমাদের সম্পর্কটা ঠিক থাক।'

সেদিন কোন কথা বলেননি। ব্যবস্থাটা মেনে নিতে মন চাইছিল না। তার কদিন বাদে বাবা উগ্র মূর্তি ধারণ করে ওইসব কথা শুনিয়েছিল। তখন এপাড়ায় মিত্তিরদার প্রতাপ সবে জমেছে। ভাল দল জুটে গেছে সঙ্গে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল আলাদা সংসার করার সামর্থ নেই যখন তখন ওবাড়িতে গিয়ে কি লাভ। সুরবালা কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছিল। মিত্তিরদা যাননি। তারপর একদিন স্বয়ং সুরবালা হাজির হয়েছিল দোকানে। বাবা তখন নেই, মিত্তিরদা গুলতানি মারছেন। সটান চলে এসে সুরবালা বলেছিল, 'আমাকে বিয়ে করবে কি করবে না?'

মিত্তিরদা মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন। জবাব না পেয়ে যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গিয়েছিল সুরবালা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দেখা হয়নি। অথচ একই পাড়ায় বাস। একসময় মিত্তিরদার দাপটে পাড়া কেঁপেছে কিন্তু কখনও তিন নম্বরে ঢোকেননি তিনি। মালদার লোকেরা কত বছর ধরে যাওয়া আসা করল, তিনি কোন খোঁজ রাখেননি। অথচ খামটা দেখার পর থেকেই বুকের ভেতর একটা কৌতূহল ফণা তুলছে। এখন তিনি রেস আর 'নেশা' ছাড়া কোন সাত পাঁচে নেই। তবু সুরবালাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আজ।

পিয়নটিকে নিয়ে হাঁটছিলেন মিত্তিরদা। আগে কর্পোরেশন এপাড়ায় নজর দিত, এখন আছে বলেই মনে হয় না। অথচ ইলেকশনের আগে দুটো দলই চাইবে পুরো সোনাগাছি তাদের ভোট দিক। হ্যাঁ, আগে অবশ্য একটা রেওয়াজ

ছিল ভোট হলে বিশেষ একটি দলকেই দিতে হবে। এখন সময় পাল্টেছে। মেয়েরাও বুঝতে শিখেছে। তাদের মুখেও প্রতিবাদের শব্দ শোনা যায়। বাড়িওয়ালি কিংবা মাস্তানের কথায় তারা ব্যালটবক্স ব্যবহার করে না। কিন্তু তাতে হাল বদল হচ্ছে না কিছু। এত পুরোন একটা ব্যবসা যখন কলকাতায় চলছে অথচ তার ধারা পরিবর্তিত হল না।

তবে হ্যাঁ, মেয়েদের চেহারাগুলো পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। আগে সোনাগাছিতে অবাঙালি মেয়ে হাতে গুণে পাওয়া যেত। এখন থৈ থৈ করছে। বাঙালি মেয়েগুলোও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হিন্দীতে গল্প করে। দরজায় দাঁড়ানোর ট্রাডিশন অনেকদিনের তাই বলে খদ্দের রাজী না হলে খিস্তি করতে হবে এ কেমন কথা। যৌবনে হলে মিত্তিরদা এসব সহ্য করতেন না। এখন ততক্ষণই সম্মান পাওয়া যায় যতক্ষণ আগ বাড়িয়ে সেটাকে হারাতে না চাওয়া হচ্ছে। মিত্তিরদা দেখলেন পিন্টো আসছে। পিন্টো এপাড়ার প্রতিষ্ঠিত মাস্তান। গায়ের রঙ ফরসা, মেদহীন দেহ, লম্বা এবং ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। দুবার জেল খেটেছে, থানায় গেছে কয়েকবার। ও ঠিক এপাড়ার ছেলে নয়। এপাড়ার অনেক ছেলেকে বড় হয়ে মাস্তান হতে দেখেছেন। একসময় তার নিজেরও এধরনের কিছু চামচা ছিল। পিন্টো জন্মেছে ইলিয়ট রোডে। চার বছরের ছেলেকে ফেলে মা পালিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় এক জাহাজীর সঙ্গে। পিন্টোর মা জাহাজীদের একটা বারের মক্ষীরানী ছিল। সেই ছেলে কি করে সোনাগাছিতে চলে এসে বড় হয়ে মাস্তানে পরিণত হল তা নিয়ে নানান গল্প। কিন্তু ওর নীল চোখ, ঠাণ্ডা গলায় কথা, ছুরি এবং রিভলভারের হাত ওকে নেতা করে তুলেছে এ পাড়ায়। দূর থেকেই পিন্টো হাত তুলেছিল। ও একা নয়, যখনই হাঁটে দুজন সঙ্গী কম সে কম সঙ্গে রাখে, এখনও রয়েছে। মুখোমুখি হতেই পিন্টো বলল, 'দাদা ভালো?'

'চলছে।' মিত্তিরদা হাসলেন।

'সত্যি আপনাকে দেখে হিংসে হয়। কি স্বাস্থ্য! আপনার বয়সে আমরা ছবি হয়ে যাব।'

'বুড়োমানুষের আবার স্বাস্থ্য! চললে কোথায়?'

'পাঁচ নম্বরে গিয়েছিলাম। একটা নতুন মেয়ে আসতে চাইছে লাইনে। কোথাও তো শালা ঘর খালি নেই। এক একটা ঘর তিনজনে শেয়ার করে ব্যবসা চালাচ্ছে। ছেড়ে গেলে ফিরে এসে ঘর পাওয়া যেখানে অসম্ভব সেখানে নতুন মুরগী ঢুকবে কি করে! বাড়িওয়ালি প্যান প্যান করছিল বলে দিলাম—, ছেড়ে দিন এসব কথা।' পিন্টো হাসল।

'মেয়েটির ব্যবস্থা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দাদা, আপনাকে একটা কথা বলব।'

'বলে ফেল।'

'বিরজুকে আপনি সেল্টার দেবেন না। ও শালা বেইমান। সব বাড়িতে মাল ঝাড়ছে ও। তো ঠিক হ্যায় কিন্তু জালি মাল ছাড়ছে। এটা ওর লাইন তাই আমি কিছু বলছি না। কিন্তু এখন পাউডারে হাত দিয়েছে। এটা তো চলবে না।' পিন্টো মাথা নাড়তে লাগল।

'আমি কাউকে সেল্টার দিই না পিন্টো।'

'আপনি আমাকে বহুৎ ধূর ভাবছেন দাদা। পুলিশ পাউডারের গন্ধ পেয়ে আমার তিনজনকে ধরেছে। আমি থানায় গিয়ে বিরজুর নাম বলতে ও সি বলল আপনি বিরজুর গার্জেন। আপনি থাকতে বিরজু নাকি ওসব করতে পারে না।'

মিত্তিরদা এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দারোগাবাবু বাড়িয়ে বলেছেন। ঠিক আছে, আমি বিরজুর সঙ্গে কথা বলছি।'

: তিন নম্বরের রকে ভর দুপুরেই মেয়ের মেলা। বেশীর ভাগই কুড়ির নিচে। সালোয়ার পাঞ্জাবি আর মুখে পাউডার মেখে গুলতানি মারছে। এদের অনেকেই সকালে এপাড়ায় ঢুকে রাত্রে ফিরে যায়। রাতের ঘর যে মেয়ের তাকে এবং বাড়িওয়ালিকে খদ্দেরের কাছে পাওয়া টাকার অর্ধেক ভাগ করে দিতে হয়। এদের আগমন শুরু হয়েছে কিছুদিন। তিন নম্বরের খানদানীত্ব এরাই ঘুচিয়ে দিতে শুরু করেছে। ওদের দেখে মেয়েগুলো থম ধরেছিল। কেউ একজন সতর্ক করে দিতে এমন ভাব করতে লাগল যেন দেখতেই পাচ্ছে না। মিত্তিরদা পিয়নকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

এক তলায় এখনও বাসি গন্ধ। ছায়া আর নোংরা মাখামাখি। মাঝখানে উঠোনকে রেখে চৌকোণা বাড়ি সটান উঠে গেছে। সেই উঠোনে ছাই, সাবানের ফেনা, কলের জলে থৈ থৈ চাতাল আর গোটা কয়েক বেড়ালের চিৎকার। উঠোনের চারপাশে বারান্দা। সেখানে গা এলিয়ে একটু বয়স্ক মেয়েরা বসে আছে। মিত্তিরদা পিয়নের মুখের দিকে তাকালেন। নজর ঘুরছে। ছোকরা বিয়ে করেনি। তবে কোন কোন মানুষের দর্শনেই সুখ হয়। কলেজের ছেলেরা যেমন ভর দুপুরে এপাড়ার গলিতে গলিতে স্রেফ হাঁটাহাঁটি করতে আসে।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই কোলাপসিবল গেট, সেখানে ভেতর থেকে চাবি মারা। মিত্তিরদা তালা ধরে নাড়তেই আওয়াজ উঠল। ভেতর থেকে একটা গাঁজা খাওয়া মেয়ের গলা জানতে চাইল, 'কে?'

মিত্তিরদা পিওনকে ইশারা করতে সে কোনমতে জবাব দিতে পারল, 'চিঠি আছে।'

তারপরেই একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলেন মিত্তিরদা। মাথায় চুল নেই। থান পরা। কোমর বেঁকেছে। এপাশে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'সাতজন্মে এবাড়িতে চিঠি আসে না। ঠিক দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ। না দেখে কি আসছি?' পিয়নটি এতক্ষণে যেন নার্ভ ফিরে পেল, 'না দেখে আসিনি।'

বৃদ্ধা এবার মিত্তিরদার দিকে তাকালেন, 'একটা চিঠি দিতে দুজন এয়েছ? দাও।'

মিত্তিরদা কিছু বলার আগেই পিয়নটি মাথা নাড়ল, 'ফরেনের চিঠি।'

'কি হয়েছে মোক্ষদা?' ভেতর থেকে যে কণ্ঠস্বরটি ভেসে এল তাতে কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু মিত্তিরদার মোটেই পরিচিত বলে মনে হল না। এই কি তাহলে সুধারানী? মোক্ষদার গলা ততক্ষণে চড়ায় উঠেছে, 'কি বলছে দ্যাখো, কোথাকার নাকি চিঠি। সঙ্গে চা-বাবু এসেছে।'

মিত্তিরদা এবার অস্বস্তিতে পড়লেন। আড়ালে আবডালে এপাড়ার অনেকেই তাকে চা-বাবু বলে চিহ্নিত করে। তাই বলে এমন মুখোমুখি? এবং তখনই

সুরবালা বাইরে বেরিয়ে এল। মিত্তিরদা দেখলেন সুরবালার কালো চুল পিঠে ছড়ানো। শরীর মেদে মজে আছে। কিন্তু সেই মেদ এমন মাত্রাজ্ঞান রেখে সাজানো যে অহঙ্কার মরে যায়নি। পনের কেন তিরিশের চাপল্য উধাও কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তর ঢুকতে পারেনি, ফাঁক না পাওয়ায়। সুরবালার কপালে তখনই হাঁসের পায়ের ছাপ। চোখ যেন চোখের শত্রু। দাঁত কামড়ানো ঠোঁটের দেওয়াল। তারপর গম্ভীর গলায় নির্দেশ এল, 'মোক্ষদা, তালা খুলে দাও।'

এ স্বরে দ্রুত কাজ হল। দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল মোক্ষদা। মিত্তিরদা বললেন, 'এলাম।'

সুরবালা মাথা নাড়ল. 'তাই তো দেখছি।'

কথাটায় যে খোঁচা আছে সেটা বুঝেও উপেক্ষা করলেন মিত্তিরদা। মেয়েরা কখনই ভেবেচিন্তে কথা বলে না। বলার-পর তার মানে দাঁড়িয়ে যায়। বিশেষ করে সম্পর্কটা যদি অভিমানের হয়।

ভেতরে ঢোকার পর সুরবালা এগিয়ে গেল। মিত্তিরদা আবার বললেন, 'খুব অসময়ে এসেছি যদিও—।'

'তোমার সময়জ্ঞান আছে জানতাম না তো!' চমৎকার একটা ফরাস বিছানো ঘরে ঢুকে কথা বলল সুরবালা। মিত্তিরদা চকিতে পিওনটির দিকে তাকালেন। ছোকরা আবার কি ভাবছে কে জানে। আবেগের ঘোরে এখন না এলেই ভাল হত। হাত দেখিয়ে বসবার ইঙ্গিত করে সুরবালা সামান্য তফাতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসল। মিত্তিরদা আরাম করে বসে বললেন, 'এটি সরকারী কর্মচারী। চিঠি বিলিয়ে বেড়ানো কাজ। আমায় বলল তিন নম্বরের সুধারানী দাসীর নামে চিঠি এসেছে। কৌতূহল হল। সুধারানী কি তোমার মেয়ে?'

সুরবালা বড় বড় চোখ মেলে মিত্তিরদাকে দেখল, 'কৌতূহল কেন?'

মিত্তিরদা এবার হাসলেন, 'এই বাড়িতে ঢোকার পর সেই কেনটা নিজের কাছেই জানতে চাইছি।'

মাথা নাড়ল সুরবালা। তার মানেটা অস্পষ্ট। মুখে বলল, 'সুধারানী আমার মেয়ে নয়। মেয়ের মতন। আমার কোন ছেলেপুলে নেই। নেই মানে হতে দিইনি।'

'ও!' শব্দটা আচমকা বেরিয়ে এল মুখ থেকে। মন অন্যদিকে ঘোরাতে চাইলেন মিত্তিরদা। এর জন্যে তাঁর কি দায়িত্ব থাকতে পারে? সুরবালার যৌবনে হলুদ রঙ লেগেছে। ভরন্ত শরীরে যদিও এখনও মোটা বাঁক নজর কাড়ার জন্যে তৈরী, তবু ইচ্ছেটা হলেও ঈশ্বর সদয় হবেন না। নিজের বয়সের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে মিত্তিরদা সে ব্যাপারে নিশ্চিত। ততক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা পিওনটির দিকে হাত বাড়িয়েছে সুরবালা, 'কই দেখি।'

পিওনটি দিতে পেরে বেঁচে গেল যেন। সুরবালা আধা লম্বা খামটি দেখে বলল, 'ওমা, এ যে বাংলায় লেখা নয়। সুধাকে আবার ইংরেজিতে চিঠি লিখবে কে? সুধার নাম তো ওপরে?'

প্রশ্নটি পিওনকে। সেই ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ। সুধারানী দাসী। এসেছে প্যারিস থেকে।'

'কোত্থেকে?' সুরবালা বুঝতে পারেনি।

'প্যারিস। ফ্রান্স দেশের রাজধানী।' পিওনটি জবাব দিল। কিন্তু তার চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

'প্যারিস। নামটা খুব শোনা শোনা। সিনেমা এসেছিল। হ্যাঁ। শর্মিলা ঠাকুর ছিল। দেশটা কোথায়?'

'ওই যে বললাম, ফ্রান্সে। যার চিঠি—।'

'তাকে আমিই দিয়ে দেব। আমার মেয়ে।'

'মেয়ে? এই বললেন আপনার মেয়ে নেই।'

'শিষ্যদের কাছে যেমন সব গুরুই বাবা আমিও ওদের কাছে মা। ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন ভাই। মোক্ষদা।' ডাকটা পাওয়ামাত্র বৃদ্ধা এসে দাঁড়াল। সুরবালা বলল, 'এঁকে যত্ন করে নিচে পৌঁছে দিয়ে এস। দেখো উচ্চিংড়েগুলো যেন মুখ সামলে থাকে।'

মিত্তিরদা উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুরবালা তার স্বাস্থ্যবতী হাত তুলে নিষেধ করল। 'তুমি চললে কোথায়? তোমার দোকানে তো ভরদুপুরে মাছিও ঢুকবে না! বসো।'

'না চলি। অন্য কাজ আছে।' মিত্তিরদা উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি জানি এপাড়ায় তোমাব কথাই একসময় শেষ কথা ছিল। এখনও মান্যি করে সবাই। তবে সেটা আমার দরজার বাইরে। এসেছ নিজের ইচ্ছেয় যাবে আমি অনুমতি দিলে।' সুরবালা মোক্ষদাকে ইশারা করতে সে পিওনটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

মিত্তিরদার মুখে রক্ত জমেছিল। বললেন, 'হাঁটুব বয়সী ছোকরার সামনে এভাবে অপমান না করলেই হত।'

'অপমান? ওমা! সে কখন করলাম।' হাসল সুরবালা, 'বসতে বলছি বসো। সারাজীবন যে অপমান নিয়ে বসে আছে তাব কাছে আর কি আশা কর!'

অগত্যা মিত্তিরদা বসলেন। খামটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল সুরবালা। রেখে দিয়ে বলল, 'কি খাবে বল? সরবত? মিষ্টি?'

'ওসব বারণ। ব্লাড সুগার আছে।'

'এপাড়ার কোন মেয়েছেলের ঘরে কখনও গিয়েছ বলে তো শুনিনি। তা বউ মারা যাওয়ার পর বিয়ে করোনি কেন? সুগার হোক আর লবণ হোক, স্বাস্থ্য তো খাবাপ নয়।'

'ঝামেলা আর ভাল লাগল না।'

'বুড়ো বয়সে কে দেখবে?'

'তোমাকে কে দেখবে?'

'পয়সা। সল্ট লেকে বাড়ি করেছি। সামনেব মাসে উঠে যাব।'

'ব্যবসাপাত্তি?'

'এখন তো খুব পুরোন লোক না এলে বসি না। যা আসে মেয়েদের ভাড়া থেকে। ব্যাঙ্কে তো পচছে, তাই দিয়ে চলে যাবে।' সুরবালা শরীর এলিয়ে দিতেই চোখ সরিয়ে নিলেন মিত্তিবদা। নিয়ে বললেন, 'যৌবন তো বাঁধের এপারেই আছে। এখনই বৈরাগ্য।'

'যেদিন তুমি ফিরিয়ে দিয়েছিলে সেদিন থেকেই আমি বৈরাগী। খদ্দের এলে

ভাবতাম আমি হলাম জল, মাছ সাঁতার কাটছে। নদীর জল কখনও আমিষ হয় ? তা তোমার তো সবই রেসের মাঠে আর শরিকে গেছে। দেখবে কে ? ছেলে দুটো তো সভ্য হয়ে পাড়া ছেড়েছে।'

'দোকানটা তো আছে।' মিত্তিরদা হাসলেন, 'অনেকদিন পরে কথা বলে খুব ভাল লাগল।'

'কেমন দেখছ আমাকে ?' কিশোরীর মত মুখ করল সুরবালা।

'একই রকম। তখন এক বলকা ফুটেছিলে, এখন ঘনসর নিয়ে বসে আছ। দুধ দুধই। চলি আজ।'

'মাথা খারাপ। এই দিনটার জন্যে হাঁ করে বসে আছি এতকাল আর যাই বললেই হল ?' সুরবালা চিঠিটা আবার তুলে নিয়ে বলল, 'লক্ষ্মী হয়ে বসো।'

অগত্যা মিত্তিরদাকে বসতে হল। আজ এতদিন পরে সুরবালাকে দেখতে তাঁর খারাপ লাগছিল না। চোখ বোলালেই বোঝা যায় বেশ আরামে আছে। ওসব বৈরাগী হওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে জীবনের কতটা মিল তা ঈশ্বরই জানেন।

মিত্তিরদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুধারানীকে তুমি দত্তক নিয়েছ ?'

'দত্তক ঠিক নয়। একমাস বয়স যখন তখন থেকে আমার কাছে। অতীত আর খুঁড়তে যাইনি। গান বাজনা এ বাড়িতেই শিখেছে। তখন মা বেঁচে ছিল, মা ওকে সব দিয়ে গেছে যা পেয়েছিল দিদিমার কাছ থেকে। আমার তো গলায় সুর নেই।' সুববালা জানাল।

'তোমার যা আছে তা আবার অনেকেরই নেই।' মিত্তিরদা হেসে বললেন।

'তেল দিও না। এই বয়সে তেল পেলে পিছল হব ভাবছ কেন ? যে কথা বলছিলাম, মেয়েটা ভাল। একটু বেশী ভাল। তবে মুশকিল, যারা ওর গান পছন্দ করে না তাদের সঙ্গে কিছুতেই শুতে চায় না। আর আজকাল লোকে চায় হিন্দী সিনেমার গান শুনতে। খ্যামটা, খেউড়, বিধুবাবুর গান, রবিবাবুর গান কে শুনবে ? তবু আসে। দুচারজন আছেন। মেয়ে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট। আমি তো বলি, যদ্দিন আছি চালিয়ে যা। যখন এপাড়া থেকে বিদায় হব তখন না খেয়ে মরবি এভাবে চালালে। মোক্ষদা, সুধাকে ডেকে দাও।' সুরবালার চোখ বারান্দায় ছিল। বৃদ্ধাকে ওপাশে চলে যেতে দেখলেন মিত্তিরদা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সল্ট লেকের বাড়িতে কে থাকবে সঙ্গে ?'

'ওমা! কে থাকবে ? কেউ না।' খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সুরবালা, 'তোমার ওই চায়ের দোকান যদি বিক্রী করে দিতে পারো তাহলে তোমাকে সঙ্গী করতে পারি।'

মিত্তিরদাও হাসলেন, 'দুদিন বাদে তাড়িয়ে দিলে না খেয়ে মরব। পাগল!'

এইসময় একটি বছর বাইশের মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল। মিত্তিরদার মনে হল এই মেয়ে এখানে না থেকে যদি জোড়াসাঁকোয় থাকত বেশী মানাতো। রবিবাবুর উপন্যাস দু-একটা পড়েছেন তিনি বেশী বয়সে। তার নায়িকার মত দেখতে। লক্ষ টাকা বাজী রাখা যায়, কেউ বলতে পারবে না এই মেয়ে সোনাগাছির। সুধারানী বলল, 'ডেকেছ মাসীমা ?'

'এই হল আমার মেয়ে। তাকিয়ে দ্যাখো। কোন মিল পাও ?' সুরবালা হাসছিল।

কি জবাব দেবেন মিত্তিরদা। সুরবালা বলল, 'একে চিনিস সুধা ?'

'দেখেছি কয়েকবার।' গলাটি ভারী মিষ্টি মেয়ের।

'দেখা আর চেনা এক নয়। এই হল সেই মানুষ—থাক গে। নাই বা শুনলি। তোর চিঠি এসেছে।'

'চিঠি ? আমার ?' বিস্ময়ে চোখ ছোট হয়ে এল সুধারানীর। ততক্ষণে খামটা ওর হাতে তুলে দিয়েছে সুরবালা। সুধারানী সেটা উল্টে পাল্টে দেখে বলল, 'এতো ইংরেজিতে লেখা। ইংরেজিতে আমায় কে চিঠি দেবে ? তোমরা ঠিক পড়েছ তো ?'

'ওপরে ইংরেজি ভেতরে বাংলা হয়তো। খুলে দ্যাখ।'

সুধারানী সন্তর্পণে খামটি খুলল। তারপর পুরু কাগজে টাইপ করা একটা চিঠি বের করল। খানিক দেখে সে হাঁটু মুড়ে বসল সুরবালার পাশে, 'ও মাসীমা, আমি যে ছাই মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। পুরো চিঠি ইংরেজিতে লেখা।'

চিঠিটা টেনে নিয়ে নজর বোলালো সুরবালা। তারপর বলল, 'দ্যাখো দিকিনি, কি লিখেছে।'

রেসের বই-এর বাইরে ইংরেজি পড়ার অভ্যেস নেই মিত্তিরদার। তা সেখানে লেংথ, শর্ট হেড, গ্যালপ শব্দগুলো থেকে অনেক কিছু মানে আপনা আপনি মাথায় এসে যায়। তবু চিঠিটা নিলেন তিনি। ওপরে লেখা রয়েছে, 'ইন্টারন্যাশন্যাল কনফারেন্স অন মেল বিহেভিয়ার ইন রেড লাইট এরিয়া।'

মিত্তিরদার গলা শুকিয়ে গেল। এ আবার কি। তিনি ঠিকানাটা পড়লেন। দু-তিনটে নম্বর, তারপর সাঁজেলি, প্যারিস, ফ্রান্স এবং আরও কয়েকটা নম্বর।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু উদ্ধার হল ?'

মিত্তিরদা বললেন, 'ফরাসী ইংরেজি তো, ধরতে কষ্ট হচ্ছে। ইংরেজের ইংরাজি পড়েছি ছেলেবেলায়। তবু ওপরে লেখা আছে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে যেখানে ব্যাটাছেলেদের ব্যবহার, মানে রেডলাইট এরিয়া অর্থাৎ খারাপ পাড়া যাকে বলে, এখানে ওদের ব্যবহার নিয়ে সম্মেলন হবে। তারপরেই সুধারানী দাসীর নাম আর এই ঠিকানা লেখা রয়েছে।'

সুরবালা উঠে বসল, 'কি বললে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। সম্মেলনটা কাদের। কারা করছে। আর এত জায়গা থাকতে সুধার কাছে ওরা চিঠি পাঠাল কেন ? ব্যাটাছেলেরা কি ব্যবহার করে তা তো সবার জানাই আছে। ফেলে দাও ও চিঠি।'

মিত্তিরদা সজোরে মাথা নাড়লেন, 'না, না, ফেলে দেওয়া উচিত হবে না। আমার অভ্যেস নেই বলে, মোটামুটি ইংরেজি ভাল পড়তে পারে এমন কাউকে ডেকে আনলে সব জানা যেত।'

'এ পাড়ায় পড়াশুনা জানা লোক আছে নাকি !'

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল মোক্ষদা আগ বাড়িয়ে বলল, 'সাতাশ নম্বরের মেমসাহেব শুনেছি কলেজে পড়ত।'

'রাখ। তার কাছে আমি যাব ইংরেজির মানে জানতে ? সেইসঙ্গে গলায় দেবার দড়ি কিনে আনতে হবে।'

ঘেন্নায় মুখ বেঁকাল সুরবালা। মিত্তিরদা বললেন, 'তার চেয়ে এক কাজ করা

যাক। চিঠিটা আমাকে দাও। আমি কাউকে দিয়ে পড়িয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এসে ফেরত দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছি।'

সুরবালা হাসল, 'পালাবার ছুতো পেলে। ঠিক আছে, এক ঘণ্টার মধ্যে এসো কিন্তু। নইলে আমি মোক্ষদাকে দোকানে পাঠাবো। ওর জিভে যা শব্দ আছে শুনলে তোমার দোকানের বিক্রী বেড়ে যাবে।'

দোকানে ফিরে এসে ফাঁপড়ে পড়লেন মিত্তিরদা। আশেপাশের একটাও লোক পাচ্ছেন না যাকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে বিশ্বাসযোগ্য মানে বের করা যায়। এইসময় বিরজুকে দেখতে পেলেন তিনি। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌টোর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একটা কর্মচারীকে পাঠালেন বিরজুকে ডেকে আনতে। পিন্‌টো। ব্যাটা নাকি ইলিয়ট রোডের স্কুলে সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। তাছাড়া ওব মা ছিল ন্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ইংরেজি মাতৃভাষা। মিত্তিরদা আব একজন কর্মচারীকে পাঠালেন পিনটোর সন্ধানে। বিরজু দোকানে ঢুকে গলা তুলে বলল, 'নমস্কার দাদা। থানা থেকে আসছি। ও সি আপনার খুব সুনাম করছিল। আমি বললাম দাদা আছেন বলে এখনও সোনাগাছিতে শান্তি আছে। চা হবে?'

'বিরজু, তোমার সঙ্গে আমাব কথা ছিল।'

'কি ব্যাপাব? কেস একটু গোলমাল মনে হচ্ছে।'

'তুমি পাউডার বিক্রি করো?'

বিরজু বসতে যাচ্ছিল, উঠে দাঁড়াল, 'কোন শালা আপনার কাছে এসব লাগিয়েছে?'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।'

'দেখুন দাদা, আমি সমযের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি। পাবলিক যা চাইবে তা আমি দিতে না পারলে আব একজন দেবে। আমি ভোগে যাব। সতের টাকার বিয়ারটা বাইশ টাকা যখন সাপ্লাই করি তখন তো কেউ বলে না কেন ব্ল্যাক করছ? কারণ মেয়েগুলো বাইশে কিনে চব্বিশে বিক্রী করে খদ্দেরের কাছে। আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

'তুমি এখন থেকে থানায় আমার নাম কববে না।'

'কোন শালা চুকলি কেটেছে. নামটা বলুন।'

'নাম বললে কি করবে?'

'দেখতে পাবে সবাই।'

'ও সি জানে তুমি পাউডার বিক্রী করো?'

'না।'

'তাহলে হয ওটা বন্ধ কবো, নয আমার নাম করো না।'

'শালা পিনটো! পিন্‌টো আপনার কাছে এসেছিল?'

'আসেনি। তবে তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'আপনি আমার সঙ্গে বেইমানি করছেন দাদা।'

শব্দটা শোনামাত্র মাথায় রক্ত উঠে গেল মিত্তিরদাব। অনেক কাল আগের বাঘটা যেন আচমকা জেগে উঠল খোঁচা খেয়ে। চট করে ড্রয়ার থেকে ছয়ইঞ্চি ছুরি বের করে বললেন, 'ক্ষমা চা বিরজু। মিত্তির কখনও বেইমানি শব্দটা সহ্য

করে না। ক্ষমা চা নইলে হাড় ফুঁড়ে যাবে।'

মিত্তিরদার চোখের দিকে তাকিয়ে অগ্রাহ্য করতে চেয়েও পারল না বিরজু। ওর মনে হল এখনই ছুরিটা তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। সে মাথা ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে, ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আপনি চুকলি শুনে আমার ওপর ক্ষেপে গেলেন। ওই হারামীটা আমার মালের ব্যবসাটা হাতাতে চেয়েছিল, পারেনি। পাউডারের বিজনেস আমি নিজের হাতে করি না। ঠিক হ্যায়, আপনি যখন বলছেন আমি কিছুদিন বন্ধ রাখব। তবে সেই সুযোগে কেউ যদি লাইনে ঢুকতে চায় তবে তাকে আমি আপনার সামনে আনব। দেখি, তখন কি করেন।' বিরজু দ্রুত পায়ে চলে গেল।

দোকানে যে কজন দাঁড়িয়ে ছিল তারা চোখ বড় করে দেখছিল। সত্যি ছুরি হাতে মিত্তিরদাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। বিরজুর মত শের ওঁকে দেখে ভয় পেয়েছে এটা কম কথা নয়। নিজেকে সামলে নিতে বড় কষ্ট হচ্ছিল মিত্তিরদার। খামোকা এত উত্তেজিত হবার কোন মানে হয় না। তিনি যদি ছুরি ছুঁড়তে বাধ্য হতেন তবে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হত। হয় থানা নয় বিরজুর বদলার শিকার হতে হত। কেন ? কোথায় কে কি করছে তা ভেবে এখন কি লাভ! ছুরিটা ভেতরে ঢোকাবার আগেই পিন্‌টো এসে হাজির হল, 'ইয়েস বস! কি ব্যাপার ?'

'বিরজু পাউডার বিক্রি বন্ধ করলে তুমি লাইনে ঢুকবে নাকি ?' খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মিত্তিরদা। পিনটো সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'হারামীটা তাই বলে গেল নাকি ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'তা আমি বলতে পারছি না। মানুষের আজ কোন মতলব মাথায় আসে তা বলা যায় !'

'তাহলে তোমাকে দাম দিতে হবে। বিরজু বন্ধ করছে কিন্তু কেউ খুলতে পারবে না।'

'ও শালা আপনাকে ভড়কি দিয়েছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ঠিক চালিয়ে যাবে।' কথাগুলো বলতে বলতে পিন্‌টো সরে দাঁড়াল থামের আড়ালে। মিত্তিরদা দেখলেন একটা পুলিশের জিপ সামনে দিয়ে টহল মেরে গেল। মিত্তিরদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমায় খুঁজছে ?'

'না।' হেসে ফেলল পিন্‌টো, 'তবে জিপ দেখলে, সরে যাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

মিত্তিরদা বললেন, 'পিন্‌টো। তুমি ইংরেজি জানো ?'

'কি বলছেন দাদা। ওটা আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ।'

'পড়তে জানো ? খটমট শব্দ ?'

'কেন বলুন তো ?' পিন্‌টো খুব অবাক হচ্ছিল। মিত্তিরদা এবার তার দিকে খাম খুলে চিঠিটা বের করে এগিয়ে ধরলেন, 'এটা জোরে জোরে পড়ে আমাকে মানে বলে দাও দেখি।'

পিন্‌টো হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলেই বলে উঠল, 'আরে ব্বাস !'

'কি হল ?' মিত্তিবদা ঝুঁকে পড়লেন।

'এই সুধারানী দাসী কে ?'

'যেই হোক। কি লিখেছে পড়ে ফেল।'

পিন্‌টো মনে মনে যতই চিঠিটা পড়ছে ততই উত্তেজিত হচ্ছে। ওর মুখ দেখেই মিত্তিরদার মনে হল চিঠিতে দারুণ কোন ব্যাপার আছে। দুবার চিঠিটা পড়ল পিন্‌টো। তারপর লাফিয়ে একটা টেবিলের ওপর উঠে বসে চিৎকার করে বলল, 'এই চিঠিতে কি লেখা আছে জানেন ? শুনলে সারা দুনিয়া তাজ্জব হয়ে যাবে। আমার মাথা ঘুরছে দাদা।'

'কি লেখা আছে সেটাই পড়ে শোনাতে বলছি তোমাকে !' মিত্তিরদা নিজের জায়গা ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। চিঠিটা আবার চোখের সামনে তুলে লাইনগুলোর অনুবাদ করে যেতে লাগল পিন্‌টো। 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন মেল বিহেভিয়ার ইন রেড লাইট এরিয়া। মানে, এপাড়ায় এসে খদ্দেররা যেরকম ব্যবহার করে তাই নিয়ে আলোচনা করতে প্যারিসে একটা মিটিং হবে। সেই মিটিং-এ নিজের নিজের দেশের খদ্দেরদের সম্পর্কে বলবার জন্যে পৃথিবীর কুড়িটা উন্নত এবং আধা-উন্নত দেশের মেয়েদের ইনভাইট করা হচ্ছে যারা এই ব্যবসা করে। এই কুড়িটা দেশের শরীর বিক্রীব্যবসার ওপর একটা দল খোঁজ খবর নিয়েছে গত দুবছর ধরে। তারা মনে করছে এই নিয়ে কুড়িটা দেশের মেয়েদের এক জায়গায় বসে আলোচনা করার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। ইন্টারন্যাশন্যাল মানবকল্যাণ সমিতির মেয়েদের শাখা এই কনফারেন্সের ব্যবস্থা করছে। সুধারানী দাসীকে ওরা ইন্ডিয়া থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে কারণ তার মধ্যে এদেশের পুরোন, কি বলে শব্দটা, ট্রাডিশনের বাংলা কি, ওই মানে, থাকগে, কালচার আছে। সুধারানীর এখান থেকে প্যারিসে যাওয়ার আসার খরচ এবং সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সমিতি করবে। শুধু তাই নয়, সেখানে যাওয়ার জন্যে যদি সুধারানী একজন এসকর্টের দরকার মনে করে তারও খরচ ওরা দেবে। কনফারেন্স হবে সামনের মাসের বাইশ তারিখে। যদি সুধারানী যেতে রাজী থাকে তাহলে ওরা ভিসার জন্যে কাগজপত্র এবং প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবে।' মুখ তুলল পিন্‌টো, 'ভাবা যায় না।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে মিত্তিরদা অনুবাদ শুনছিলেন। এবার শুকনো গলায় কোনমতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই পিন্‌টো, তুমি ইয়ার্কি মারছ না তো ? ওসব কথা লেখা আছে চিঠিতে ?'

পিন্‌টো একটু আহত হল, 'কি বলছেন দাদা, আপনার সঙ্গে আমি ইয়ার্কি মারছি ? আর এই ব্যাপার নিয়ে ? সুধারানী দাসীকে সোনাগাছির খদ্দেরদের সম্পর্কে বলবার জন্যে প্যারিসে ইনভাইট করেছে। ভাবা যায় ? এতদিন শুনেছি বড় বড় পণ্ডিতরা বিদেশে বক্তৃতা করতে যায়, এখন দেখছি একটা খানকীকে ডেকে পাঠিয়েছে !

শব্দটা খুব কানে লাগল মিত্তিরদার। তিনি জোর গলায় প্রতিবাদ জানালেন, 'না। তুমি যা বললে সুধারানী কখনও তাদের দলের নয়। কতটা জানো হে ছোকরা সোনাগাছির ? জানো, এখানে একসময় মেয়েরা শুধু নাচ আর গানে খদ্দেরের মন ভরাতো, বিছানায় শুতো না তারা। হাজার টাকা দিলেও না। এই যে বিশাল সোনাগাছি তার কোন বাড়িতে কি হচ্ছে তা জানো ?'

মিত্তিরদা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে নিতেই পিন্টো বলল, 'ও রকম সতী কেউ নেই এখানে। থাকলে জানতাম। মাছিও বসত না সে-বাড়িতে। আর আপনার সুধারানী যদি খদ্দের না শোওয়ায় তাহলে ওখানে কি মুখ দেখাতে যাবে ? কি বলবে এখানকার কথা ?'

আপনার সুধারানী শব্দ দুটোয় ভাল লাগল মিত্তিরদার। সুধারানী সতী নয় কিন্তু ওর দিকে তাকালে খানকী বলে ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু এত বড় ব্যাপার হতে চলেছে, যাকে বলে সোনাগাছির ইতিহাসে যুগান্তর ঘটতে যাচ্ছে, এখনই সুরবালাকে এটা জানানো দরকার। তিনি কর্মচারীকে বলেন, 'আমি একটু ঘুরে আসছি।' তারপর পিন্টোকে প্রায় উপেক্ষা করে দোকান ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। কিন্তু পিন্টো তার সঙ্গ ছাড়ল না, 'দাদা, একটা কথা বলব ?'

'কি কথা ?' বেজার মুখে বললেন মিত্তিরদা। পিন্টো তার সঙ্গে এই মুহূর্তে হাঁটুক তিনি চাইছিলেন না। পিন্টো বলল, 'সুধারানীকে একবার দেখব। জাস্ট এমনি দেখা আর কি !'

'নাম্বারটা তো জেনেছ, গিয়েই দ্যাখো।'

'না দাদা। আজ আপনার সঙ্গে গেলে স্পেশ্যাল খাতির পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু ওদের সিঁড়িতে তালা দেওয়া থাকে। অজানা লোককে কিছুতেই ঢুকতে দেয় না।'

'আপনি থাকলে ওসব প্রব্লেম হবে না। আরে দাদা, আমি মাস্তান হতে পারি কিন্তু একটু আধটু ইংরেজি তো জানি। যদি এই চিঠির জবাব লিখতে হয় তো আমিই লিখে দিতে পারি।' পিন্টো হাসল। কথাটা মনে ধরল মিত্তিরদার। কিন্তু এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরাকে তাঁর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওবাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করলে আবার কি হুজ্জত হবে কে জানে ! তার ওপর সুরবালার পছন্দ অপছন্দ আছে। তিনি বললেন, 'এক কাজ করো। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকো। যদি দরকার হয় ডেকে পাঠাবো।'

পিন্টো হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল, 'পাবলিকের কাছে বেইজ্জত হয়ে যাব দাদা। আমাকে দাঁড়াতে দেখলে পাবলিক ভাববে নিশ্চয়ই কোন ধান্দা আছে। আর ভেতর থেকে ডাক আসবে বলে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি একথা রটে গেলে সোনাগাছিতে আমার আর করে খেতে হবে না। যদি দরকার হয় পরে এসে খোঁজ নিয়ে যাব দোকান থেকে।' কথাটা শেষ করে পিন্টো হন হন করে হাঁটতে লাগল উল্টোমুখে।

মোক্ষদা এবার বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'সুরোদিদি কলে গিয়েছে। বাইরের ঘরে আরাম করে বসতে পারো ইচ্ছে হলে। আজ লক্ষ্মীবার, সুরোদিদি বাইরের বাবু বসায় না।'

একা ঘরে মিত্তিরদা দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখলেন। গোটা পাঁচেক মহিলার ছবি। তিনি আলোময়ীকে চিনতে পারলেন। পাতা কাটা চুল, টানা চোখ। বাকি চারজনের একজন নিশ্চয়ই লীলাময়ী। অন্যেরা কি আরও আগের। হঠাৎ মিত্তিরদার মনে হল ভাগ্যিস এবাড়ি বিকরী করে দিচ্ছে সুরবালা, নইলে দেওয়ালে একসময় তার ছবিও ঝুলত।

ছায়ার মত ঘরে কেউ দাঁড়িয়েছে এসে এমন অনুভূতি হওয়ামাত্র চোখ

ফিরিয়ে মিত্তিরদা সুধারানীকে দেখতে পেলেন। সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'কি লেখা আছে চিঠিতে ?'

'তুমি, তোমাকে ওরা জানল কি করে ?' উত্তেজিত মিত্তিরদা প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'কারা ? কাদের কথা বলছেন ?' হকচকিয়ে গেল সুধারানী।

'ওই যে, ফরাসী দেশের মানুষেরা। যারা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে।'

'নেমন্তন্ন করেছে ? আমাকে ? কি বলছেন ?'

'বলছি সব বলছি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা দাও।'

'ফরাসী দেশ ? সেটা কোথায় ? বিশ্বাস করুন সেদেশের কোন লোককে আমি জানি না।'

'শোন। প্যারিস হল ফরাসী দেশের রাজধানী। সেখানে একটা বিরাট সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলনে এইসব পাড়ায় এলে লোকেরা কিরকম ব্যবহার করে তার ওপর বক্তৃতা হবে। তোমাকে এই সোনাগাছির খদ্দের সম্পর্কে বলতে হবে। কলকাতা থেকে প্যারিসে যাওয়া আসার সমস্ত খরচ ওরা দেবে। কেউ কাউকে বিনি পয়সায় দিল্লী নিয়ে যেতে চাইলে সুযোগ ছাড়ে না আর এতো প্যারিসে। প্যারিস হল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।' মিত্তিরদা থামলেন।

'এসব কথা ওই চিঠিতে লিখেছে ?'

'হ্যাঁ। সামনের মাসের বাইশ তারিখের মধ্যে ওখানে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। এদেশের পুরোন দিনের গান ওখানে গাইতে হবে। তুমি ভাবতে পার এই সোনাগাছির আর কাউকে না বলে ওরা তোমাকে যেতে বলেছে! এটা—এটা একটা বিরাট সম্মান।' মিত্তিরদা উত্তেজিত।

ঘুরে দাঁড়াল সুধারানী, 'ওরা নাম ভুল করেছে। আর না করলেও আমি যাব না।' বলে চলে গেল সে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন মিত্তিরদা। হঠাৎ তাঁর মনে হল বাঁদর সত্যি মুক্তোর মূল্য বুঝতে পারে না। নইলে বিদেশে বিনিপয়সার বেড়ানোর সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে ?

'যাক এসেছ তাহলে। আমি ভাবলাম—।' সুরবালা মাথা হেলিয়ে দুই গালের দেওয়াল দাঁতে চেপে চুলের গোছা পিঠময় ছড়িয়ে দিল। মিত্তিরদা মুগ্ধ হলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল পনের বছর বয়সে মেয়েরা মেয়ে হয় না। মেয়ে হবার জন্যে তিরিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাদের। আর চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর যে মেয়ে নিজের শরীর যত্নে রাখে তাকেই ভরাট মেয়ে বলে মনে করা উচিত। বিশের খটখটে ব্যাপারটা চল্লিশে ঢলঢল হয়ে যায়। এই যেমন সুরবালা। সুরবালার শরীরে এখন স্নানের পরে একটা আলখাল্লা। অবশ্য একটু এদিক হলে সেমিজ বলা যেত। সোনাগাছির কোন মেয়ে ওই বয়সে আলখাল্লা পরে কিনা মিত্তিরদার জানা নেই। কিন্তু পায়ের ডিম আর হাতের গড়ন দেখলে কে বলবে এই মেয়ে জীবনভোর শুধু নতুন পুরুষের সঙ্গে রাত জেগেছে। এত করেও শরীরে উগ্রতা নেই, মুখে রুক্ষতা আসেনি, এ কম কথা নয়। বেশীর ভাগ মেয়ের তো এখন মুখে মেচেতা পড়ে যায়। প্রায় গা ঘেঁষে বসে তাকিয়া টেনে নিয়ে সুরবালা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গো, তুমি কি এখনও আমাকে ভালবাস ? আমার মনে হয় বাসো। তা ভালই যদি বাসো তাহলে এত কাছে থেকেও এতদিন এ বাড়িতে পা দাওনি কেন ? আমার তো প্রতিজ্ঞা ছিল

তুমি না এলে আমি চিনবই না। যাই বলো, তোমরা পুরুষেরা এক এক জন তিন নম্বরী মাল।'

জিনিসটা কি প্রশ্ন করলেন না মিত্তিরদা। কথা ঘোরাবার জন্যে হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'এতে কি লেখা আছে জানো ? সুধারানীকে প্যারিসে যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করেছে। সেখানে মনে হয় সবদেশের ইয়ে, মানে তোমাদের মত মেয়েদের একটা সম্মেলন হবে, সেখানে বক্তৃতা করতে হবে, গান গাইতে হবে। এটা একটা দারুণ সম্মান।'

'তোমার কি বায়ু কুপিত হয়েছে ? কি যা তা বলছ ?'

'কি আশ্চর্য ! এইসব কথাই লেখা আছে।'

'কি লিখেছে ঠিক করে বল তো ?'

অতএব মিত্তিরদা পিন্‌টোর মুখে যা যা শুনেছিলেন তাই উগরে দিলেন। তারপর জুড়ে দিলেন, 'তোমার মেয়ে এদেশের একমাত্র মেয়ে হিসেবে হয়তো যাচ্ছে। আমার না খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের সমস্যার কথা ও ভাল জানে তো ?'

'সব জানে ! নব্বুইটা ব্যাটাছেলে দাম কমাতে চায়। মাল খেলে এমন কামড়ায় যে নেড়ি কুত্তাগুলো পর্যন্ত লজ্জা পাবে। আমাকে ডাকলে আমি ওর চেয়ে ভাল বলতাম।'

'ওহো, তুমি বুঝতে পারছ না, সুবো, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়।'

'ঠাট্টা কে বলেছে ? আমি ?'

'না। কিন্তু তোমার মেয়ে বলে গেল সে নাকি যাবে না। এটা, এটা খুব বোকামি হবে।'

'গাছে রইল কাঁটাল আর তুমি তার বিচির তরকারি রাঁধতে বসে গেলে।'

'কিন্তু ওদের জানাতে হবে যে সুধারানী যেতে রাজী।'

'জানিয়ে দাও। বাইরে গেলে অনেক কিছু শেখা যায়। শিখে আসুক।'

'কিন্তু ও যে বলল যাবে না।'

'সেটা আমি বুঝব। ওসব কথা ছাড়ো তো। এবার তোমার হাতটা আমার কপালে রাখ। আরে বাবা, বেস্পতিবার আমার কপালে কোন ব্যাটাছেলের স্পর্শ নিই না।'

'কেন ?' সুরবালা কি বিশেষ কোন দেবীর পুজো করছে এদিন ? মিত্তিরদার তাই মনে হল।

'বেস্পতিবার তুমি আমার হাত ধরেছিলে প্রথমবার।' চোখ ঘোরাল সুরবালা।

কথাটা শোনা মাত্র যেন অনেক দিন পরে রোমাঞ্চিত বোধ করলেন মিত্তিরদা। সুরবালা ততক্ষণে তাঁর হাতটা টেনে নিয়েছে কপালে, 'তোমার সঙ্গে বাস না করে ভালই হয়েছে বুঝলে। কত মানুষ দেখলাম, তাদের এক একজনের ব্যবহার এক একরকম। যদি লিখতে পারতাম তাহলে একশটা সিনেমা হয়ে যেত।' সুরবালা খুব বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

মিত্তিরদা টের পেলেন মন শিকড় নামাচ্ছে। এইসব কথা শুনলেই চিত্তে চাঞ্চল্য তৈরী হয়। তিনি কথার মোড় ঘোরালেন, 'সবই তো হল। সুধারানীর

নামে এমন চিঠি কি করে এল বলতো ?'

'চিঠিটা সত্যি কিনা তাই বা কে জানে। ওহো, হ্যাঁ— !' সুরবালা উঠে বসল।

'কি ব্যাপার ?' মিত্তিরদা বুঝতে পারলেন কিছু তথ্য আসছে।

'কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের ব্যাপার। আমার কাছে একটা লোক আসতো। খুব নামকরা কবি নাকি। এসে মদ খেত আর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। মদ খেলে অমানুষ হয়ে যেত লোকটা। কিন্তু কখনও শুতে চাইত না। বলত কলকাতার সমস্ত রাতের ট্যাক্সিওয়ালা ওকে চেনে। মদ না খেলে ওই লোকটার মত মানুষ হয় না। তা একদিন সে এল একজোড়া সাহেবমেমকে নিয়ে। তাদের সোনাগাছি দেখাতে এনেছে। আমরা তো হেসে মরি। শুনলাম সাহেবমেম নাকি স্বামীস্ত্রী নয়। পথে আসতে আলাপ আর তারপর একসঙ্গে থাকে। আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি বাচ্চা হয়ে যায় তো কি করবে! কবি সেটা শুধোতে মেমসাহেব হেসে গড়িয়ে পড়ল। কবি জেনে নিয়ে উত্তর দিল, ওরা বলছে তাহলে তো প্রতি দশ মাসে তোমাদের একটা করে বাচ্চা হত। মেমসাহেব আমরা কোথায় থাকি, কি খাই সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। সুধাকে ডেকে দুজনে খুব মাথা নেড়েছিল। কি বলব, যেমন করে লোকে গরু কেনে তেমনি করে সব পরীক্ষা করে দেখল সুধার। বেচারা তো লজ্জায় মরে। তারপর গান শোনাতে বলল। কবি বলেছিল, মা লক্ষ্মী নিধুবাবু ধরো তো জমিয়ে। তা মাঝরাতে মাতাল কবিকে নিয়ে ওরা চলে গেল। ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিলাম আমরা। সেই মেমসাহেব সুধার নাম ঠিকানা সব একটা খাতায় লিখে নিয়েছিল। সেই এই চিঠি পাঠাল কিনা কে জানে ?'

এইসময় মোক্ষদা এসে খবর দিল ডাক্তারবাবু এসেছেন। সুরবালা তাকে ভেতরে পাঠাতে বলল। মিত্তিরদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার অসুখ হল ? গৌরহরি ডাক্তার নাকি ?'

সুরবালা মাথা নাড়ল, 'রোজ একবার আসেন। ফি নেন না।'

মিত্তিরদা অবাক হলেন। ছেলেবেলা থেকে গৌরহরি ডাক্তারকে তিনি দেখে আসছেন। পাউডার আর রঙিন জল বিক্রী করে একচেটিয়া ব্যবসা করে এসেছে এতকাল। ঘরের দরজায় এসে মিত্তিরদাকে দেখে তিনি হাসলেন, 'কপাল ভাল তোমার। এই ঘরে আজ তো কেউ থাকে না। তা তোমার যে এত রস আছে তা ভাবিনি মিত্তির। তারপর! সংবাদ কি সুরো ? সুধা মা কোথায় ?'

'ডাকছি। আজ একটা অদ্ভুত চিঠি এসেছে সুধার নামে। বিদেশ থেকে ওকে নেমন্তন্ন করেছে বক্তৃতা দেবার জন্যে।' সুরবালা কথা বলল হড়হড়িয়ে।

ডাক্তার হাত বাড়ালেন, 'দাও হে দেখি।' চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন তিনি। পড়ে কয়েকবার মাথা নাড়লেন, 'ইটস এ গ্রেট অনার। সোনাগাছি কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। গহরজান গিয়েছিল গান গাইতে। আর এরা সুধামাকে সসম্মানে নিয়ে যেতে চাইছে।'

সুরবালা বলল, 'তাহলে আপনিও চাইছেন ও যাক।'

'আলবত যাবে। গিয়ে এদেশের মেয়েদের কষ্টের কথা বলবে। সোনাগাছির মেয়েরা ভোট দেয়, কিন্তু মাস্তান আর পুলিশ ওদের মধ্যযুগের উৎপীড়িত করে

রেখেছে।'

'কিন্তু কত টাকা দেবে তা কি লিখেছে?'

'টাকা। আরে এত বড় একটা সম্মান পাচ্ছে আর তুমি টাকার কথা ভাবছ। কালই এই চিঠির উত্তর লিখে দাও। সুধারানী যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি না হয় ভাল করে লিখে আনব।' গৌরহরি ডাক্তার মাথা নাড়তে লাগল, 'ইটস এ নিউজ, গ্রেট নিউজ। খবরের কাগজে ছাপা হওয়া উচিত। সে কোথায়? খুব খুশী নিশ্চয়ই?' বৃদ্ধ চারপাশে তাকাতে লাগলেন।

সুরবালা বলল, 'আমিও বলেছি যাবে। কিন্তু সে নাকি আপত্তি করেছে। যান না নিজের ঘরে আছে সে। কি বলে শুনে আসুন। যাওয়ার সময় আর ডাকবেন না।'

বৃদ্ধ হাসলেন। তাঁকে খবরটা পড়ার পর থেকেই খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লাঠি তুলে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেই সুরবালা বলল, 'কথা দাও যদ্দিন এপাড়ায় আছি বেস্পতিবার বেস্পতিবারে আমার কাছে আসবে। চেনা মানুষের গন্ধ যে কি আরামের! আহা।'

মিত্তিরদা হাসলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসবো। তবে এখন উঠতে হবে। দোকান খোলা। পাঁচ ভূতে শেষ করে দেবে।'

যেতে দিতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হঠাৎই বাধা তুলে নিল সুরবালা। সে মৃদু ঘাড় নাড়ল। মোক্ষদা গেট খুলে দেওয়ায় পর নিচে নামতে নামতে পরিচিত দৃশ্য দেখতে পেলেন। পরস্পরকে গালাগালি, আবার উগ্র হাসির ফোয়ারা একই সঙ্গে চলছে। সন্ধ্যের আগে সোনাগাছির চৌদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এদের একজনকে প্যারিস বলে একটা শহরে এদেরই কথা বলবার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে। হঠাৎ মিত্তিরদার মনে হল সুধারানী যদি যায় তবে তিনি ওর গার্জেন হিসেবে যেতে পারেন। খরচ তো ওরাই দেবে। এখন সুরবালার মন জুড়ে তিনি। কোনরকমে যদি ওকে রাজী করানো যায় তাহলে দুনিয়াটা দেখে আসতে পারেন এই সুযোগে।

কখনও কখনও এমন হয়। সন্ধ্যে থেকে সেজেগুজে বসে থাকলেও খদ্দের আসে না। দোতলার জানলায় তখন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় সুধারানী। নিচের আলোকিত গলি আর তার মানুষদের ওপর নজর বোলায়, দুজন দালাল নিয়োগ করা আছে। বড় পার্টি ঢুকলেই তারা জানতে চায় সাবেকী গান বাজনা শোনার আগ্রহ আছে কিনা। অন্য দালালদের কাছে কেউ সেই আগ্রহ ব্যক্ত করলে তারা এদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরা তখন ওপরে নিয়ে আসে। গান বাজনা মদ এবং সবশেষে শুধু একজনের সঙ্গে শোওয়া। দিদার কাছে সে শুনেছে তার মায়ের আমলে যে কেউ ইচ্ছে হলেই শুতে পেত না। লীলাময়ীর মর্জি না হলে কোন খদ্দেরের অধিকার ছিল না খাটে ওঠার।

সেদিন আর নেই কিন্তু ঘরানা আছে। যেমন মায়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে আলাদা। তবু তো মায়ের গলায় সুর নেই। ইচ্ছে না থাকলেও মাঝে মাঝে শুতে হয় সুধারানীকে। এই ঘরের ভাড়া এখন পাঁচশ টাকা। ব্যবসা শুরু করার পর মা সোজাসুজি বলেছিল, 'স্বাধীন হয়েছে। এ খন

ভাড়া দিতে হবে। খাবে আমার সঙ্গে কিন্তু তার জন্যে টাকা লাগবে। এ না হলে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ হবে না কোনদিন।'

ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে সুধারানী। মাঝে মাঝে অসুবিধে হয় না যে তা নয়। কোন কোন মাসে দুহাজার টাকা উঠতেই হিমসিম খেতে হয়। কখনও সহজে দশ হাজার চলে আসে। সকালে যখন রেওয়াজ করতে বসে তখন মনে হয় শুধু গান গেয়ে যদি বেঁচে থাকা যেত! অনেকেই তো থাকে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে দুপাশে হার্মোনিয়াম আর তবলা নিয়ে বসলেই অন্যরকম হয়ে যায় সব। নিধুবাবুব একটা গান ভেঙ্গে দিদা গান শিখিয়েছিল, তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ! প্রথম প্রথম কথা না বুঝে গাইত। এখনও সব মানে মনে ঢোকে না। দুরকমের গান শিখিয়েছিল দিদা। সবই পুরোন আমলের। এক রকমের গানে রাগ রাগিণী জুড়ে থাকত আব তার কথাগুলো বেশ ভারী ভারী। আর অন্য গান গুলো বেশ মজা করে। সেগুলো গাইতে ভাল লাগত বেশী। খদ্দেররাও তাতে জমে যেত। 'ফেল কড়ি মাখো তেল ভেজাল পাবে না' কিংবা 'মাঝরাতে নাগর আমার রসেব কথা বলল' গানদুটো গাইবার সময় শরীর নাচায় না এমন মানুষ খুব কম আছে। কিন্তু এখন বেশীর ভাগ লোক বলে হিন্দী গাইতে।' উমরাও জানের গান তুলে রেখেছে সে। কেউ কেউ খুশী হয়, কেউ হয় না। কিন্তু গানের পালা চুকিয়ে আলো নেভাতে তৎপর হয় সবাই। মাঝে মাঝে মনে হয় এই গানের বাহানা কেন? অবশ্য তার জন্যে দাম বেশী দিতে হয় খদ্দেরদের। মা বলে সাতদিনের বদলে তিনদিন বসলেও ওই একই রোজগার হবে গান থাকলে, তাতে শরীর বাঁচে। কথাটা সত্যি। সোনাগাছিতে এসে তিন বছরে কঙ্কাল হয়ে গেছে এমন অনেক ঘটনা জানে সে। ভোর থেকে দশটা অবধি ঘুম, দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক শুয়ে থাকা, পেট ভর্তি খাবার না খেলে এখানে টিকে থাকতে পারবে না তুমি।

সুধারানীর নজর পড়ল গলিতে। সালোয়ার পাঞ্জাবি পবা অবাঙালি মেয়েটা একটা খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু খদ্দেরের নজর এদিকে। উঠে যেতে গিয়েও গেল না সে। উল্টো পাল্টা কিছু করলে মোক্ষদাকে বললে নিচের দাবোয়ান ওকে ছাড়বে না। এইসময় পিন্টোকে আসতে দেখল সে। পিন্টো একা নয় সঙ্গে আরও দুজন লোক। পিনটো কখনও দালালি করে বলে সে শোনেনি। মাস্তানি থেকেই তো ভাল রোজগার। এই অ্যাংলা ইন্ডিয়ান ছেলেটাকে তার অদ্ভুত লাগে। সুধারানী চোখ সরিয়ে নিল। এবং তখনই গৌরহরি ডাক্তারের কথা মনে পড়ল, 'ভাল গান জানিস, শরীরে যৌবন আছে, তুই কেন এই সোনাগাছিতে পড়ে মরবি। রেকর্ড কর, বাবু ধরে রেকর্ড কর। বড় হতে গেলে সব ভদ্রলোকদেরই মামা ধরতে হয়। তুই না হয় মামাবাবু ধর।' আর আজ একটু আগে বুড়ো প্রায় নাচতে নাচতে এসে বলে গেল, 'হয়েছে হয়েছে, দরজা খুলেছে।' সুধারানী অবাক হযে বলেছিল, 'সে আবার কি।'

'আহা নেকু। তুমি জানো না যেন। প্যারিসে যাওয়ার ডাক এসেছে না?'

মুখ ফিরিয়ে সুধারানী জবাব দিয়েছিল, 'এবাড়ির বাইরে আমি ওসব করতে ' বলে চলে গিয়েছিল বাথরুমে। ওই যে কে একটা লোক চিঠি দিয়েছে ওয়ার জন্যে আর মায়ের স্যুটকেসের তলার বেলপাতা, আজ হঠাৎ

উদয় হয়ে সেটা পড়ে দিয়ে বলছে, যেতে হবে, অমনি যাওয়া ? সে কি ফ্যালনা ? 'পিরীতের দোকানে কি ফাউ পাওয়া যায়' গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল সে। আর তখনই মোক্ষদা এসে দাঁড়াল সামনে, 'ডাক পড়েছে।'

'চেনা না অচেনা ?' খোঁপায় হাত বুলিয়ে নিল সুধারানী।

'বিনি পয়সার নাগর। দেখেই বুঝেছি। কথা বলবে, চোখ দিয়ে চাটবে, তারপর লম্বা পা ফেলে কেটে পড়বে। ওই সাহেব গুণ্ডাটা নিয়ে এসেছে। দুজন। তাড়াতাড়ি ডাকছে।' মোক্ষদার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে এদের একদম পছন্দ করছে না। তবু ঘরে ঢুকে নিজেকে একবার আয়নায় দেখে নিল সুধারানী। তারপর পা বাড়াল। আজ মদ খেলে কেমন হয় ?

দরজায় দাঁড়াতেই মা বলল, 'আয় সুধা। এই হল আমার মেয়ে সুধারানী।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকদুটো উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সুধারানী। খদ্দেবরা কেউ তাকে নমস্কার করে না। ঘরে বসে আছে পিন্‌টো। মায়ের বেলপাতা এখন এখানে নেই। তখনও মার হাতে চিঠিটা ধরা। তিনি বললেন, 'আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। প্রথমে তো খবরটা শুনে আমরা বিশ্বাসই কবিনি, কিন্তু নিউজ এডিটার বললেন একবার ঘুরে আসতে। কিন্তু ম্যাডাম, এই চিঠিটা যে একটু চাই। জেরক্স করিয়ে নিতে হবে।'

মা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পিন্‌টো বলল 'সরি। ওটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। মানে অন্য কেউ এলে দেখাতে পারব না আমরা। কপি করে নিয়ে যান।'

সুরবালা ঘাড় নেড়ে কথাটাকে সমর্থন করল। সুধারানী খুব অবাক হল। পিন্‌টো কখনও এই বাড়িতে আসেনি। অথচ এখন এমন ভাবে কথা বলছে যেন কত নিজের লোক। মাকে দেখেও মনে হচ্ছে না আগে আলাপ ছিল না। লোকটা একথা শুনে একটু অখুশী হলেও সেটা কাটিয়ে উঠল, 'ঠিক আছে। একটা অনুরোধ করছি। আজ রাত্রে আর কোন সাংবাদিককে আপনারা অ্যালাউ করবেন না। কাল সকালে আমাদের কাগজে খবরটা বেরিয়ে গেলে— .'

লোকটাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে পিন্‌টো বলল, 'এ আপনি কি বলছেন। আপনাকে আমরা মিছিমিছি খাতির করতে যাব কেন ? আমাদের কাছে সবাই সমান। কি বলেন দিদি ?' মা মাথা নাড়লেন।

লোকটা বলল, 'কিন্তু আমরা তো প্রথমে এসেছি। গৌরহরি ডাক্তার তো আমাদের খবর দিয়েছেন আগে।' অন্য লোকটি ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরা বের করছিল পিনটো হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আরে করছেন কি ?'

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ছবি তুলছি।'

'না, না। ওর ছবি বাজারে বের হলে লোকে বিরক্ত করবে।'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'কি আশ্চর্য ! এত বড় একটা ব্যাপার নিউজ হবে, ছবি ছাড়া ?'

পিন্‌টো কোন জবাব দিল না। ভদ্রলোক একমুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপরে বললেন, 'আসুন একটা কন্ট্রাক্ট করা যাক। আপনারা কাল সকালের আগে কাউকে বলবেন না আর এখন ছবি তুলতে দেবেন। এবাবদ আমরা দুশো টাকা দিচ্ছি। না, না, এর বেশী আমরা পারব না। এই আদায় করতে আমার কালঘাম

ছুটে যাবে।' কথা শেষ করে দশ টাকা কুড়ি টাকায় দুশো টাকা পুরো করে ভদ্রলোক সামনে রাখলেন। পিন্টো হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে সুরবালার হাতে দিতেই সে টাকাটা জামার তলায় চালান করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘরে। সুধারানী কিছু বলার আগেই গোটা চারেক ছবি তোলা হয়ে গেল। প্রথম জন বলল, 'এবার একটু কথা বলি। সুধারানী দেবী, প্যারিসের আন্তর্জাতিক মানবকল্যাণ সমিতির মহিলা শাখা মেল বিহেভিয়ার ইন রেড লাইট এরিয়া বিষয়ে যে কনফারেন্স করছে তাতে আপনাকে নেমন্তন্ন করছে। এ বিষয়ে আপনি আগে জানতেন ?'

সুধারানী কিছু বলার আগে সুরবালা জবাব দিল, 'না। এ চিঠি হঠাৎ এল।'

ভদ্রলোক বলল, 'এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমাত্র আপনাকেই বোধহয় ওরা ডেকেছে এই ভারতবর্ষ থেকে। আপনি কি গর্বিত বোধ করছেন ?'

সুরবালা কিছু বলছে না দেখে সুধারানী জবাব দিল, 'আমি বুঝতেই পারছি না।'

'খুব স্বাভাবিক। প্রথম প্রতিক্রিয়া এরকমই হয়। ওরা আপনাকে যাওয়া আসার খরচ দেবে। আপনি কি এর আগে দেশের বাইরে গিয়েছেন ?'

'না, না, ও কলকাতার বাইরেই যায়নি।'

'তাহলে তো— । আপনি ইংরেজি জানেন ?'

'না।' সুধারানী উত্তর দিল।

'অবশ্য ওরা আপনার এসকর্টকেও খরচ দেবে। আপনি কাকে এসকর্ট হিসেবে নিচ্ছেন ?'

এসকর্ট শব্দটার অর্থ সুরবালা এবং সুধারানী বুঝতে পারল না। পিন্টো বলল, 'এখনও কিছু ফিক্স হয়নি। তবে হয়তো আমি অ্যাকোম্পানি করতে পারি।'

'আই সি।'

'আপনাদের কোন রিলেশন আছে ?'

'আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে এসব প্রশ্ন করতে নেই।' পিন্টো জবাব দিল।

এবার লোকটি সুধারানীর দিকে তাকাল, 'প্যারিসে গিয়ে কি বলবেন আপনি ?'

সুধারানী মাথা নাড়ল, 'আমি যাব না।'

চমকে উঠল সবাই। লোকটি বলল, 'সেকি। এতবড় ব্যাপার, আর আপনি যাবেন না ?'

'আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যবসা করি না।'

'মাই গড। ওরা কি আপনাকে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করাবে নাকি ? কই সেরকম কথা তো চিঠিতে লেখেনি। না, না, আপনি ভুল বুঝছেন। ওখানে একটা অনুষ্ঠান হবে। সব দেশের মেয়েরা যাবে। আপনিও যাবেন। এখানকার ছেলেদের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলবেন। হয়তো ওরা এদেশের ব্যবসার পুরোন নমুনা জানতে চাইতে পারে। আপনি নাচতে পারেন ?'

'না। গান গাই।'

'কি গান ?'

'সব।'

'বাঃ, তাহলে গাইতে বলতে পারে। যাই বলুন এটা একটা বিরাট সম্মান। আমি শুধু ভেবে পাচ্ছি না ওরা কি করে জানতে পারল আপনাকে। চলি। কাল কাগজ দেখবেন।'

পিন্‌টো ওদের নিয়ে উঠল। ওরা নেমে যেতেই সুরবালা বলল, 'অমন হুট করে যাব না বলো না তো! ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। তোমাকে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছে বলেই আজ খবরের কাগজের লোকজন এলো। খবর বের হলে তোমার রেট ডবল হয়ে যাবে।'

'প্যারিস না কি জায়গাটা, সেটা কদ্দূর ?'

'বিলেতে, বিলেতে। প্লেনে যাবি আর আসবি।'

'উরে ব্বাস। প্লেনে আমি উঠতে পারব না। আচ্ছা, এই পিনটো কেন কথা বলছিল ?

'তোর মিত্তির, কি বলবি তুই, মিত্তিরদাই বল, পাঠিয়েছিল পিনটোকে, ওদের এখানে পৌঁছে দিতে। ও এল বলে তো তোর দুশো টাকা রোজগার হল ফালতু। নে রাখ।'

'রেখে দাও তোমার কাছে। আমি তো ছাই মাথামুণ্ডু বুঝতেই পারছি না।'

'তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না। শুধু দয়া করে বলবে না যাব না।'

এই সময় মোক্ষদা এসে বলল, 'সাহেব এসেছে। সঙ্গে লোক।'

'দরজা খুলে দে।'

চটজলদি ঘরে ঢুকে পিন্‌টো বলল, 'আর একটা কাগজের লোক। বলবেন না আগে কেউ এসেছিল। নইলে মাল ছাড়বে না।' বলে ঘরের বাইরে মাথা নিয়ে গিয়ে ডা়কল, 'কই, আসুন। এদিকে।' সুরবালা সুধারানীকে ইঙ্গিত করলেন বসতে।

রাত এগারটা নাগাদ ছুটি পাওয়া গেল। অবিরত খবরের কাগজের লোক এসেছে, ক্যামেরার বিদ্যুৎ জ্বলেছে আর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। অবশ্য শেষপর্যন্ত দেখা গেল পিনটো প্রায় সাতশো টাকা আদায় করে ছেড়েছে। এত টাকা গান গেয়ে এবং শুয়ে সে রোজগার করতে পারত না। সুরবালা ওই টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা পিন্‌টোর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গিয়েছে পিন্‌টো 'ছি ছি! একি বলছেন। আর যাই হোক এই ব্যবসা করি না আমি।'

'এটা তো ঠিক ব্যবসা নয়। তোমার জন্যেই টাকাটা পাওয়া গেল।'

'মনে রাখবেন তাহলেই চলবে।' পিন্‌টো বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে কলকাতার সবকটা দৈনিকের প্রথম পাতায় সুধারানীর ছবি এবং খবরটা ছাপা হল। প্যারিসে আন্তর্জাতিক স্বৈরিনী সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী সুধারানী দাসী। প্রত্যেকটা কাগজেই খবরটা সামান্য এপাশ ওপাশ হলেও একইভাবে ছাপা হয়েছে। প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতীর নির্বাচন নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। একটি কাগজ লিখেছে অতীতের

গহরজানের ঘরানায় তিনি এখনও গান গেয়ে থাকেন।

সকালে দোকান সামলে মিত্তিরদা তিন নম্বরে ঢুকে হতভম্ব। ইতিমধ্যে শ্রীমান পিন্‌টো সেখানে আসর জমিয়ে বসেছে। সুরবালা এবং সুধারানীর সামনে সবকটা খবরের কাগজ সাজানো। পিন্‌টো একনাগাড়ে কিছু বলে যাচ্ছিল, মিত্তিরদাকে দেখে বলল, 'আসুন দাদা, একদিনেই ফেমাস হয়ে গেল সোনাগাছি। হাড়কাটা, রামবাগান, কালীঘাট, খিদিরপুর, ইলিয়ট রোড—সব্বাইকে টেক্কা মেরেছে। আরে খানদানী জায়গার দাম আলাদা। দিল্লি বোম্বাই লক্ষ্ণৌ এখন আমাদের পায়ের নিচে।'

সুরবালা উচ্ছ্বসিত, 'হ্যাঁ গো, আমাদের সোনাগাছির কারো ছবি এর আগে কাগজে বেরিয়েছে ? তবে ! জানো, এই কাগজে না আমার নামও লিখেছে ওর মা হিসেবে। পেটের মা নই তাতেই এই ! আমার মেয়েটা লক্ষ্মী সোনা !' হাত বাড়িয়ে সুধারানীর চিবুক ধরে চুমু খেয়ে বলল, 'বসতে দে ওকে !'

মিত্তিরদা বলল, 'বসব না। দোকান খোলা আছে।'

'এখন না বসলে পরে কথা হবে না।' সুরবালা বলল, 'এসব কাগজে দেখে আজ যা লোক আসবে তাতে হিমসিম খেতে হবে। মোক্ষদাকে বলেছি তিনগুণ দাম বাড়বে আজ।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল পিন্‌টো, 'ঠিক কথা। প্যারিসে যাচ্ছে যে মেয়ে তার তো দাম আছেই। তা দাদা, আপনি এসে ভাল করেছেন। চিঠির জবাবটা ঠিকঠাক দিতে হবে, বলুন তো কি লিখি।'

মিত্তিরদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, 'যে যাবে তার মত আছে কিনা একবার জিজ্ঞাসা করেছ। তার তো যাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে সুধারানী বলল, 'মা যখন বলছে তখন যাব।'

'অ। তাহলে তাই লিখে দাও।' মিত্তিরদা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তিনি পিন্‌টোকে সহ্য করতে পারছেন না। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে সুরবালার গলা শুনলেন, 'শোন, বসে যাও। আমার মেয়ে বিদেশে যাচ্ছে, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে বলে তোমার হিংসে হয়েছে ?'

'হিংসে ? আমার ? তাহলে নিজে থেকে পিওনকে এখানে ডেকে নিয়ে আসি ?'

'তাহলে আমার পাশটিতে বসো।' ঢেউ তোলার চেষ্টা করল শরীরে সুরবালা।

মিত্তিরদা বাধ্য হলেন বসতে। এবং তার স্পর্শ খারাপ লাগছিল না।

পিন্‌টো ব্যাপারটা আড়চোখে দেখেও উপেক্ষা করল, 'তাহলে আমরা লিখে দিচ্ছি যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার খরচ পেলে আমরা যেতে রাজী আছি। তবে যেহেতু মেয়ে কোনদিন বাইরে যায়নি তাই একজন এসকর্ট যাবে। তা দাদা, সুধারানীর এসকর্ট কে হবে ?' উদ্‌গ্রীব চোখে তাকাল পিন্‌টো।

'একজন ভারী ভারিক্কি কেউ হলে ভাল হয়। আমিও যেতে পারি।' শেষ তিনটে শব্দ আচমকা বলে চারপাশে তাকালেন।

পিন্‌টো মাথা নাড়ল সবার আগে, 'খুব ভাল হয়। কিন্তু দাদা আপনি ইংরেজি বলতে পড়তে জানেন না। সেইটে হবে সমস্যা। তার ওপর টাই পরতে হবে। আপনি যদি ওর কোন কাজে না লাগলেন তবে আপনাকে নিয়ে গিয়ে ওর কি

লাভ ! গৌরানতাই ডাক্তার যদি যান .

এবার সুরবালা হাত নাড়ল, 'না না। ও বুড়ো নিজেই নড়তে পারে না তো সুধাকে দেখবে। আর ইংরেজি জানলে তো আমি নিজেই যেতাম। আচ্ছা, একমাসে ইংরেজি শেখা যায় না ?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ। মিত্তিরদা বললেন, 'ইংরেজিতে কাজ চালিয়ে নেওয়া— ।'

সুরবালা তাঁর মুখের সামনে হাত নাড়ল, 'তুমি আর ধান্দা করো না। এখন আমি তোমাকে ছাড়ছি না। সল্ট লেকের বাড়িতে যাচ্ছি বলে এমনিতেই মন খারাপ ছিল। তোমাকে নতুন করে পাওয়ার পর অনেক কিছু ভেবে ফেলেছি। আর তোমাকে ছাড়ছি না বাবা।'

কথাটা শুনতে শুনতে মিত্তিরদা পিন্টোর দিকে তাকালেন। মানসম্মান আর রইল না। এ ছোকরার ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। এখন তামাম সোনাগাছি গাবিয়ে বেড়াবে। হঠাৎ তিনি ভেতরে ভেতরে উদার হয়ে পড়লেন। বুড়ো বয়সে প্যারিসে গিয়ে কি হবে। তার চেয়ে যদি সুরবালাকে ঠিকঠাক বধ করা যায় তো শেষের কটা দিন একটু আরামে কাটতে পারে। মিত্তিরদা গলা তুললেন, 'একটা কাজ করো, আমাদের পিন্টোবাবুকেই না হয় পাঠিয়ে দাও সঙ্গে। ইংরেজি বলতে পারে, তাছাড়া ওটাই তো ওর আসল দেশ।'

পিন্টো এতটা আশা করেনি। কিন্তু খুব দ্রুত সে সামলে নিল, 'না না প্যারিস আমাদের দেশ নয়। তবে বেশীদূরে নয়, ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েই তো ইংল্যাণ্ডে যাওয়া যায়। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে দিদিমাকে দেখার।'

'দিদিমা ? তোমার দিদিমা কি ওখানে ?'

'হ্যাঁ। মায়ের মা একজন রিটায়ার্ড আই সি এস অফিসারের সঙ্গে ওখানে চলে গিয়েছিলেন। মায়ের ডায়েরীতে ঠিকানা ছিল। সেটা এখন আমার কাছে।' খুব গর্বের সঙ্গে জানাল পিন্টো। গতকাল থেকে যে চিন্তাটা মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে সেটার এত সহজে সমাধান হচ্ছে দেখে সে মিত্তিরদার ওপর কৃতজ্ঞ হল।

মিত্তিরদা চোখ ছোট করলেন, 'কিন্তু পিন্টো, তুমি গেলে যে তোমার সোনাগাছির ব্যবসা চোট হয়ে যাবে। ফিরে এসে পায়ের তলার মাটি পাবে কিনা সন্দেহ।'

'যায় যাবে। তবু এই সুযোগে দেশটা তো দেখা হয়ে যাবে।' পিন্টো হাসল। সেই হাসি দেখে বড় ভাল লাগল সুরবালার। নেহাৎ ছোঁড়া বয়সে ছোট নইলে ওই হাসির জন্যে একটা ভাল আসর বসানো যেত। সে উদার গলায় বলল, 'তাহলে পিন্টো যাক সুধার সঙ্গে। চিঠিমিটি যা লেখার তা তুমিই লেখ পিন্টো। তবে দেখো, মেয়েটা যেন সুস্থ ফিরে আসে।'

পিন্টো বলল, 'জান থাকতে ওর কোন ক্ষতি হবে না।'

মিত্তিরদা বললেন, 'শুনেছি ওদেশে নাকি এইড্‌স থিকথিক করছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের স্পষ্ট বলে দিও ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া ও শোবে না।'

'দাদা, এ কি কথা বলছেন আপনি ? যাচ্ছে কনফারেন্সে বক্তৃতা করতে আর আপনি ভাবছেন শোওয়ার কথা। ওকি টাকা রোজগারের ধান্দায় যাচ্ছে ?' পিন্টো প্রতিবাদ করল।

সুরবালা হাসল, 'বাবা পিন্‌টো, যে রথ দেখতে যায় সেকি কলা বেচে না ? ভাল খদ্দের পেলে আপত্তি করার কি আছে। তবে হ্যাঁ, বুড়ো সাহেব হলে তবেই।'

মিত্তিরদা হতভম্ব, 'বুড়ো সাহেব ?'

'বুড়ো সাহেবদের মনে নাকি খুব স্নেহটেহ থাকে।'

যাকে নিয়ে এত আলোচনা সে ছিল এতক্ষণ চুপচাপ বসে। পিন্‌টো বলে যাচ্ছিল, এখনই প্যারিসে সম্মতিপত্র এবং পিন্‌টো যে এসকর্ট হচ্ছে সেই কথা জানাতে হবে। ওখান থেকে চিঠি এলে তবে ভিসা পাওয়া যাবে। তবে তার আগে পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আজই সে পাশপোর্টের ফর্ম নিয়ে ভর্তি করে দেবে। তবে একটা ব্যাপারে মিত্তিরদার সাহায্য চাই। ওই কনফারেন্সে সুধারানী যে বক্তৃতা দেবে তার বাংলা যদি তিনি বলে দেন তাহলে সে সেটা অনুবাদ করে নিতে পারে।

প্রস্তাবটা মনে ধরল মিত্তিরদার, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুধার বক্তৃতার ওপর ওরা এদেশের খদ্দেরদের সম্পর্কে ঠিকঠাক খবর পাবে। এমন কিছু লেখা উচিত হবে না যা শুনে ওরা আমাদের দেশ সম্পর্কে খারাপ ভাবে। ঠিক আছে, আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি বইপত্র দেখে ঠিকঠাক লিখে তোমাকে দিয়ে দেব পিনটো।'

প্রফুল্লচিত্তে পিন্‌টো উঠতেই সুধারানী উঠে দাঁড়াল, 'মা আমি সাহেবদের সঙ্গে কাজ করব না।'

'কেন ? এ ভেবলিকে নিয়ে তো মহা মুশকিল।' সুধারানীর দিকে তাকাল সুরবালা।

'না। ওরা চান করে না। এমনকি কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করে। উঃ মাগো।' সত্যিকারের ঘেন্না ফুটে উঠল সুধারানীর মুখে।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করল, 'এসব গল্প কে শোনাল তোকে ?'

'ডাক্তার।'

'গৌরহরি ডাক্তারের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই এসব গল্প মারতে গেল। কে কি বলল তাতে তোমাকে কান দিতে হবে না। পিন্‌টো থাকবে সঙ্গে। ও সাহেবকে বলবে আগে স্নান করো জল ঢেলে তারপর অন্য কথা। ঠিক আছে পিন্‌টো।' সুরবালা রায় দিল।

পিন্‌টো মাথা নাড়ল, 'তবে বড্ড ঠাণ্ডা ওখানে।'

'ঠাণ্ডা তো কি হয়েছে। শীতকালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কেউ তাহলে গঙ্গায় ডুব দিত না। সাহেবদের বলবে এ মেয়ের কাছে যাওয়া মানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য পাওয়া।'

'আর একটা কথা। বুড়োদেরই বেশী এইড্‌স হয়।' সুধারানী মিনমিনিয়ে বলল।

'এটা আবার কে বলেছে ? গৌরহরি ডাক্তার ?' সুরবালা হতভম্ব।

'হ্যাঁ। কে একজন সিনেমা করত। সে বুড়ো বয়সে ওই রোগে মরে গেছে।'

'ও। তাহলে আর কি! মুখ দেখিয়ে ফিরে এসো। কোথায় আমি ভাবলাম রোজগারের টাকায় দু দশটা ভাল জিনিস কিনে আনতে বলব তা না এই হয় ঐ

হয়। যাও।'

সুধারানী চটজলদি বেরিয়ে এল। পিন্‌টো যাচ্ছিল কোলাপসিব্‌ল গেটের দিকে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে তো ভাল করে আলাপ নেই ; তা আমি যাচ্ছি বলে আপত্তি নেই তো কিছু ?'

সুধারানী মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে না বলল। পিন্‌টো আর দাঁড়াল না।

সোনাগাছির ঘরে ঘরে খবরটা নিয়ে জোর আলোচনা। তিন নম্বরের সুধারানীকে ডেকে পাঠিয়েছে বিলেতে। কেউ বলল, ওখানে পৃথিবীর সব সেরা সুন্দরীদের সম্মেলন হচ্ছে। কেউ কেউ বলল, না। সেটা অন্য ব্যাপার। একজন অধ্যাপক এসেছিলেন, তিনি বললেন, 'আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম ব্যবসা নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ায় এই সম্মেলন। ধরা যাক সোনাগাছির কথা। কলকাতায় এককালে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত। এখন পাতাল রেল ছুটছে। অথচ সোনাগাছি সেই একই রয়ে গেল। এককালে যাত্রা মানে অমুক রানী তমুক রানী, সব মেয়ে সাজা গোঁফ কামানো ছেলে, এখন চলচ্চিত্রের নায়িকারা পর্দা থেকে নেমে এসেছেন ওখানে। এইসব পরিবর্তনের ঢেউ লাগল না সোনাগাছিতে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যেই সুধারানীকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সোনাগাছিতে অধ্যাপক খুব বেশী পাত্তা পেলেন না। একজন সিনেমা পরিচালক এসে বলে গেল, 'কোন সাহেবকে গেঁথেছিল সুধারানী। সেই পাইয়ে দিয়েছে।'

কিন্তু ভরদুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে চিনে চিনে তিন নম্বরে উপস্থিত হল কবি তার দুই চামচে নিয়ে। গত রাতের শেষে বাড়ি ফেরায় কবির পক্ষে সকালে কাগজ পড়া সম্ভব হয়নি। চামচেরা দশটা নাগাদ ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল খালাসীটোলায়। সেখানে একটা ইংরেজি কাগজের ঝানু সমালোচক দিশি খেতে খেতে কবিকে বলেছিল, 'এটা একটা জাতীয় অপমান। বিশেষ করে বাঙালির পক্ষে। বাঙালির মেয়েকে বেশ্যাগিরি করতে প্যারিসে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। বলতে পারেন বাঙালির ইতিহাসে কোন বিখ্যাত বেশ্যা ছিল কিনা, থাকলে তার নাম কি ? বলতে পারবেন না। বাঙালির ইতিহাসটা নতুন করে লেখা উচিত।' একজন চামচে বলেছিল, 'বাসবদত্তা!'

মালের দামটা তাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে সমালোচক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'বাঙালি লেখকদের মত অশিক্ষিত জীব পৃথিবীতে নেই। বাসবদত্তা বিহারী।' কবি তখনই জানতে পারেন ঘটনাটা। বিকেল চারটের আগে তাঁর নেশা হয় না এবং সেটার রেগুলেটার তাঁর কাছেই থাকে। আরও দুপাত্র চড়িয়ে তিনি তখনই চামচে নিয়ে ছুটে গেলেন সোনাগাছিতে। তাঁর স্মৃতি সর্বদা বড় প্রখর। ভাড়াটা চামচেদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বেল টিপতে টিপতে উৎসুক মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা জননীরা ভাল আছ তো সব ? কি সুখের সময়! আহা।'

মেয়েরা বলল, 'ঝাঁটা মার!'

সকাল থেকে লোক আর লোক। সুরবালা মধ্যদুপুরে নিদ্রা যাচ্ছিল। মোক্ষদা সুধারানীকে সতর্ক করছিল সাহেবদের সম্পর্কে। স্বাধীনতার আগে যখন গোরারা

এদেশে দাপিয়ে বেড়াত তার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল মোক্ষদার মনে। যেন সুধারানী কালই গোরাদের দেশে যাচ্ছে এমন ধারণায় কথা বলতে বলতে সে শিউরে উঠেছিল, 'কয়েক শ গোরা এদেশে এসে ওই কাণ্ড করেছিল আর তুমি যাচ্ছ একেবারে তাদেরই দেশে। তোমার কি হবে গো।' এমন সময় বেল বাজল। মোক্ষদা বিরক্ত হল, 'আর পারি না। কাল থেকে যত ফোতোবাবুর ভিড় এই বাড়িতে। একটা পয়সা রোজগার নেই কারো। ছবি ধোয়া জল খেয়ে কি পেট ভরবে?'

সুধারানী বলেছিল, 'তুমি থাকো, আমি দেখি।'

মোক্ষদা সেটাই চাইছিল। খোলা চুলে হলুদ শাড়ি পরে সুধারানী গুণগুনিয়ে হেঁটে এল, 'ভরদুপুরে চোর এসেছে নাগর এল মাঝরাতে।'

দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে কবি বলে উঠল, 'ব্রেভো। খোল খোল দ্বার রাখিও না আর বাহিরে আমায়।' শেষ হল না, সুধারানী বলল, 'সন্ধ্যের পর আসবেন। দিনের বেলায় আমি বসি না। মা ঘুমাচ্ছে।'

'কি আশ্চর্য। আমার জন্যে তুমি খ্যাতি পেলে আর আমাকেই চিনতে পারছ না?'

কবির কথা শোনামাত্র সুধারানীর মনে পড়ল সেই সাহেব মেমের কথা। সুরবালার ধারণা ওরাই এই নেমন্তন্নটা করিয়েছে। কবি তাদের এই বাড়িতে এনেছিল।

দরজা খোলা পেয়ে কবি চামচে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল, 'আয়ুষ্মতী হও। আমায় তুমি শেষপর্যন্ত চোর বললে মা জননী? তা যাকগে। ভাল খবর শুনে ছুটে এলাম। কিছু খাওয়াও।'

সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবেন?'

'হৃদয় ছাড়া তো আমার কিছুই নেই। সেটাই ভরাও গান শুনিয়ে।' কবি বসল আরাম করে চামচেদের নিয়ে। সুধারানী বিব্রত বোধ করল, 'ভরদুপুরে গান? তার চেয়ে অন্য সময়ে—।'

'ঠিক আছে। তোমার কর্মচারিনীকে বল এক পাত্র রাম আনতে। এ সময় ওটা চলে। আজ আমি তোমায় গান শোনাই।' অতএব মোক্ষদাকে খবর পাঠিয়ে সুধারানী বসল। মদ্য পান করলে কবির গলাটিতে সুর ভাল খেলে, 'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা ভরদুপুরে কলকাতায়।' হেসে গড়িয়ে পড়ল সুধারানী। চামচেরা অপলক দেখছিল তাকে। এবার বলল, 'দারুণ, না?' কবি বলল, 'উপমা দাও।' চামচেরা অনেক ভাবল। একজন বলল, 'রোদে ভেজা চাঁদ।' কবি বলল, 'বোগাস।'

এই সময় সুরবালা এসে দাঁড়াল। ফোলা মুখ, কাঁচা ঘুম ভেঙে সর্বাঙ্গে উদাস বিরক্তি, খোলা চুল, বলল, 'হচ্ছেটা কি? সুধা, এরা কারা?'

কবি উঠে দাঁড়াল, 'যাক, এতক্ষণে রানী এলেন সাম্রাজ্যে। হে দেবী, চিনেছ আমায়?'

সুরবালার মুখে হাসি ফুটল, 'ও, তুমি! কি মনে করে?'

'সুধা যাচ্ছে প্যারিসে। আমার বন্ধু বলে গিয়েছিল, তোমাকে জানাইনি। কেমন লাগছে?' কবি বুক ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সুরবালা চামচেদের দেখল। তারপর বলল, 'তুমি একটু পাশের ঘরে এসো।'

কবি গেল। সুধারানী চামচেদের দিকে তাকাল। তারা মদ ভুলে গেছে। সুধারানী উঠে তার নিজের ঘরে চলে গেল। পাশের ঘরে ঢুকে সুরবালা বুক থেকে আঁচল খসিয়ে বলল, 'তোমার জন্যেই হল। বুঝতে পারছি দাম নিতে এসেছ। কি চাই?'

সুরবালার দিকে তাকিয়ে কবি বলল, 'সেটাই যদি বুঝতে পারতাম! শোন, তোমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে যাব একদিন। মেয়েকে বলবে, প্যারিসে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। লোকটা ফরাসী কবিতা লেখে। খবরটা শোনার পর থেকেই মন ভাল হয়ে গেছে। আজ সারারাত মদ খাব। চলি।'

সুরবালা বলল, 'তুমি কি ধরনের মানুষ? মেয়েদের কাছে আস অথচ তাদের স্পর্শ করো না। এত অরুচি তোমার?'

কবি হাসল, 'বড় ভাল বলেছ। রুচি হোক। এটা হয় না বলেই তো এত কষ্ট। আবার মজা হল কষ্ট বোঝার মত মানুষের বড় অভাব।' চামচেদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবি মদ শেষ করে ছুটল ছোট ব্রিস্টলে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

এই কদিনে চড় চড় করে দর বেড়েছে সুধারানীর। রইসী আদমিদের আনাগোনাও বেড়েছে। প্যারিস সম্পর্কে গল্প শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছে জায়গাটা অনেকদিনের চেনা। সুধারানীর সব সন্ধ্যে এখন ভর্তি। লোকে মন দিয়ে গান শোনে, মদ খায়। কিন্তু তারপর যখন সুধারানী বলে, 'এই অবধি, প্যারিসে যাওয়ার আগে শরীরটা ঠিক রাখা সরকার, তাই না? নইলে তো আপনাদেরই বদনাম হয়ে যাবে। ওরা তো আপনাদের সম্পর্কে বলতেই আমায় ডেকেছে।' তখন লোকগুলোর হুঁশ হয়। দুর্গাঠাকুর দেখার মুখ করে নিচে নেমে যায়। কথাগুলো শিখিয়েছে ওকে সুরবালা। তাতে কাজ হচ্ছে বেশ। আর ঈর্ষায় যাদের মরে যাওয়া সঙ্গত ছিল তারা গৌরবে ছটফট করছে। খদ্দের এলেই বলছে, আমরা ফ্যালনা ভেবেছেন? এদেশে এমন একটা জায়গা পাবেন যেখানকার মেয়েকে বিলেতে ডেকে পাঠায়। তিন নম্বরের সুধারানীকে দেখার জন্যে ওদেরও কৌতূহল। সে কেমন দেখতে যার ডাক এল সাগরপার থেকে! কিন্তু খবর হবার পর সুধারানী আর জানলায় দাঁড়াতেও চায় না। নারীকল্যাণ সমিতির কয়েকজন বয়স্কা এসেছিলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। মোক্ষদার মুখে শুনে সুরবালা প্রথমে দরজা খুলবে কিনা ভেবেছিল। এই কল্যাণ টল্যান খুব বিশ্রী ব্যাপার। একবার তাকেও এই ধরনের একটা সমিতি এসে বলেছিল ব্যবসা ছেড়ে দিতে। সেলাই কিংবা ওই ধরনের কাজকর্ম করে জীবনযাপন করা নাকি ঢের সম্মানের। এরা আবার সুধারানীকে কি জ্ঞান দেয় কে জানে! ইচ্ছে করলে সে ওঁদের আপ্যায়ন না করতেও পারত কিন্তু কৌতূহল হল। মোক্ষদাকে বলল মিত্তিরদাকে খবর দিতে তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্যে। তারপর মহিলাদের সাদরে ঘরে নিয়ে এল। মহিলাদের যিনি নেত্রী তিনি বললেন, 'খবরের কাগজে যেটা বেরিয়েছে সেটা সত্যি?'

সুরবালা গালে হাত দিল, 'ওমা, খবরের কাগজে মিথ্যে ছাপা হয় নাকি?'

নেত্রী বললেন, 'না—না। বাড়িয়েও তো লেখে। কয় পুরুষের ব্যবসা

আপনাদের ?'

সুরবালা হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'একি পুরুষের ব্যবসা ? দিদিমার দিদিমা—, আমি সব মেয়েছেলের কথা জানিও না ছাই।'

'সুধারানী আপনার কি হয় ?'

'মেয়ে।' আজকাল আর বিশদে যেতে চায় না সুরবালা।

'আপনি এখনও ব্যবসায় আছেন ?'

'ছাড়ব ছাড়ব করছি। কিন্তু পুরুষমানুষেরা কি ছাড়তে দেয় সহজে। তবে হ্যাঁ, আর নয়। এবার এপাড়া ছেড়ে ভালবাসার বাসা বাঁধবো।' সুরবালা আবার হাসল।

মহিলারা নাক কুঁচকে এ ওঁর দিকে তাকালেন। তাঁদের কারো মনে হল তিনি নিজে সুরবালার বয়সী অথচ তাঁর শরীরে ওসব চটক বিন্দুমাত্র নেই। নিশ্চয়ই কোন ওষুধপত্র ব্যবহার করে এরা। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মেয়ে কিছু মনে করে না ?'

'ওমা ! এতকাল পেট ভরেছে, গান শিখেছে যে রোজগারের পয়সায় তাকে খারাপ মনে করতে যাবে কোন দুঃখে। আমরা হলাম গিয়ে অপ্সরা। আমি অবশ্য গান জানি না নাচতেও পারি না তবু দেখলাম পুরুষেরা নেচে গেল এতকাল। অপ্সরার মেয়ে অপ্সরাকে দুষবে কেন ? তাহলে শকুন্তলাও মেনকাকে দুষতো।' সুরবালা নিবেদন করল।

নেত্রী বললেন, 'আপনি তো ভাল কথা বলতে পারেন।'

সুরবালা বলল, 'শুধু শরীর তো দুদিনেই আলুনি, নাচ গান কিংবা কথার নুন না থাকলে খদ্দেররা স্বাদ পাবে কি করে দিদি।'

'চিঠিটা দেখতে পারি ? যেটা প্যারিস থেকে এসেছে।' নেত্রী গম্ভীর গলায় বললেন।

পিন্টো ইতিমধ্যে অনেকগুলো জেরক্স করে দিয়ে গিয়েছিল। তার দুটো ড্রয়ার থেকে বের করে দিল সুরবালা, 'আপনারা ঠিক কি জন্যে এসেছেন জানতে পারলে ভাল হত।'

ততক্ষণে চিঠি দুটো হাতে হাতে ঘুরছে। নেত্রী চশমা মুছলেন রুমালে, 'প্রথমত, মেয়েটিকে যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা কারা ? আন্তর্জাতিক নারীপাচারকারীদের দল কিনা জানা দরকার। এভাবে টোপ ফেললে অনেক সুন্দরীকে পাওয়া যায়।'

সুরবালা একটু ঘাবড়ে গেল। কথাটা তার মাথায় একবারও আসেনি। নেত্রী জিজ্ঞসা করলেন, 'এটা কি কোন রিকগনাইজড সংস্থা ? আপনারা খোঁজ খবর নিয়েছেন ?'

এই সময় মোক্ষদা মিত্তিরদাকে নিয়ে এল। তাগাদায় চলে আসা মিত্তিরদাকে দেখে সুরবালা বলে উঠল, 'শোন, এরা কি বলছে। সুধাকে যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা যদি ওকে পাচার করে দেয় তাহলে কি হবে গো।' মিত্তিরদা হকচকিয়ে গেলেন। নেত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কে ?'

সুরবালা কিছু বলার আগেই মিত্তিরদা বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

সন্দেহটা শোনার পর মিত্তিরদা মাথা নাড়লেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ সুরো, কবি

ওদের এখানে নিয়ে এসেছিল। কবি নিশ্চয়ই ওদের জানে। তাছাড়া পিন্‌টো চিঠি দিয়েছে, উত্তর এলে সেটা ফ্রান্সের সরকারি অফিসকে দেখালেই হবে। ওরা খোঁজ খবর নেবে নিশ্চয়ই।'

নেত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবি কে?'

কবির নাম ভুলে গিয়েছে সুরবালা। সে বর্ণনা দিল। নেত্রী বলল, 'বুঝতে পারছি না। তবে কবিদের কথা সবসময় যে ঠিক হয় তার কিছু মানে নেই। বরং ফরাসী এম্বেসীতে খোঁজ নেওয়া ভাল। কিন্তু আপনি কে সেটা জানলাম না তো!'

সুরবালা কথা বলল, 'ওকে বলেছি বাকী জীবনটা তোমাতে আমাতে থাকব। সম্পর্কটা কি সেটা বুঝে নিন। আচ্ছা, এসেছেন সুধার ব্যাপারে, অথচ সবকিছু জানতে চাইছেন কেন? আপনারা কি পুলিসের লোক যে প্রশ্ন না করে পারেন না!'

মিত্তিরদা বললেন, 'ঠিক কথাই। হ্যাঁ, আপনারা কি জন্যে এসেছেন? যা খবর তা তো কাগজেই ছাপা হয়ে গিয়েছে। আর তো আমাদের কিছু বলার নেই।'

নেত্রী মাথা নাড়লেন, 'না-না। খবর জানতে আমরা আসিনি। আমাদের সমিতি সরকারস্বীকৃত। মেয়েদের ভাল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। জানেন তো, আজকালকার দিনে ভাল করতে চাইলেই কি পারা যায়! ঠিক আছে, সুধারানী দাসীকে একটু ডাকবেন? এর পরের কথাটা ওর সঙ্গেই বলব।'

মিত্তিরদা সুরবালার দিকে তাকালেন। সুধারানীকে না ডেকে সুরবালা সাত তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন যখন তখন তিনি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে পারেন না। সুরবালা নিষ্কৃতি চাইছিল। সে মোক্ষদাকে বলল, 'সুধাকে এখনই আসতে বল, আর পারি না।'

বিরক্তিটা বুঝতে পেরে নেত্রী বললেন, 'অসুবিধে করছি বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদের যা কাজ তাতে তো এমনটা একটু আধটু হবেই।'

মিত্তিরদা বললেন, 'রোজ পাঁচজনে এসে পাঁচরকম কথা বলে যাচ্ছে। দেখবেন এমন কিছু বলবেন না যা ওর মন খারাপ করে দেয়।'

এইসময় বেল বাজল। সুরবালার ইঙ্গিতে মিত্তিরদা বাইরে বেরিয়ে একটি অল্পবয়সী প্যান্টশার্ট পরা মেয়েকে দেখতে পেলেন যার কাঁধে ব্যাগ ঝুলছে। মেয়েটি লোহার গেটের ওপাশ থেকে বলল, 'আমি প্যারাডাইস পত্রিকা থেকে আসছি। আমার নাম কুসুমকলি ঘোষ। সুধারানী দাসীর একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেব।'

চায়ের দোকানে প্যারাডাইস পত্রিকা দেখেছেন মিত্তিরদা। ঝকঝকে ছাপা। সিনেমা স্টারদের ছবি বেশী থাকে। তিনি বললেন, 'কিন্তু এখন তো—।'

'দেখুন ওকে নিয়ে এডিটর কভারস্টোরি করবেন ভেবেছেন। আজ এখনই না হলে বড় দেরি হয়ে যাবে। আর এসব ব্যাপার গরম গরম না হলে পাঠক নেয় না। আমরা এই ইন্টারভিউ-এর জন্যে দুশো টাকা পারিশ্রমিক দেব।' কুসুমকলি জানাল।

'বুঝলাম। এখন নারীকল্যাণ সমিতির সদস্যারা এসেছেন। তাহলে তাঁদের

সঙ্গে আপনাকে বসতে হবে।' দরজার তালা খুলে কুসুমকলিকে ভেতরে নিয়ে এসে মিত্তিরদা বললেন, 'টাকাটা কিন্তু আগেই দিয়ে দিতে হবে। যে জায়গার যা নিয়ম।' কুসুমকলি ব্যাগের চেন টেনে দুটো একশ টাকার নোট বের করে মিত্তিরদার হাতে দিতেই তিনি সে দুটোকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, 'সুরো, এই নাও। দুশো টাকা!'

মুগ্ধ সুরবালা প্রশ্ন করল, 'কিসের গো?'

'ইনি কুসুমকলি, প্যারাডাইস পত্রিকা থেকে এসেছেন সুধার ইন্টারভিউ করতে। ইনিই দিলেন। আসুন ভাই, বসুন।' মিত্তিরদা আপ্যায়ন করলেন, 'ইনি সুধার মা সুরবালা।'

'আপনার দিদিমা গহরজানের বান্ধবী ছিলেন?' কুসুমকলি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাব্বা, আপনি দেখছি সব জানেন এই এত অল্প বয়সে। চুলগুলো কি সুন্দর ছেঁটেছে, না গো? আমিও ভেবেছি ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর অমনভাবে চুল ছেঁটে নেব।' সুরবালা মাথা দুলিয়ে বলল। নেত্রী এতক্ষণ কুসুমকলির প্রবেশ লক্ষ্য করছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্যারাডাইস ইন্টারভিউ-এর জন্যে দুশো টাকা দিচ্ছে! স্ট্রেঞ্জ। কই, গত বছর শাহবানুর মামলাটার ব্যাপারে আমার অতবড় ইন্টারভিউ ছেপে এক পয়সা দিল না তো!'

কুসুমকলি হাসল, 'আপনি?'

'আমি নারীকল্যাণ সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অচলা দস্তিদার।'

'ও। ব্যাপারটা কি জানেন এটা কভারস্টোরি হবে। আপনাদের কথার চেয়ে সুধারানীর ব্যাপারটা মোর কালারফুল, পাবলিক ইন্টারেস্টেড হবে কিনতে। তাই কাগজ খরচ করছে। বিজনেস রিটার্ন না পেলে কেউ খরচ করে, বলুন?'

এবং তখনই সুধারানী এসে দাঁড়াল। আজ সুধারানীর পরনে সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি। এসে বলল, 'মা, ডেকেছ?' সুরবালা হেসে পাশে বসতে বলল ইঙ্গিতে।

নেত্রী চোখ কুঁচকে দেখছিলেন সুধারানীকে। এইবার নড়ে চড়ে বসে মুখ খুললেন, 'কাজের কথাটা আগে সেরে নিই। আপনি বিদেশে যাচ্ছেন। ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। সে বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করছেন?'

সুধারানী হকচকিয়ে গেল, 'ভারতীয় নারী? মানে কি?'

নেত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভারতীয় নারীর মানে বোঝেন না?'

অন্য একজন সদস্যা বললেন, 'একটু ব্যাখ্যা করে দিন অচলাদি। ল্যাক অফ এডুকেশন!'

কুসুমকলি তার আগেই বলে উঠল, 'কথাটা কিন্তু আমার কাছেও কোন মানে তৈরী করে না। ভারতীয় নারী মানে যদি ভারতবর্ষের নারী তাহলে মেঘালয়ের একটি মেয়ের ভাবনার সঙ্গে ভূপালের একটি মেয়ের তো মিল পাওয়া যাবে না। অত দূরের কথা ছেড়ে দিন, গুরুসদয় রোডের একজন মহিলা সোনারপুরের তাঁর বয়সীর ঠিক উল্টো ভাবতে পারেন। ভারতীয় মহিলার ঐতিহ্য—এসব আমরা তৈরী করে নিয়েছি ভাবতে ভাল লাগে বলে। ঠিকই বলেছ ভাই, আমিও মানে বুঝি না।'

'তুমি থামো।' গর্জে উঠলেন নেত্রী, 'তোমাদের মত তথাকথিত আধুনিকাদের জন্যেই দেশটা ধ্বংস হতে যাচ্ছে। গার্গী মৈত্রেয়ীদের কথা ছেড়ে দাও, পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ বেশী অতীতের নন। মা সারদাময়ী মাতঙ্গিনী হাজরার নাম শুনেছ?'

'আমি কিছু বলব না। আপনারা ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন বলুন। একটা প্রচলিত ধারণাকে লালন করে তার মধ্যে সুখে বাস করতে চান যার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই। মা সারদাময়ীকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর মত উদার মন সেই সময়ে ভাবতে পারা যায় না। সেই সময়কার ভারতীয় নারীরা ঐতিহ্য দেখিয়ে বিদেশিনীদের যখন ম্লেচ্ছ বলত তখন তিনি সিস্টার নিবেদিতার জন্যে সোয়েটার বুনেছেন। কিন্তু তিনি কি পেয়েছেন? শুধু স্যাক্রিফাইস করে যেতে হয়েছে তাঁকে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের সামনে গেলে আপনাদের মনে হয় না ওখানে তিনি কি করে থাকতেন? এদেশে নারীর ঐতিহ্য হল পুরুষের স্বার্থ রাখার জন্যে নিজেকে বিসর্জন দেওয়া।' কুসুমকলির মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন নেত্রী, 'সুধারানী এদেশের মেয়েরা যে সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তারা শুধু স্বামীর স্ত্রী বা প্রেমিকের প্রেমিকা নয়, মা, বোন এবং গৃহবধূ এই সত্য ওদের জানাবেন। আমরা আপনাকে এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য জানাবার জন্যে কয়েকটা লিফলেট দিয়ে যাচ্ছি। মন দিয়ে পড়ে দেখবেন। আমাদের মেয়েরা চামড়ার ব্যাগ, বড়ি, আমসত্ত্ব তৈরী করছে যা বিদেশে পাঠাতে শুরু করেছি। কিন্তু ফরাসী দেশে এখনও কোন এজেন্ট তৈরী করতে পারিনি। আপনি ওখানকার মহিলা পরিচালিত সংস্থার সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় বড়ি কিংবা আমসত্ত্বের বিক্রী বাড়াতে সাহায্য করুন।'

'ওরা ভারতীয় ঐতিহ্য কিনবেন?' সুধারানী সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'মানে?' নেত্রীর চোখ আবার ছোট হল।

'বড়ি আমসত্ত্ব বুঝেছি, ঐতিহ্য বুঝিনি।' সুধারানী চোখ বন্ধ করল, 'তাছাড়া ওরা আমার খদ্দেরদের সম্পর্কে বলতে বলেছে। জানেন, আমার খদ্দেররা মা বোন কিংবা ঘরের বউ বলে আমাকে ভাবে না। ওসব ভাবলে কি আর আমার কাছে আসতে পারে বলুন। পিন্‌টোকে বরং সব কথা বলে যান। আমি তো ইংরেজি জানি না, ও আপনাদের কথা ঠিক গুছিয়ে বলবে।'

'পিন্‌টো কে?'

মিত্তিরদা জবাব দিলেন, 'একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোঁড়া। এ পাড়ার মাস্তান।'

'ছি ছি। এতবড় একটা কনফারেন্সে আপনারা ওর সঙ্গে মাস্তান পাঠাচ্ছেন?' তীব্র প্রতিবাদ করলেন নেত্রী, 'আমাদের সমিতিকে জানালে আমরাই একজন শিক্ষিতা মহিলাকে ওর সঙ্গে পাঠাতাম। এটা একটা মিশন। আপনারা এখনও মাস্তানের বদলে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন এবং সেইটেই উচিত কাজ হবে।'

যে সদস্য মাঝেমধ্যে কথা বলছিলেন তিনি বললেন, 'ঠিক। ল্যুভর দেখার ইচ্ছে ছিল ছেলেবেলা থেকে। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

নেত্রী বললেন, 'তুমি চাইলেই তো হবে না, মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক আছে এই কথাই রইল। ব্যাপারটাকে ডিগনিফাইড করতে হবে।' নেত্রী উঠে দাঁড়াতেই আবার বেল বাজল। দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল মোক্ষদা, সেই গেল খুলতে। এবং তারপরেই পিন্‌টো উদয় হল, 'আরে মিত্তিরদা, বহুৎ প্রব্লেম হয়ে গেছে। পাশপোর্ট অফিস সুধারানীকে দেখতে চাইছে। বলছে বাপের নাম চাই। বাপের নাম না থাকলে ওরা পাশপোর্ট দেবে না। মুশকিল হল, আমারটা জানি না, সুধারানীরটা জানেন ?'

'বাপের নাম ?' সুরবালা ঢোঁক গিলল, 'বাপের নাম না বললে ওরা যেতে দেবে না ?'

'পাশপোর্টই দেবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি করেন ? বললাম ব্যবসা। ওর কথা জিজ্ঞাসা করতেও বললাম ব্যবসা। তা তখন একজন ওর নাম পড়ে জিজ্ঞাসা করল, সোনাগাছির যে মেয়ে প্যারিসে যাবে বলে কাগজে বেরিয়েছে এ সেই নাকি ?' আমি হ্যাঁ বলতে ওরা স্পষ্ট বলে দিল পরিচয়পত্র ঠিকঠাক না হলে ওরা পাশপোর্ট দেবে না। আমার কি মনে হয় জানেন, অনেক ভদ্রলোক চেষ্টা করেও বাইরে যেতে পারছে না আর ও এই ব্যবসা করা সত্ত্বেও প্যারিসে যাচ্ছে এটা অনেকে পছন্দ করছে না।'

সুরবালা হতভম্ব হয়ে বলল, 'কি হবে এখন ?'

নেত্রী সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বাপের নাম আপনার জানা উচিত।'

'গ্লাসের জল বালতির জলে একবার মিশে গেলে বলতে পারবেন ঠিক কোন জলটা গ্লাসে ছিল ? ভেবেচিন্তে কথাটা বললেন ?' ঝাঁঝিয়ে উঠে সুরবালা ঘুরে দাঁড়ালো এবার মিত্তিরদার দিকে, 'এই তোমার নামটা ধার দাও না, তাহলেই তো সব মিটে গেল।'

মিত্তিরদা আকাশ থেকে পড়লেন, 'আমার নাম ?'

'বাঃ। সেই বয়সে বিয়ে হলে ওর মত ছেলে মেয়ে হত না তোমার ?'

এতক্ষণ কুসুমকলি সংলাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'মিসেস দস্তিদার, আপনারা তো মেয়েদের স্বাধীনসত্তা নিয়ে আন্দোলন করছেন। সুধারানী যাতে পাসপোর্ট পায় সেটা দেখুন। নইলে তো আর ওর ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচার করতে যাওয়া হবেই না।'

নেত্রী মিত্তিবদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই লিফলেটে আমাদের ঠিকানা লেখা আছে। কাল বিকেল চারটে নাগাদ চলে আসুন। এর মধ্যে আমাদের মধ্যে কে ওর এসকর্ট হয়ে যাবে তা ঠিক করে রাখব। তারপর দেখি ওরা পাশপোর্ট দেয় কিনা। না দিলে রাজ্যব্যাপী একটা জোরদার আন্দোলন শুরু করে দিতে হবে। এস তোমরা।'

মোক্ষদা ওদের পৌঁছে দিতে গেলে পিন্‌টো ফ্যাকাশে মুখে প্রশ্ন করল, 'এসব কি বলল ওরা ? সুধার সঙ্গে এসকর্ট হয়ে কে যাবে ? এরা কে ?'

মিত্তিরদার মন উদাস ছিল। খুব দ্রুত তিনি জড়িয়ে পড়ছেন সুধারানীর সঙ্গে। ওকে যদি নিজের পরিচয়টা দিতে হয় তাহলে ছেলেরা কেলেঙ্কারীর একশেষ করে ছাড়বে। অথচ এখন সুরবালাকে এড়িয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। এতদিন যাহোক দূরে দূরে ছিলেন, এখন এত কাছে এসে আকর্ষণ এড়ানো এই প্রৌঢ়

বয়সে অসম্ভব। পিন্টোর প্রশ্নটা তাঁকে সাহায্য করল কিছুটা। তিনি জানেন পাল্টা আঘাত হানতে পারলে নিজের যন্ত্রণা সাময়িক হলেও কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়, 'শোন, এরা হলেন নারী কল্যাণসমিতির মেম্বার। সুধার সঙ্গে তোমার মত, কিছু মনে করো না, একজন মাস্তান যাচ্ছে বলে এরা আপত্তি করেছে। এরা চায় ওদের কোন শিক্ষিতা সদস্যা সুধার সঙ্গে যাবে। সেই ব্যাপারেই এসেছিল।'

পিন্টো বলল, 'মাস্তান ? খবরটা হওয়ার পর আমি কি মাস্তানী করেছি। এমন কি নিজের বিজনেস পর্যন্ত দেখছি না। এখন ওসব বলে আমাকে কাটিয়ে দেবার মতলব্ ?'

মিত্তিরদা তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'আমি নই, ওই ওরা। ওরাই এসে বলল।'

'যে যাই বলুক, আমাকে যখন কথা দেওয়া হয়েছে তখন আমি যাবই। যদি এর উল্টো পাল্টা কিছু হয় তাহলে সোনাগাছিতে ঢুকলে লাস পড়ে যাবে।'

কুসুমকলি এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে পিন্টোকে দেখছিল এবার সজোরে হাত তালি দিল। ঘাবড়ে গিয়ে পিন্টো তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আপনি একেবারে গব্বর সিং-এর মত ডায়ালগ থ্রো করলেন। আপনি পিন্টো ? ওর এসকর্ট ?'

পিন্টো মাথা নাড়ল। মিত্তিরদা বললেন, 'কুসুমকলি প্যারাডাইস পত্রিকার রিপোর্টার। সুধার ইন্টারভিউ নিতে এসেছে। ঠিক আছে পিন্টো তুমিই যাবে কিন্তু ওর পাশপোর্ট তাহলে তোমাকেই বের করে আনতে হবে। আমরা মাথা ঘামাতে পারব না।'

সুরবালা বলল, 'ঠিক কথা। মেয়ে যাবে। যে নিয়ে যেতে পারবে সেই আমাদের বন্ধু।'

পিন্টো বলল, 'তাহলে মিত্তিরদা সই করে দিন। পুলিশ আসবে এনকুয়েরি করতে।'

'পুলিশ ? আবার পুলিশ কেন ?' মিত্তিরদা চমকে উঠলেন। কুসুমকলি বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিন। যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তা আমি দেখব।'

সুরবালা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সেখানে চেনাজানা আছে বুঝি খুব ?'

'তা আছে। কাগজের লোকদের কে না খাতির করে বলুন।'

সুরবালা উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে তোমরা কাজের কথা বল এখন। তুমি আর পিন্টো আমার সঙ্গে ওঘরে এসো। কথা আছে।'

ঘর খালি হয়ে গেলে কুসুমকলি ডায়েরি খুলল, 'আসুন, এবার আমরা কথা শুরু করি। আমি যে পত্রিকায় কাজ করি তার বেশীরভাগ পাঠক মহিলাই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু পড়ে বেশী ছেলেরাই। যা মজার ব্যাপার হয় না এনিয়ে।' ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল কুসুমকলি, 'আমাদের একটা চিকিৎসার পাতা আছে। মেয়েরা তাদের অসুবিধের কথা জানালে অভিজ্ঞ ডাক্তার সেখানে উপদেশ দেন। একবার এক মহিলা লিখলেন, 'তাঁর ব্রেস্টে শক্ত কিছু হয়েছে। ওটা ক্যানসারের লক্ষণ কিনা।' ডাক্তার জবাব দিলেন। কিন্তু আমাদের সম্পাদকের মনে হল মহিলাকে সাহায্য করা দরকার কারণ তিনি বিধবা। গিয়ে দেখা গেল ওই ঠিকানা ছেলেদের এক মেসবাড়ির আর চিঠি লিখেছেন একজন বৃদ্ধ মেয়ের নামে।'

গল্পটা শোনামাত্র সুধারানীর মুখে হাসি ফুটল। কুসুমকলিকে তার খারাপ লাগল না। কুসুমকলি বলল, 'আচ্ছা, আপনাকে কেন নির্বাচিত করা হল ?'

সুধারানী বলল, 'জানি না। তবে আমার খুব ভয় লাগছে এখন।'

কুসুমকলি জানতে চাইল 'ভয় কেন ? বেশ মজা করে বিদেশে ঘুরবেন।'

'আমি তো কখনও বাড়ির বাইরেই যাইনি তো বিদেশ।'

'সেকি ? এবাড়ির বাইরে যাননি কখনও ?'

'না। মা বলে আমি এখানকার আর পাঁচটা মেয়ের মত খানকী নই। তাই।'

খানকী শব্দটা ঠঙ্ করে কানে বাজল কুসুমকলির। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল দীনবন্ধু মিত্র মশাই পর্যন্ত সাহিত্যে ওই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বয়স এখন কত ?'

'একুশ বছর।'

'উনি আপনার মা ?'

'পাতানো মা। মানে আমাকে মানুষ করেছে মায়ের মত। আসল মা কোথায় কে জানে ? না-না, তার জন্যে আমার কোন কষ্ট হয় না।'

'আপনি শুনেছি গান গান। কি গান ?'

'এই যেমন, 'ভালা বাসাবাসির কথা আর বলো না, কাঁচা প্রেমে আগুন দিয়ে শরীর জ্বেলো না'।

'বাঃ। কে শেখাল ?'

'দিদা। মা অবশ্য গান গাইতে পারে না।'

'তা আপনার কাছে যারা আসে তারা কি গানেই সন্তুষ্ট ?'

'পাগল ! এখন অবশ্য প্যারিসে যাচ্ছি বলে অন্যকথা। আগে শোনার ভান করে ঘরে ঢুকেই বিছানায় যাওয়ার ধান্দা করত।'

'আপনার ভাল লাগে ?'

'কি ?'

'এই নিত্য এক একজন পুরুষের সঙ্গে শোওয়া।'

'মাঝে মাঝে খারাপ লাগে।'

'কাউকে মন দিয়েছেন এর মধ্যে ?'

'কি যে বলেন ? সব তো আমার বাপের বয়সী। এসব গান শুনতে যুবকরা কেউ আসবে ? বুড়োদের মন দিতে যাব কোন দুঃখে !'

'প্রথম কতবছর বয়সে ব্যবসায় নেমেছেন ?'

'পাঁচ বছর আগে। মা একজন অন্ধকে নিয়ে এসেছিল।'

'অন্ধ কেন ?'

'আর আমার কাছে চিনে আসতে পারবে না। আমার মুখ মনে করতে পারবে না। সেদিন আমার প্রথম শরীর নষ্ট হল তো !'

'ও বুঝেছি। আর কোনদিন দ্যাখেননি ওকে ?'

'নাঃ।'

'এখন কত পান এক রাত্রে ?'

'কেন বলব ? ওটা আপনি লিখে দেবেন আর কেউ আমাকে বেশী দেবে না।'

'আপনাদের বাড়ির নিচে কিছু রঙমাখা মেয়েকে এই দিনের বেলাতেই দেখলাম। ওদের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? ওরা আপনাকে জানে?'

'না। আমি কেন ওদের সঙ্গে মিশবো? ওরা ফালতু। রিকশাওয়ালা ঝাঁকামুটেরাও ওখানে বসতে আসে। রোগ হয় আর ভোগে।'

'আপনার কি এই জায়গাটাকে নরক বলে মনে হয় না?'

'ওমা, তা হবে কেন?'

'তাহলে এখান থেকে চলে যেতেও ইচ্ছে করে না?'

'কোথায় যাব? এই তো, মা সল্টলেকে উঠে যাচ্ছে সামনের মাসে। আমি আর মোক্ষদা এই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব তখন। মা বলেছে এখানে আর আসবে না। আর খুব দরকার না পড়লে আমি যেন না যাই।' সুধারানী হাসল।

'আপনি কি শাড়ি পরে যাবেন প্যারিসে?'

'হ্যাঁ। আমার একশ আঠাশটা শাড়ি আছে। তবে কুর্তা পাঞ্জাবিও পরতে পারি। গৌরনিতাই ডাক্তার বলেছে খুব ঠাণ্ডা নাকি সেখানে। আমার আবার একটা শাল ছাড়া গরমজামা কিছু নেই। মা পিন্‌টোকে নিয়ে ধর্মতলা থেকে কিনে আনবে বলেছে।'

'আপনি কি খেতে ভালবাসেন?'

'আলুকাবলি। মোক্ষদা এনে দেয় মোড় থেকে।'

'আপনার ব্যবসার খদ্দেরদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'ভাল। ওরা টাকা না দিলে আমরা কোথায় যেতাম বলুন।'

'কেউ কেউ তো খারাপ ব্যবহার করে, তখন?'

'তখন মোক্ষদা এসে খিস্তি করে। মোক্ষদাকে পুলিশও ভয় পায়।'

'পুলিশ আসে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে এলে গান শুনতে হবে তাই আসে না। মার কাছে আসে।'

'এই ব্যবসায় আছেন উনি, মা বলতে খারাপ লাগে না?'

'ওমা, খারাপ লাগবে কেন? তাহলে তো আমাকেও কেউ পরে মা বলে ডাকবে না।'

ভাড়াটে সমেত তিননম্বর কিনে নিয়েছে শাওনরাম আগরওয়াল। দরদস্তুর যা করার তা সুরবালাই করেছিল। সোনাগাছিতে কোন বাড়ি বিক্রী হচ্ছে জানতে পারলে চড়ুই পাখিও শকুন হয়ে যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে কয়েকটি বাড়ির মালিকানা এখনও মেয়েদের দখলে আছে। কিন্তু তাদের মুশকিল হল বিক্রী করতে গিয়ে কাগজপত্র খুঁজে পায় না। ফলে সেগুলো চুপিসাড়ে হাত বদল হয়ে যায় মাত্র। কিন্তু সুরবালার বাক্সে কাগজ ছিল। তার মা এই কাজটি বুদ্ধিমতীর মত করে গিয়েছিল। বিক্রী থেকে পাওয়া টাকায় সল্টলেকের বাড়ি শেষ হয়েছে। সুরবালা উঠে যাবে সেখানে আগামী মাসে। তবে শাওনরাম কোন ভাড়াটেকে তুলবে না। নিচের তলার খুপরি ঘরে যে সব মেয়েরা থাকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দোতলার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে শাওনরামকে, অন্য অংশে সুধারানী থাকবে মোক্ষদাকে নিয়ে। তার জন্যে মাসিক ছশো টাকা ভাড়া বরাদ্দ হয়েছে। শাওনরাম সুরবালাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার। আজ বিকেলে এল তাগাদা দিতে সে

খোশমেজাজে।

শাওনরামকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই একতলার মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। যদিও তারা জানে গায়ের জোরে শাওনরাম যদি তাদের তুলতে চায় তাহলে সোনাগাছির সমস্ত মেয়ে রুখে দাঁড়াবে। তবু শঙ্কা একটা থেকে যায়ই। তারা সবাই একসঙ্গে নমস্কার, নমস্তে, আইয়ে, বলে সম্ভাষণ করতে লাগল। দরজায় দাঁড়িয়ে শাওনরাম তাদের দেখল। বেশীর ভাগকেই ছাইমাখা কইমাছের মত দেখাচ্ছে। বিশ তিরিশ বড়জোর চল্লিশের ইনকামগ্রুপে পড়ে এরা। শাওনরামের পেছনে ঢোলগোবিন্দ দাঁড়িয়ে। তার হাতে খাতায় ভাড়াটেদের নাম লেখা। প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে ঢোলগোবিন্দ বলল, 'যাদের নাম পড়ছি তারা বাঁ দিকে চলে যাও।'

নাম পড়া শেষ হলে দেখা গেল ডানদিকে তখনও পাঁচজন দাঁড়িয়ে। শাওনরাম পানবাহার মুখে ঢেলে প্রশ্ন করল, 'এরা কারা ঢোল?'

ঢোলগোবিন্দ কিছু বলার আগেই বাঁ দিকের একজন বলে উঠল, 'আমাদের বোন হয়। এখানে বেড়াতে এসেছে। আপনাব আপত্তি আছে?'

'বেড়াতে এসে মুখে রঙ মেখেছে কেন? দুনম্বরী বিজনেস আমার এখানে চলবে না। যে ঘর ভাড়া নিয়েছে শুধু সে ব্যবসা করবে, তার মেয়ে ভি না মা ভি না। সমঝে! বলো, আমি কোন্ ইললিগাল বাত বললাম?' মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করল শাওনরাম। কিন্তু তার চোখ ঘুরছিল। যে কটা সামনে আছে তাদের কাউকেই মেয়েছেলে বলে মনে হয় না। শালা, পুরুষদের নজর আজকাল খুব নিচু হয়ে গিয়েছে। উত্তর আসছিল না ওপাশ থেকে। সিঁড়িতে পা রেখে শাওনরাম বলল, 'ঢোল, ওদের বলে দাও এই মাস আমি কিছু বলব না। সামনের মাসে আমি আমার বাড়িতে লিগাল ব্যবসা চাই ব্যস।'

মোক্ষদা দাঁড়িয়েছিল দরজায়, দেখামাত্র খুলে দিল। খুব বিনীতভঙ্গীতে শাওনরাম বলল, 'মালিকান এখন কি করছেন?'

'কলে ঢুকেছে। স্নান কবছে।' মোক্ষদা জবাব দিল।

'ওহো।' চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাল শাওনরাম। তারপর বলল, 'বসতে পারি?'

মোক্ষদা মনে মনে বলল, ঢ্যামনা! তারপর ঘরে নিয়ে গেল ওকে। ঢালাও গদিতে বাবু হয়ে বসে শাওনরাম দেখল ঢোলগোবিন্দ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে তৎক্ষণাৎ হাত নেড়ে ইশারা করতে ঢোলগোবিন্দ নিচে চলে গেল। এতে খুব খুশী হল ঢোল। কারণ নিচের তলার মেয়েগুলোই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে আনন্দে তা সে জানে। মালিক তো তার চোখেই দেখবে। শাওনরাম বলল, 'সুধারানী কোথায়? একটু ডাকো না তাকে!'

মোক্ষদা উত্তর দিল, 'সুধা এখন ঘুমাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় খুব বড় আসর আছে আজ।'

'তাতো থাকবেই। এখন ইন্ডিয়া ফেমাস। আমার এই বাড়ির কিস্মত বেড়ে গেল। দ্যাখো না, ঘুম যদি ভাঙ্গে। ঘুমঘুম চোখের মেয়েছেলে দেখতে আমার খুব পছন্দ হয়। যাও ভাই।'।

মোক্ষদাকে যেতেই হল। কিন্তু সুধারানীর বদলে এল সুরবালা। তার স্নান

হয়েই গিয়েছিল। গলিতে গাড়ি থেকে শাওনরামের নামবার খবর আগেই পেয়েছিল। শাওনরাম কেন এসেছে তা তার জানা। ইচ্ছে করে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল স্নানের কথা বলে। এখন অবশ্য যে কোনদিন সে এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ সুধারানীর নামডাক হবার পর তার নিজের রোজগারও এমন বেড়ে গেছে যে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না মোটেই। অন্তত সুধারানীর রওনা হবার আগে তো নয়ই। কথাটা লোকটাকে বুঝিয়ে বলা দরকার। কিন্তু শাওনরাম অতি ঘোড়েল লোক। প্রথমদিন দরদস্তুর করে বায়নার টাকা ধরিয়ে বলেছিল, 'এবার আপনার রাতের দাম বলুন মালিকান। বাড়ির দামের সঙ্গে রাতের দাম আমি এক করে বিপদে ফেলতে চাই না।' হাতে তখন অনেক টাকা ধরা, একঘণ্টা পরে হলেও যা বলতে পারত তা তখন পারেনি সুরবালা। বলেছিল, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

শাওনরাম হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'ওয়াদা করলেন যখন মনে রাখবেন কথাটা। আজ নয়। আমি যখন চাইব তখনই আপনার রাতটাকে কিনে নেব আমার যা ইচ্ছে দামে।' বলে চলে গিয়েছিল। তারপর যতবারই এসেছে কাজের কথা বলেছে, মুখ ফসকেও রসিকতা করেনি। সুরবালার ক্রমশ ধারণা হয়েছে লোকটা ওদিন কথার কথা বলেছিল। সব পুরুষই যে শোওয়ার ধান্দায় এখানে আসে তা নয়। যেমন কবি। কিন্তু মোক্ষদা যখন তাকে জানাল শাওনরাম নিচে মাথা গুণছে তখন তার অস্বস্তি শুরু হল। যে টাকার স্রোত এখানে আগবাড়িয়ে ঢুকছে সুধারানীর কল্যাণে সেটাকে বন্ধ করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া একবার সল্টলেকে গেলে তো এসব ধান্দা ছেড়ে দিতে হবে। তখন জমানো টাকার সুদে বসে বসে খাওয়া। স্নান হয়ে গিয়েছিল সুরবালার। চটপট ব্লাউজ খুলে ফেলে শাড়িটাকে এমনভাবে জড়িয়ে নিল যেন দেখলে মনে হয় এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে সাজুগুজু মেয়ের যেমন চটক আছে তেমনি আলুথালু মেয়েলি ভঙ্গী ছেলেদের চোখের মনি বড় পছন্দ করে।

দরজায় পৌঁছে সুরবালা চমকে ওঠার ভঙ্গী করল, 'ওমা, আপনি।' বলে যেন সচেতন হয়েছে এমন বোঝাতে আঁচলের অনেকটাই বুকে চেপে ধরল। সুরবালা জানে এইসময় তার শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে কাপড় সরে যাবেই এবং সাদা নরম চামড়ায় শাওনরামের চোখ আটকাবেই। শাওনরাম সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, 'বুঝতে পারিনি অসময়ে এসে পড়েছি। মাপ করবেন।'

'নাঃ না অসময় কি! আমার স্নান তো হয়েই গেছে। উঃ, যা গরম পড়েছে!' সুরবালা খানিকটা তফাতে এমনভাবে বসল যাতে শাওনরাম দেওয়ালে আটকানো বড় আয়নায় তার এপাশটা ভাল ভাবে দেখতে পারে। চোখের লজ্জা তো সামনাসামনি। শাওনরামের সামনে কাপড় পুঁটলি করে আড়াল তৈরী করলেই সেই লজ্জা চুকলো। আয়না দিয়ে কেউ যদি এপাশটা দেখে ফেলে তাতে তার কোন দায়িত্ব থাকছে না। শাওনরাম চোখ খুলল। সম্ভবত দৃষ্টি এড়াতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করল, 'খবরের কাগজে পড়েই মনে হল চলে আসি। কি সৌভাগ্য। আপনার বাড়ি কেনার পরেই কিন্তু এই খবর হল। সোনাগাছিতে অনেক ঘর আছে সেখানকার কাউকে তো ডাকেনি। লোকে

বলে মাটির তলায় নাকি সোনা আছে। তা যেখানে খুঁড়বে সেখানেই কি সোনা পাবে। আমার কপাল সোনারখনি পেয়ে গেছি। কথা বলতে বলতে তার নজর যাচ্ছে আয়নায়। সুরবালা কখনই আয়নার দিকে তাকাবে না। চোখাচোখি হয়ে গেলেই ঘোড়েল বুঝে যাবে কায়দাটা। সে মাথা নিচু করে বলল, 'সবই আপনাদের আশীর্বাদে। বলুন কি সেবা করতে পারি।'

'সেবা ? সেবা আর করলেন কই ! ও হ্যাঁ। আপনি তো এক তারিখেই চলে যাচ্ছেন ? তারপরেই দোতলাটায় মিস্ত্রি লাগাবো।' শাওনরাম কথা বলছিল থেমে থেমে।

'এক তারিখের মধ্যে চলে যাব বলে তো হাত ধুয়ে বসে আছি। কিন্তু—।'

'কিন্তু মানে ?' চোখ কুঁচকে গেল শাওনরামের।

'না না। আপনি যদি চান তো চলে যাবই। আপনার বাড়িতে আমরা থাকব কোন অধিকারে ?'

মাথা নিচু করার মুহূর্তে সুরবালা এমন ভাবে হাত সরাল যাতে বাঁ দিকের কাপড় আরও সরে আসে। শাওনরাম সেদিকে তাকিয়েই এবার প্রশ্ন করল, 'কেন, কোন প্রব্লেম হয়েছে ?'

'ওই যে, আপনি যাকে সৌভাগ্য বললেন তাই আমার সর্বনাশ। ওইটুকু বাচ্চা মেয়ের কাছে দলে দলে রোজ এত লোক নানান ধান্দায় আসছে, ওর পক্ষে কি সামলানো সম্ভব ? খবরের কাগজের লোক, সিনেমার লোক, নারী সমিতির লোক ! আমি চলে গেলে ও পাগল হয়ে যাবে। আরে বাবা ওকে তো পরে ব্যবসা করে খেতে হবে, নাকি ! কি যে করি !' সুরবালার মুখ বিমর্ষ দেখাল।

শাওনরামের জিভ শুকিয়ে আসছিল। সে বলল, 'সুধারানীকে তো আমি দেখতেই পাই না। সারা দুনিয়ার লোক ওকে দেখবে, দেখছে আর আমি বাদ। এটা হবে কেন ?'

'নিশ্চয়ই দেখবেন। কিন্তু ওই একটা অসুবিধে। মেয়ে আমার প্রতিজ্ঞা করেছে প্যারিস থেকে ফিরে আসার আগে ও সব করবে কিন্তু কারো সঙ্গে—।' হেসে গড়িয়ে পড়ল সুরবালা। এবং সেইসময় শাওনরামের চন্দ্রদর্শন সম্ভাবনা দেখা দিল। আয়নায় তার চোখ যেন সেঁটে গেছে এখন। সুরবালা সুকৌশলে নিজেকে ঢেকে নিতেই শাওনরামের নিঃশ্বাস পড়ল তৎক্ষণাৎ। সে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'পকেটের পয়সা ঢেলে বাড়ি কিনেছি, কিন্তু কতদিন ফেলে রাখব বলুন। এখন অনেকেই সুধারানীর ঘরটা ভাড়া নিতে আমার কাছে আসছে। ওরা ডাবল টাকা দিতে চাইছে। আমি কেন কম করব বলুন। আপনি কদিন সময় চেয়েছিলেন, আমি বিরক্ত করতেও আসিনি।'

'আমি কিন্তু খুব আশা করেছিলাম।' সুরবালা হাওয়াটাকে আবার নিজের দিকে ফেরাতে চাইল।

'দেখুন। মিষ্টিওয়ালা যেমন মিষ্টি খায় না তেমনি আমি এখানে ওই ধান্দায় আসি না। ব্যবসা করি, পয়সা বানাই ব্যস। কিন্তু সুধারানীকে একবার দেখবার বাসনা হল আজ !' মাথা নাড়ল শাওনরাম 'ঠিক আছে। কবে ছাড়বেন এই বাড়ি।'

হঠাৎ সুরবালার চোখ বন্ধ হয়ে এল। তার ঠোঁট কাপতে লাগল। সেদিকে

তাকিয়ে শাওনরাম খুব ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে। কি হল আপনার ?'

সুরবালার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে। শাওনরাম কাছে এগিয়ে এল। ঈষৎ কাঁপা হাতে সুরবালার কাঁধ ধরে জিজ্ঞাসা করলা, 'হায় রাম, আমি কি অন্যায় করলাম। কি হয়েছে আপনার ?'

নিজের শরীর প্রায় এলিয়ে দিয়ে সুরবালা বলল, 'আমার নরকবাস হবে।'

'কেন ? কি করেছেন আপনি ?' শাওনরাম শক্ত করে তাকে ধরতে যেতেই দূরে সরে বসল সুরবালা। তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন আমার একটা রাত নেবেন। ওই প্রতিজ্ঞা রাখার সুযোগ না পেলে আমার নরকবাস হবে। এ ক্ষতি কেন করছেন আমার ?'

শাওনরাম কি বলবে বুঝতে পারছিল না। আর এইসময় কর্কশ শব্দে কলিং বেল বেজে উঠল।

শব্দটা কানে যেতেই সুরবালা তীব্র গলায় বলে উঠল, 'মোক্ষদা, বলে দাও আমার শরীর খারাপ।'

এইসময় মোক্ষদার শরীর ভারী হয়ে আসে। যেহেতু ঘরের পর্দা ফেলা নেই তাই দরজার কাছেই তাকে পাহারায় থাকতে হয়। সুরবালার মায়ের আমল থেকে সে এই বাড়িতে আছে। কিন্তু সে সুধারানীর কাছে প্রায়ই বলে থাকে আলোময়ীর এলেম তার মেয়ের মত ছিল না। এই বয়সে একটা বাইশ বছরের ছেলেকেও সুরবালা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি করে তুলতে পারে। সে এতক্ষণ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল শাওনরাম বধ হতে চলেছে। সুরবালা জানে মরে গেলেও মোক্ষদা দরজায় উঁকি মারবে না। সে এখন বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকার মতই স্বাভাবিক। কিন্তু গলার স্বরের ওঠানামা শুনে মোক্ষদা বলে দিতে পারে নাটক কতদূর এগোলো। চোখ বন্ধ করে বারান্দায় বসে তাই শুনতে শুনতে মশগুল হয়ে পড়েছিল সে। বেলের শব্দে তারও মেজাজে বিরক্তি এসে গেল। কয়েক পা উঠে দরজাটা খোলার আগেই সে ধন্দে পড়ল। পিন্‌টো এসেছে। এ বাড়িতে কয়েকদিনেই পিন্‌টোর খাতির যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে ওকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। পিন্‌টো বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হল, দরজা খোল।'

মোক্ষদা কোনরকমে বলল, 'মা ব্যস্ত আছে।'

'ব্যস্ত আছে মানে ?' বলেই পিন্‌টো ঘড়ি দেখল, 'যা বাব্বা। ঠিক আছে, সুধারানীর সঙ্গে কথা বলব। খুব জরুরী কাজ।' ওর গলার স্বর ভেতরের ঘরেও পৌঁছে গেল। শাওনরাম কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কেন ?'

সুরবালা জবাব দিল, 'পিন্‌টো। পিন্‌টোকে চেনন না ?'

শাওনরাম পিন্‌টোকে দেখেছে কয়েকবার। সরাসরি কথা হয়নি। এপাড়ার মাস্তানদের সামলে নেবার ব্যাপারটা ঢোলগোবিন্দের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল সে। বলল, 'সাহেব মাস্তান ? এখানে কি ব্যাপার ? তোলা আদায় করতে এসেছে নাকি ? বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে তো।'

সুরবালা ততক্ষণে শাড়ি সামলে নিচ্ছিল। আঁচলটাকে পিঠের ওপর

এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল যে জামার অভাব বোঝা যাবে না চট করে। গলা তুলে বলল, 'খুলে দাও।' তারপর নিচু গলায় জানাল, 'না-না-ও এখানে ঝামেলা করে না। সুধার যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছে ও। তাহলে ওর যাওয়া পর্যন্ত আপনি চুনকাম করবেন না কথা দিন।' শাওনরাম বলল, 'বেশ। কিন্তু সুধারানীর ভাড়াটা বাড়াতে হবে তুমি চলে যাওয়ার পর।'

এইসময় পিন্টো এসে দরজায় দাঁড়ালো, 'মিত্তিরদা এখানে আসেনি?'

সুরবালা মাথা নাড়ল, 'না। কেন, কি হয়েছে?'

'পাশপোর্ট অফিসার কালকেই সুধারানীকে নিয়ে যেতে বলেছে। সঙ্গে ছবি লাগবে অনেকগুলো। ছবি আছে ওর? পাশপোর্ট সাইজ?' পিন্টোর চোখ শাওনরামের ওপর।

'ছবি? হ্যাঁ। বড় ছবি আছে। আর একটা আমার সঙ্গে।'

'দূর! পাশপোর্ট সাইজ। তাহলে ছবি তোলাতে হবে। রেডি হতে বলুন। আমি আন্দাজ করে ক্যামেরাম্যানকে ডেকে নিয়ে এসেছি। ওই কুসুমকলি খুব হেল্প করেছে।'

সুরবালা উঠল। উঠেই বলল, 'পিন্টো, একে চেন? ইনি এই বাড়ি কিনেছেন?'

'অ। তাই বলুন। আপনাকে কয়েকদিন দেখেছি। পরে আপনার সঙ্গে একটা হিসাব মেটাতে হবে। আপনার ওই ম্যানেজারটা দুনম্বরী মাল। সোনাগাছিতে ব্যবসা করে খেতে গেলে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে এটাই জানে না।' পিন্টোর মুখ শক্ত হয়ে এল।

শাওনরাম পিন্টোকে লক্ষ্য করছিল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক ঠিক। চলি আজ। সুধারানী বিলেত থেকে ঘুরে এলে ওর কাছে আরও রইসী আদমি আসবে। তখন বেশী ভাড়া দিতে ওর মোটেই গায়ে লাগবে না।' শেষ কথাটা সুরবালার উদ্দেশ্যে। পিন্টোর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল শাওনরাম, 'ব্যবসা করতে গেলে হাত মেলাতে হয় জানি। তবে তার আগে দেখতে হবে হাতটা ঠিক হাত কিনা। দুনম্বরী হাত হলে আঙ্গুলগুলো পাউডার হয়ে যাবে শাওনরামেব কাছে। ব্যাস?'

লোকটাকে চলে যেতে দেখল পিন্টো। হুমকিটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। রাগে শরীর জ্বলছিল তার। মুখ লাল হয়ে উঠল। সে এখনই ইচ্ছে করলে ওই লোকটাকে সোনাগাছির মধ্যে আটকে রাখতে পারে। ওর ম্যানেজাব বিরজুর সঙ্গে লাইন করেছে। কিন্তু এই তল্লাটটা বিরজুর নয় তাই জানে না। পিন্টো এক ঝটকায় সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই সুরবালা পড়ি কি মরি করে ওকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এল। পিন্টো শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে সুরবালার নরম মাংসল শরীরের স্পর্শে সংকুচিত হয়ে হার মানলো, 'ওই হারামির বাচ্চাটাকে আমি ছাড়ব না!'

সুরবালা তখনও বাঁধন আলগা করেনি, 'তোমার মাথায় কি আছে? ওসব গোলমাল বাধালে তুমি প্যারিসে যেতে পারবে? সুধারানী পাশপোর্ট পাবে? এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখ। তারপর তো বদলা নোবার দিন পড়েই রইল।'

কথাটা মাথায় ঢুকল পিন্টোর। সে নিজেই ঠিক করেছে ফালতু ঝামেলায়

এখন যাবে না। তাতে কিছু কেস যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে না তা নয়। কিন্তু বড়বাবুই তাকে উপদেশ দিয়েছে যাতে এমন কিছু না করে যার জন্যে কেউ ওর নামে ডায়েরি লেখায়!

ফলে অনেক কিছু মেনে নিতে হচ্ছে তাকে। এই লোকটা যতই বড়লোক হোক সোনাগাছি হল সোনাগাছি! এখানে কোন মশলা চলবে না। নিঃশ্বাস ফেলল পিন্টো। এখন যদি একটা ব্যাঙও তাকে লাথি মারে তো মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে। জীবনে এই সুযোগ আসবে না তার। পাশপোর্ট ভিসা হাতে না আসা পর্যন্ত মার খেয়ে যেতে হবে চুপচাপ।

সুরবালা ততক্ষণে পিন্টোকে ছেড়ে দিয়েছে। শাওনরামের সঙ্গে কোন ঝামেলা হোক তা সে চায়নি। এক রাত্রের রোজগারের বিনিময়ে যদি এক মাসের আয় বাঁচানো যায় তবে সেটা যে বেশী লাভের এ হিসাব তার করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শাওনরামকে ঠাণ্ডা কবতে আজই সে বাধ্য ছিল,কিন্তু মনের সায় ছিল না। শাওনরাম তাকে পয়সা দিত না, সে নিতেও পারত না। আর বিনি পয়সায় ব্যাপার তাকে খুব মন খারাপ করে দিত। সেদিক দিয়ে পিন্টো আসায় সে বেঁচে গেছে। কিন্তু পিন্টো ঝামেলা পাকালে তার দায় সুরবালার ঘাড়ে পড়তই। পিন্টোর রাগ পডছে দেখে সে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল পোশাক ঠিক করতে। যাওয়ার আগে সুধারানীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেল বাইরের ঘরে যেতে। নিজের ঘরে পৌছে সুরবালা কাপড়টা শরীর থেকে ফেলে দিল। সামনেই প্রমাণ সাইজের আয়না। সেদিকে তাকিয়ে তার মন আবার হঠাৎ ভাল হয়ে গেল, যদ্দিন শ্বাস তদ্দিন আশ। যতক্ষণ দেহ ততক্ষণ মোহ। সন্ন্যেসিনী হতে তার বয়েই গেছে!

সুধারানী পিন্টোকে দেখতে পেল। পিন্টো বলল. 'রেডি?'

'কি ব্যাপার?' সুধারানীর বেশ মজা লাগে পিন্টোকে দেখলে। লোক বলে মনে হয় না কখনও। এবং এই প্রথম একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের চোখে সেই ভাষা ফুটতে দ্যাখে না সে যা তাকে প্রতিটি সন্ধ্যেবেলায় দেখতে হয়।

'তোমার ছবি তুলতে হবে। ক্যামেরাম্যান এসেছে নিচে।'

'ওমা। না-না আমি ছবি তুলবে না। ইস!' নাক কোঁচকাল সুধারানী।

'যা ব্বাবা। ছবি তুলাবে না কেন?'

'খুব বিশ্রী হয়, পেত্নীর মত দেখায়।' সুধারানী মুখ ফিরিয়ে নিল।

হো হো করে হেসে ফেলল পিন্টো। সুধারানী ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকাল। কোনরকমে নিজেকে থামিয়ে সুধারানীকে বলল পিন্টো, 'ছবি তুলে না দিলে তোমার পাশপোর্ট হবে না। অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ওটা দেওয়া হয়নি। তা ছবিতে যদি পেত্নী আসে তো সেই পেত্নী যাবে। প্যারিসে ঢোকার আগে ওরা তোমার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবে তুমিই সেই লোক কিনা। চুলটুল ঠিক করে মুখে পাউডার দিয়ে এস।'

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে প্রচুর তাগাদার পরে সুধারানী যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল তখন পিন্টো হতভম্ব। সুরবালা তখন কর্তৃত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফটোগ্রাফারের সামনে । দেখে বলল, 'বাঃ। কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে সুধা। চন্দ্রচূড়টা পরেছিস। দ্যাখো মোক্ষদা, ভারি মানিয়েছে না! নতুন আতর

মেখেছিল, না ? এটার গন্ধ ঠিক আগেরটার মত নয়।'

লজ্জিত ভঙ্গীতে সুধারানী দাঁড়িয়েছিল। তার সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, পরনে উজ্জ্বল বেনারসী, মাথার চুলে পাতাকাটা এবং সেখানে নানারকম শিল্পকর্মের চিহ্ন। পিন্টো বলল, 'যাঃ শালা!' গলার স্বরে হতাশা এমন স্পষ্ট যে সুরবালার ভ্রূ কুঁচকে উঠল, 'কি হল ?'

'এসব চলবে না। এই সাজে ওর চেহারা পাল্টে গেছে। এই ফটো দিলে প্যারিসে ঢুকতে দেবে না। কারণ তখন ওরা চিনতে পারবে না।' পিন্টো জানাল।

সুধারানীর মুখ শুকিয়ে গেল, 'এত কষ্ট করে যে সাজলাম!'

ক্যামেরাম্যান বলল, 'সাজাসাজি চলবে না। সিম্পল, ভেরি সিম্পল হতে হবে। শুধু মুখ উঠবে ছবিতে। তবে এই সাজের ছবি আমি স্পেশ্যালি তুলে দিতে পারি। বড় করে ঘরে বাঁধিয়ে রাখলে খদ্দেরদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

সুরবালা বলল, 'তাই রাখো। এত সুন্দর সেজেছে, একটা ছবি থাকবে না!'

পিন্টো হতাশ হল, 'আরে এ ক্যামেরাম্যান! এখানে তুমি বিজনেস লাগাচ্ছ ? তোমাকে এনেছি পাশপোর্ট সাইজের ছবি তুলতে।'

ততক্ষণে ক্যামেরা সাজিয়ে ফেলেছে ক্যামেরাম্যান। সব চুকিয়ে পাশপোর্ট সাইজের জন্যে সাধারণ সাজের ছবি তুলতে আধঘণ্টা লেগে গেল। সুরবালা বলল, 'খুব ভাল সাজ হয়েছিল তোর। আবার ওটা করে নে। আজ যারা আসবে তারা চোখ মেলে দেখুক খানদান কাকে বলে। আমার মা অবিকল তোর মত সাজত রে!'

সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়ল পিন্টো। পাশপোর্টের ফর্মে দুজন স্থানীয় বিখ্যাত লোকের নাম চাই। সোনাগাছিতে কে বিখ্যাত তাই বের করা মুশকিল। সন্ধ্যেবেলায়'নেশা' জমজমাট। মিত্তিরদা ক্যাশে। দোকানে তাকে ঢুকতে দেখেই সবাই চোখ তুলল। পিন্টো মিত্তিরদাকে বলল, 'দুটো নাম চাই।'

'কি রকম ?'

'পাশপোর্টে দিতে হবে। ভদ্রলোকের। যারা আমাদের চেনে।'

মিত্তিরদা মাথা নাড়লেন, 'গৌরনিতাই ডাক্তারের কাছে যাও। উনি রাস্তা বলে দেবেন।'

পিন্টোর ব্যাপারটা ভাল লাগল না। মিত্তিরদা এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সুরবালা অচেনা। কদিন বাদেই তো সল্টলেকে একসঙ্গে থাকবে। অথচ সুধারানীর জন্যে গা ঘামাতে চাইছে না। সে ইচ্ছে করেই বলল, 'কাল আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?'

'কোথায় ?' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল মিত্তিরদা পিন্টোর সঙ্গে এখানে কথা বলতে চাইছেন না।

'পাশপোর্ট অফিসে। সুধারানীকে নিয়ে যেতে বলেছে।' নামটা একটু জোরে উচ্চারণ করল পিনটো। চট করে মুখ তুলে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে মিত্তিরদা বললেন, 'বলতে পারছি না। তুমি পরে না হয় একবার ঘুরে এস।'

পিন্টো আর দাঁড়াল না। এই সব লোকগুলো হেভি দুনম্বরী হয়। সোনাগাছির মেয়েছেলের সঙ্গে এককালে প্রেম করতিস, পাড়ায় মাস্তানি

চালাতিস, বুড়ো বয়সে তার ওপর বডি ফেলতে যাচ্ছিস অথচ পাঁচজনের সামনে স্বীকার করতে লজ্জা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিন্টোর মনে হল এই পৃথিবীটাই জালি মানুষে ভর্তি হয়ে গেছে। নাম লেখানো মেয়েদের বোঝা যায় কিন্তু ভদ্রলোক সেজে থাকা মানুষগুলোকে একদম নয়। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে আসতে সে পেছন ফিরল। তারই দুই চ্যালা পিলি আর আমেদ আসছে ওপাশ দিয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে পিলি বলল, 'এই যে বস, কোথায় থাক তুমি আজকাল। টুঁড়ে টুঁড়ে জান কয়লা হয়ে গেল।'

'কি হয়েছে?' স্বভাবেই পিন্টোর শরীর শক্ত হয়ে এল। সে গন্ধ পাচ্ছে।

'সাতনম্বরে একটা মাল আজ কালের মধ্যেই টেঁসে যাবে।'

'কি নাম?'

'পদ্মা। ওই যে যার তিনবার সয়ারাম গয়ারাম হয়েছিল। ডাক্তার বলে গেছে আর চান্স নেই। হাসপাতালেও যাবে না। বাড়িওয়ালির সঙ্গে কথা বলতে হবে বিরজুর আগেই।'

'তোরা যা। কথা বল।'

'তুমি গেলে কাজ হয়ে যেত।'

'তাহলে তোরা কি জন্যে আছিস। যা পাবি নিজেরা শেয়ার করে নিবি।'

'তুমি নেবে না?' পিলির চোখ বিস্ফারিত।

'কাজ তোরা করবি আমি নেব কেন?'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমেদ বলল, 'কি ব্যাপার বলতো বস? ডালমে জরুর কালা হ্যায়! পার্টি ফিট করে রেখেছ নাকি ঘরটার জন্যে?'

পিন্টো হাসল, 'শোন, দু পাঁচশো টাকার জন্যে পিন্টো আর হুজ্জুতি করবে না।'

পিলি আরও এগিয়ে এল 'তাহলে নিউজটা সত্যি? তুমি বিলাত চলে যাচ্ছ?'

'দুর! ওসব এখনও বহুৎ দেরী!' পিন্টো বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি। তোরা ঠেকে ওয়েট করিস।' সে হাঁটতে শুরু করল। সোনাগাছিতে খদ্দের আসা এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ট্যাক্সিগুলো কাঁচ তুলে ঢুকছে। মাঝে মাঝে ঢাকা রিকশায় বাবুরা আসছে। দালালগুলো রকে রকে ওৎ পেতে রয়েছে। ওকে দেখে তারা চিৎকার ছুঁড়ছে, 'গুড মর্নিং ওস্তাদ।' শালাদের মর্নিং হল এই সন্ধ্যেবেলা। দলে দলে মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় দরজায়। এই একটা জায়গায় ইলিয়ট রোড রিপন স্ট্রিটের সঙ্গে সোনাগাছির পার্থক্য। ইলিয়ট রোডে কেউ রাস্তায় দাঁড়ায় না। খালিকুঠিতে রিক্সা করে এসে সবাই জড়ো হয়। দালাল খদ্দের ধরে নিয়ে আসে সেখানে। বড় হল ঘরে মেয়েগুলো বসে থাকে। তার মধ্যে যাকে পছন্দ তাকে নিয়ে খদ্দের ছোট ঘরে ঢুকে যায়। একদম বাজারি ব্যাপার। সোনাগাছিতে খদ্দের এলে সে বেশ ঘরোয়া যত্ন পায়। ফুটের দোকান আর রেস্টুরেন্টের মত ফারাক এ দুটোয়। হঠাৎ ওপরের একটা জানলা থেকে কে ডেকে উঠল, 'পিন্টো।'

মুখ তুলে তাকাতেই সে ল্যাংড়া শিবেকে দেখতে পেল। ল্যাংড়া শিবে

কিছুদিন হল নূরজাহানকে বিয়ে করেছে। ওটা নূরজাহানের ঘর। ল্যাংড়া শিবে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল গুরু।' পিন্‌টো তাকে ইশারা করল নেমে আসতে। তারপর চারপাশে তাকাল। দুটো অল্প বয়সী ছোকরা ঢুকেছিল বোধহয় মেয়ে দেখতে। সেন্ট্রাল এভিন্যু থেকে চিৎপুরে যাওয়ার জন্যে সর্ট কাট করার নামে এই রাস্তায় এসে মেয়ে দেখে যায়। ওপাশের রকের মেয়েরা তাদের বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছে। পরপর তিনদিন নাকি তাদের দেখছে ওরা। পিন্‌টো গা দিল না। ছেলেদুটো ইঁদুরের মত পালিয়ে যাচ্ছে। ল্যাংড়া শিবে নেমে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে, 'তোমার কাছে যাব ভাছিলাম, দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হল! ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বারমানি ম্যানসনে পুলিশ রেইড হয়? খুব ভয়ে ভয়ে আছি তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

'কেসটা খুলে বল!'

'বিনোদকে তো তুমি চেন! ও রোজ নূরজাহানকে নিয়ে যাচ্ছে বারমানি ম্যানসনে। ওকে কলেজ গার্ল সাজাচ্ছে। ওখানে জাহাজিরা আসে। কোন এক বুড়ির ফ্ল্যাট। ডেইলি দেড়শ টাকা রোজগার। রাত বারোটায় ফিরিয়ে দেয়। রোজগার ডাবল বলে আমি আপত্তি করি না। ভাবলাম গুরুর তো ওদিকে ভাল জানপয়চান— !' ল্যাংড়া শিবে বউ-এর জন্যে সত্যি উদ্বিগ্ন।

'পুলিশ ধরে নিলে পরদিন ছাড়া পাবে ল্যাংড়া, কিন্তু এইড্‌স ধরলে তুমিভি খতম। শালা, বউকে জাহাজিদের কাছে পয়সার লোভে পাঠানোর রস বেরুবে। ফোট্‌!' পিন্‌টো আর দাঁড়াল না। বড় বড় পা ফেলে গৌরনিতাই ডাক্তারের চেম্বারের দিকে হাঁটতে লাগল।

সন্ধ্যের পর থেকেই গৌরনিতাই ডাক্তারের চেম্বারে মন্দা আসে। তখন তিনি টেবিলে দু পা তুলে মনে মনে ভাগবত পড়েন। দু-পাঁচটা বেতো খদ্দের এলে দেখতে হয়। তাঁর আসল পসার হল সকাল নটা থেকে দুটো আবার বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা। সয়ারাম গয়ারামের জন্যে ছুঁচ তাঁকে দিতে হয় একডজন প্রতিদিন। লুকোনো যৌনরোগ তিনি কখনই বাইরে চাউর করেন না। তাঁর হাতে এসব ব্যাপার সেরে উঠতে বেশীদিন সময় নেয় না। দ্বিতীয় যে রোগটি এখানকার মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী তা হল নিতান্তই মেয়েলি সমস্যা। বেচারারা ভোগে তাতে এবং নিতাই ডাক্তার তাদের আরামের ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় রোগটি চামড়ার। চর্মরোগে আক্রান্ত হয় অনেকেই। চতুর্থ রক্তাল্পতাজনিত নানান উপসর্গ। এটি বেশী বয়সে হলে কারো কারো মস্তিষ্কে অস্থিরতা দেখা যায়। গৌরনিতাই এই নিয়ে আছেন। তাঁর ফি কম। এবং পাড়ায় পাড়ায় খাতির খুব। কিন্তু একটা কাজ গৌরনিতাই ডাক্তার কিছুতেই করেন না। কেউ ছুরি খেলে বা বোমে কারো হাত পা উড়ে গেলে তিনি তাকে স্পর্শ করেন না। সোজা হসপিটালে নিয়ে যেতে বলেন। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকে ঝামেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যাদের নিয়ে ব্যবসা তারা ওঁর পেছনে বলে কেউ কিছু করতে পারেনি। আর এই কারণেই যে ও সি থানায় আসুক গৌরনিতাই ডাক্তারকে খাতির না করে পারে না।

পিন্‌টোকে দেখে গৌরনিতাই পা নামালেন না। চশমার ফাঁক দিয়ে বললেন, 'সাহেবের কি হল?'

'কিছু হয়নি। দোকানটা খোলা রেখেছেন কেন ?'

'রাখি। রাখতে ভাল লাগে। মতলব কি ? এই দোকান বন্ধ করে তোমার বাবা কি লাভ ? আমি বেঁচে থাকতে কোন মেয়েকে কি এখানে বসাতে পারবে বলে ভেবেছ ?'

'ফালতু বকছেন। আমি অন্য ধান্দায় এসেছি। মিত্তিরদা পাঠালেন সুধারানীর ব্যাপারে।'

পা নামালেন গৌরনিতাই, 'ব্যাপারটা কি বল তো হে ? শুনলাম তুমি আর মিত্তির নাকি ঘন ঘন মা-বেটির কাছে যাচ্ছ। তোমাকে শুনলাম প্যারিস পাঠাচ্ছে, আর মিত্তিরকে সল্টলেকে।'

'মিত্তিরদার কথা জানি না। তবে আমি যাচ্ছি ফাদারল্যাণ্ড দেখতে। শুনুন, আমি তো বেশী ভদ্রলোকদের জানি না। মিত্তিরদা বলল আপনি নাকি ভদ্দরলোক। এখানে সই করুন।'

'ভদ্দরলোক ? আমি !' গৌরনিতাই হো হো করে হেসে উঠলেন, 'এম বি বি এস করে সোনাগাছিতে কোন ভদ্রলোক পড়ে থাকে না। বস্তুটা কি ?'

'পাশপোর্টের অ্যাপ্লিকেশনে দুজন ভদ্রলোকের সই লাগবে।'

'বাঃ। সই করলাম আর তারপর তুমি বিরজুকে চাকু মেরে যদি হাওয়া হয়ে যাও ?'

'আপনি দেখছি বিরজুর খবরটা জানেন ?'

'আমার কাছে সব খবর আসে। সব পেট এখানে ফাঁস।'

'আপনার ভয় নেই। বিদেশ থেকে ঘুরে না এসে চাকু হাতে নেব না।'

গৌরনিতাই হঠাৎ পকেট থেকে কলম বের করে দুটো কাগজেই সই করে ঠিকানা লিখে দিলেন, 'আর একটি ভদ্রলোককে কোথায় পাবে ?'

'বলে দিন আপনি।' পিন্টো বৃদ্ধকে লক্ষ্য করছিল।

'দ্যাখো, এ পাড়ার সবচেয়ে বড় ভদ্রলোক হল কাউন্সিলার সাহেব। তার কাছে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।' বলে গৌরনিতাই ডাক্তার দু কলম লিখে দিলেন। সেটা নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পিন্টোর মনে হল ডাক্তারকে একটা থ্যাঙ্কস জানানো উচিত ছিল। কিন্তু মুখে বলতে তার খুব বিশ্রী লাগল।

কাউন্সিলারের বাড়িতে সে কোনদিন যায়নি। ওটা নিতান্তই ভদ্রলোকের পাড়া এবং সোনাগাছি থেকে বেশ দূরে। পিন্টোর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। এতদূরে একা একা আসা ঠিক হয়নি। শত্রু ছড়িয়ে আছে চারধারে। সোনাগাছি ম্যানেজ করতে গেলে তো সাধু হয়ে থাকা যায় না। সে কাউন্সিলারের বাড়িটা খুঁজে বের করে স্বস্তি পেল কিছুটা। কাউন্সিলার একা ছিলেন না। মাঝবয়সী টাকমাথার ভদ্রলোক। তাঁর চামচেরা কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। গৌরনিতাই ডাক্তারের চিঠি পাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন কাউন্সিলার, 'কি চাই ? ক্যারেকটার সার্টিফিকেট ?'

'না। আমাদের এই দুটো ফর্মে যদি সই করে দেন, পাশপোর্টের।'

'পাশপোর্ট। বাংলাদেশ যাওয়া হবে ? থাকো কোথায় ?'

'আজ্ঞে সোনাগাছি। তবে বাংলাদেশ নয়, প্যারিসে।'

'অ্যাঁ ? কি বললে ? সোনাগাছি থেকে প্যারিস !'

'ওই যে কাগজে দ্যাখেননি, সুধারানী দাসীকে নিমন্ত্রণ করেছে।'

'আই সি। কিন্তু তোমাদের তো আমি চিনি না। লাস্ট ইলেকশনে আমার হয়ে খেটেছিলে ? খাটনি ? কত নম্বরের সুধারানী ?'

'তিন নম্বরের।'

'যতীন, দ্যাখো তো, লাস্ট ইলেকশনে তিন নম্বরে সুধারানী বলে কেউ আমাকে ভোট দিয়েছিল কিনা ! না না এ অন্যায়। চিনি না জানি না !'

যতীন নামক লোকটি দ্রুত কাগজপত্র দেখে জানাল, 'তিন নম্বরের সুধারানী দাসীর নামে ফলস ভোট পড়েছিল। আমরা ধরেছিলাম ঠিক সময়ে।'

'তবে ?' ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন কাউন্সিলার।

পিন্‌টো লোকটার মুখের দিকে তাকাল। সে কি বলবে বুঝে উঠল না। এখন এখান থেকে কেটে পড়লে কেমন হয় ! অমনি কাউন্সিলার বললেন, 'ভোট দেয়নি কেন ? না, ভোট দিলে আমাকে দিতে হবে তাই। আরে ফলস ভোট দিয়েও তো আমাকে হারাতে পারলি না। ভোট দেওয়া একটি পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার। না দেওয়া পাপ। কেন ভোট দেয়নি ? উত্তর দাও।'

'শরীর খারাপ ছিল। মেয়েদের শরীর খারাপ নিয়ে কোন কথা বলা যায় ?'

'অ। কিন্তু এবার আমি হারতে হারতে জিতেছি কেন ? কারণ তোমরা আমাকে ব্যাক করোনি। সোনাগাছিতে আমার পার্টি জীবনে হারেনি। আমি হারলে—, ছি ছি ছি।'

'আমি লাস্ট ইলেকশনে কোন দলে ছিলাম না। আপনার চামচেরা আমাদের সঙ্গে দু নম্বরী করার ধান্দায় ছিল আবার ওদিকের পকেটে মাল্লু ছিল না।'

কাউন্সিলারের মুখ চিন্তিত দেখাল। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে যতীনের দিকে তাকালেন ইশারা করে। যতীন এগিয়ে এসে কানে কানে বলল, 'সোনাগাছির এদিকের মাস্তান। ভাল ভোট আছে।'

কাউন্সিলার এবার গলা তুললেন। সেটাকে বেশ দরাজ শোনাল, 'তোমাদের কি মুশকিল জানো, যখন কোন সমস্যা হয় তখন সোজা আমার কাছে চলে আসো না। আমার লোকজন যদি ভুল করে তবে আমি আছি। তা কিসে নাম দিতে হবে বললে ?'

'পাশপোর্ট ফর্ম। এমনি নাম দিয়ে দিলেই হত। পুলিস পরে আপনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু আমি আপনার একটা সার্টিফিকেটও ফর্মের সঙ্গে দিতে চাই।'

কথাগুলো শোনার পর কাউন্সিলার ঠোঁট মুড়লেন, 'এতে আমার কি লাভ হবে ?'

'মানে ?' সত্যি এবার ওঁকে ধরতে পারল না পিন্‌টো।

'তুমি চলে যাবে মেয়েছেলেটাকে নিয়ে প্যারিস। ভোটের সময় আমি কলা চুষবো ?'

'আমি তো চলে আসছি। যাব আর আসবো। ওখানে থাকার পয়সা পাব কোথায় ?'

'শোন, সোনাগাছিতে এককালে কথার খুব দাম ছিল। তুমি যদি কথা দাও আমাকে কমসে কম শ'তিনেক ভোট ব্যবস্থা করে দেবে তাহলে সার্টিফিকেট

দিতে পারি।'

পিন্‌টো অনেক কষ্টে হাসি চাপল। ব্যালট বক্সে যখন মেয়েরা ভোট দেবে তখন কে জানবে কাকে দিচ্ছে! আজকাল কারো পকেটে ভোট থাকে না। তবু এদের ধারণা কেউ কেউ ভোট যোগাড় করে দিতে পারে। সে গম্ভীর মুখে বলল, 'ওর বেশী পাবেন। আপনি আরামসে ঘুমান।'

সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলার চোখ বন্ধ করলেন, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না। করলে তিনটে ইলেকশন জিততে পারতাম না। কিন্তু চেষ্টা যদি না করো তাহলে ওখানে ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে যাবে। তোমরা যারা ওখানে দাঁড়িয়ে মাস্তানি করো তারা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের বাবারা থাকে বাইরে। যতীন, দুটো প্যাড নিয়ে এসো।'

সকাল থেকে মিত্তিরদার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মোক্ষদা দুবার ঘুরে এল। সুরবালা সুধারানী এবং পিন্‌টো তৈরী। মিত্তিরদা এলেই যাওয়া হবে। দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ঘড়ি দেখতে দেখতে ক্রমশ অসহিষ্ণু হচ্ছিল পিন্‌টো। সুরবালা বলল, 'হারামিটা গেল কোথায়? যখনই আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করি তখনই ডুবিয়ে দেয়। যৌবনের স্বভাব এখনও পাল্টালো না।' সুধারানীর একটুও ভাল লাগছিল না বের হতে। যৌবনে পা দেবার পর এ বাড়ির বাইরে না গিয়ে গিয়ে ও এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এখন যাওয়াটাকে ঝামেলা বলে মনে হচ্ছে। সে মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল। পিন্‌টো বলল, 'আর দেরি করা যায় না। চলুন।'

ওরা নিচে নামতেই মেয়েরা চমকে উঠল। একই বাড়িতে থেকে সুধারানীর দর্শন তারা কখনও পায়নি। সকাল দশটায় যে যেমন বেশে ছিল ছুটে এল। সুরবালা চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হচ্ছে কি অ্যাঁ? পরেশনাথের মিছিল যাচ্ছে নাকি?'

কিন্তু ততক্ষণে নানান মন্তব্য ছিটকে উঠছে, 'দেখতে কি এমন!' 'শরীরটা ভাল।' 'গান গায় বলে সাহেবরা ডেকেছে।' পিন্‌টো একটা হুঙ্কার ছাড়ামাত্র রাস্তা পরিষ্কার হল। ওরা ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। তিন নম্বরের সুধারানী আজ রাস্তায় বেরিয়েছে। পিলপিল করে মেয়েরা ছেলেরা ছুটে নেমে আসছে। ড্রাইভারের পাশে বসে পিন্‌টো হুকুম করল, 'তাড়াতাড়ি চালা। শালারা ফিলিম স্টার দেখছে যেন।' গাড়িটা যখন গতি বাড়িয়েছে তখন কেউ ছড়া কাটলো, 'সঙ্গে মেয়ে জামাই, শাউরির কত কামাই।' কানে যাওয়া মাত্র পিন্‌টো চাবুকের মত ঘুরে বসছিল, সুরবালা বলল, 'ছেড়ে দাও। পেছনে কত কুকুর ডাকে। চোখ টাটাচ্ছে, আমাদের আর কিছু না হোক বড্ড চোখের রোগ হয়তো।'

বিডন স্ট্রিটের মুখে পাতাল রেলের কাজের জন্যে নিত্য জ্যাম হচ্ছে এখন। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে যাওয়া মাত্র নিজের নামটা চিৎকৃত হতে শুনল পিন্‌টো। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা মিত্তিরদা এখন গাড়ি কাটিয়ে দ্রুত কাছে এসে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে উঠে বললেন, 'উঃ, আর একটু হলেই মিস করতাম। সেই উল্টোডাঙ্গা থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছি।'

সুরবালা সরে বসল সামান্য, 'সেই চুলোয় কি হয়েছে?'

'আমার মাসী মৃত্যুশয্যায়। দেখে এলাম। শেষ বাঁধন ঘুচে যাচ্ছে। এমন

আর কেউ আর রইল না যে আমাকে আদর করে নাম ধরে ডাকবে। ডাক নামটা ডাকার কেউ রইল না।' মিত্তিরদা ফোঁস করলেন।

'কেন ? আমি কি মরে গেছি ? তোমাকে গাবু বলে আমিও তো মাঝে মাঝে ডাকি।' সুরবালা ঝাঁঝিয়ে উঠতেই মিত্তিরদা চুপ করে গেলেন। পিন্‌টো সামনের আয়না দিয়ে লোকটাকে দেখছিল। এবং একদম আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লো, 'আপনার জন্যে দেরি হয়ে গেল। খুঁজছি দেখে হরিয়া বলল আপনি বিডন স্ট্রিটের ফুটে দাঁড়িয়ে আছেন। তা সেটা আধঘণ্টা আগের কথা।'

মিত্তিরদা হকচকিয়ে গেলেন। আড়চোখে সুরবালার দিকে তাকিয়ে বললেন 'যাঃ। আমি ছিলাম মাসীর বাড়ি আর আমাকে দেখলেই হল!'

সুরবালা বলল, 'একসঙ্গে সোনাগাছি থেকে বেরুতে তোমার লজ্জা হচ্ছিল নাগো! মনে হচ্ছে এখনই ট্যাস্‌কি থেকে নামিয়ে দিই। কিন্তু তোমাকে আর ছাড়ছি না। তুমি কত মাসী মারতে পারো দেখি!'

মিত্তিরদা দুর্বল প্রতিবাদ করলেন, 'এ্যাই পিন্‌টো, কে কি বলল, মাইরি, মহা মুশকিল!'

গাড়ি চলছিল সেন্ট্রাল এভিন্যু দিয়ে। সুধারানী হাঁ হয়ে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর আর মানুষ দেখছিল। হঠাৎ সে উল্লসিত হয়ে বলল, 'ওটা সিনেমা হল, না ?'

সুরবালা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। এককালে কত ম্যাটিনি শো দেখতে এসেছি ওখানে।'

পিন্‌টো ভেবে পাচ্ছিল না সুধারানী চিনল কি করে। যে কখনও বাড়ির বাইরে বের হয়নি সে কি করে চিনবে। প্রশ্নটা করতেই সুধারানী বলল, 'আমি সব জানি, মোক্ষদা বলেছে।'

মিত্তিরদা যেন নিজের অপরাধ ঢাকতেই বললেন, 'আচ্ছা, সুধা বাড়িব বাইরে যায় না কেন ?'

'ওকেই জিজ্ঞাসা কর। কত বলেছি, চল আমাদের সঙ্গে রিক্সার ঘেরার মধ্যে হাতিবাগানে যাবি আর সিনেমা দেখেই ফিরে আসবি। তবু হ্যাঁ বলবে না। সেই ছেলেবেলায় একবার মোক্ষদার সঙ্গে গলিতে হাঁটতে গিয়ে রিক্সার ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তারপর আর কে মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করতে পারে। দ্যাখোনা দু হাতে সিট আঁকড়ে বসে আছে।'

পিনটো মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই সুধারানী লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল কিন্তু হাতের আঙুল আলগা করল না।

পাশপোর্ট অফিসে বেজায় ভিড়। বেঞ্চিতে বসে সুধারানী অবাক হয়ে দেখছিল। এত মানুষ পাশপোর্ট নিতে এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাবে বলে। কয়েকজন লোক ঘুরে ঘুরে ওদের দিকে দেখছে। বিশেষ করে সুরবালাকে। এবং সে একটি আবিষ্কার করল এখানে আর যেসব মেয়েরা এসেছে তাদের চালচলন পোশাক এবং কথাবার্তার সঙ্গে সুরবালার কোন মিল নেই। সে নিজেরটা বুঝতে পারছে না কিন্তু সুরবালার পোশাক তো খুব ভদ্রই তবু এত আলাদা কেন ? আর সেই কারণেই কি ওরা এদিকে বারংবার তাকাচ্ছে। পিন্‌টো ভেতরে গিয়েছে। মিত্তিরদা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে একটু জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করছেন। এই সময় দুটি ছেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা

করল, 'নমস্কার কিছু মনে করবেন না, আপনি কি সুধারানী দাসী ?'

সে কিছু বলার আগেই সুরবালা মুখ খুলল, 'হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে ?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটির একজন অপরজনকে বলল, 'দেখলি ? আরে শালা, আমার চোখ অত ভুল করে না।' দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'প্যারিসে যাওয়ার ব্যাপারে এসেছেন ?' সুধারানী মাথা নাড়তেই ভিড় জমে গেল। ওরা মাঝখানে আর পাবলিক চারপাশে। এমন কি সুরবালা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেল। এত লোক একসঙ্গে হ্যাঁ করে তাদের দেখছে। কাপড় টেনেটুনে বসেও অস্বস্তি যাচ্ছে না। লোকগুলো দেখছে আর কুলকুলিয়ে হাসছে। সুরবালা বুঝল এখানে রাগারাগি করে কিছু হবে না। সুধারানীর কিন্তু মজা লাগছিল। এই সময় হঠুন, সরে যান বলতে বলতে পিন্‌টো ভিড় সরিয়ে সামনে এসে বলল, 'উঠে আসুন। ডাকছে। মিত্তিরদা কোথায় ? মিত্তিরদা ?'

ওপাশ থেকে মিনমিনে আওয়াজ ভেসে এল, 'এই যে !'

এবার সুরবালা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কি পুরুষমানুষ। বউ মেয়েকে পাঁচ ভূতে চাটছে আর উনি দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছেন। এসো এদিকে।'

জনতাকে পেছনে রেখে ওরা অফিসারের ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোক বৃদ্ধ। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বসুন। এটা নিয়ম নয়। আপনারা আবেদন করলে আমরা সিকিউরিটি কন্ট্রোলের কাছে পাঠিয়ে দিই সত্যতা জানতে। কিন্তু আপনাদের কেসটা নিয়ে কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে বলে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। পুলিস অবশ্যই যাবে রিপোর্ট তৈরী করতে। আপনি দুজন রেসপেক্টবল মানুষ, আপনাদের লোকালিটিতে থাকেন এমন মানুষের সার্টিফিকেট এনেছেন ?'

পিন্‌টো তাড়াতাড়ি বড় খাম থেকে চারটে সার্টিফিকেট বের করে দিল। গত রাতে কাউন্সিলারের কাছ থেকে ফিবে আবার গৌরনিতাই ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল।

অফিসার একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ভাল করেছেন। কাউন্সিলার এম· এল এ সার্টিফাই করলে আমাদের সুবিধে হয়। প্যারিস থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেছে সেগুলো দিন।'

পিন্‌টো আবার এগিয়ে দিল সমস্ত কাগজপত্র। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপনি ডেভিড ল্যাম্ব ? ব্র্যাকেটে পিন্‌টো কেন ?'

'ওইটে ডাক নাম, সবাই চেনে।'

'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার মায়ের মা অরিজিনাল ব্রিটিশ ছিলেন। দাদু ইণ্ডিয়ান। আবার আমার মা একজন অস্ট্রেলিয়ানকে বিয়ে করে চলে গেছেন।'

'রেশনকার্ড আছে ?'

'আছে স্যার। এই যে।'

সেটায় চোখ বুলিয়ে অফিসার বললেন, 'এটা তো অন্য কারো হতে পারে। আপনি কি করে নিজেকে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হিসেবে প্রমাণ করবেন ? ডেভিড ল্যাম্ব অন্য মানুষ যদি বলি ?'

'কিছু করার নেই। তবে বিডন স্ট্রিট পার হলে যে কেউ বলবে আমি এদেশের নাগরিক।'

'বার্থ সার্টিফিকেট আছে ?'
'ওটা যে আমারই তার কোন প্রমাণ নেই স্যার !'
'আপনি কেন যাচ্ছেন বিদেশে ?'
'সুধারানীর এসকর্ট হিসেবে।'
'আর কেউ নয়, আপনি কেন ?'
'ও আমাদের ঘরের ছেলের মত, তাই।' সুরবালা উত্তর দিল আগ বাড়িয়ে।
'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আপনার ঘরে কি করে ছেলে হয়ে ঢুকল ?'
'আমাদের ওখানে জাতপাত নেই।'
অফিসারের মুখ গম্ভীর হল। তিনি শেষ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে কোন পুলিস কেস আছে ? আদালতে যাওয়া-আসা করতে হয় ? সত্যি কথা বলুন।'
'না স্যার। ও সি আমাকে খুব ভালবাসেন।'
'সর্বনাশ ! এত লোক থাকতে আপনাকে তিনি কেন ভালবাসতে যাবেন ?'
'এই এমনি।'
অফিসার এবার সুধারানী দাসীর আবেদনপত্র বের করলেন, 'আপনি সুধারানী দাসী ?'
সুধারানী অত্যন্ত নার্ভাস ভাবে মাথা নাড়ল। এরকম পরিবেশ তার কাছে অভিনব লাগছিল।
'আপনার বাবার নাম ?'
'গাবু মিত্তির।' সুরবালা চটপট জবাব দিল।
'আপনি বলছেন কেন ?'
'বাঃ। বাপের নাম মা যদি না বলে দেয় তো মেয়ে জানবে কি করে ?'
'উনি তো জেনেই গেছেন এতদিনে, ওকে বলতে দিন। মায়ের নাম ?'
'সুরবালা দাসী। মা, তুমি দাসী তো ?'
'হ্যাঁ। মিত্তির লিখি না।' সুরবালা ঠোঁট টিপল।
'কেন ?'
'গান বাজনার অসুবিধে হয়। বড় বড় শিল্পীরা বিয়ের পরও আইবুড়ো সেজে থাকে না নামে ?'
'আপনি ?'
মিত্তিরদা কিছু বলার আগেই সুরবালা বলল, 'ওর বাবা।'
'আঃ। আপনি অনর্গল কথা বলছেন ? ওদের বলতে দিন। কি করেন আপনি ?'
প্রশ্নটা মিত্তিরদাকে। তিনি জবাব দিলেন, 'ব্যবসা। চায়ের দোকান।'
'অ। মেয়ে কি করে ?'
'গান বাজনা নিয়ে থাকে।'
অফিসার মুখ তুলে তাকালেন, 'কাগজে অন্য কথা লিখেছে।'
সুরবালা বলল, 'কি লিখেছে দেখেছি। আমাদের কয়েক মেয়েছেলের ঘরানা। সোনাগাছিতে আমরাই গান বাজনা নিয়ে থাকি। আপনি একদিন এসে শুনে যেতে পারেন।'

অফিসার এক মুহূর্ত ভাবলেন, 'রেশন কার্ড আছে ? আপনাকে বলছি ?'

পিন্টো সুধারানীর রেশনকার্ড এগিয়ে দিল। সেটা দেখে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্যারিসে যে সম্মেলনটা হচ্ছে সেটা কি তা এখন সবাই জানি। শুধু গান গাইছেন বলে ওরা আপনাকে ডেকে পাঠাল কেন ? আমার প্রশ্নটার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?'

সুধারানী মাথা নিচু করল। তারপর বলল, 'জানি না। কার মনে কি আছে জানা যায় ?'

অফিসার কাঁধ নাচালেন, 'পুলিস কখনও আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?'

'নাতো। কেন নিয়ে যাবে ?'

'কেন নিয়ে যাবে সে কথা আপনার নিশ্চয়ই ভাল জানা আছে।'

'জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আর আমি কি করে জানব।'

অফিসার এবার সোজা হয়ে বসলেন, 'এখন আপনারা যেতে পারেন।'

পিন্টো অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে জানতে চাইল, 'স্যার, পাশপোর্ট পাবো তো ?'

অফিসার জবাব দিলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পাবেন।'

এই সময় দরজা ঠেলে কুসুমকলি ঢুকল, 'আসছি।'

'আরে ! আপনি আবার কেন ?' অফিসারের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট।

'এদের কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে এডিটর পাঠালেন লেটেস্ট ডেভলপমেন্ট জানতে। ওরা কি ভাবে পুট করেছে বলতে আপত্তি আছে ?'

'না। এরা ক্লেইম করছেন স্বামী-স্ত্রী আর ইনি এদের মেয়ে।'

কুসুমকলি হেসে উঠল, 'চমৎকার। আইডেন্টিটি নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না। ত্রিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছে এমন নাইনটি পার্শেন্ট স্বামী-স্ত্রী প্রমাণ করতে পারবেন না যে তাদের বিয়েটা আইনসম্মত। আবার আপনিও সেটাকে নয় বলতে পারবেন না।'

অফিসার হাসলেন, 'আমি ওর বার্থ সার্টিফিকেট চাইতে পারি। সেখানে বাবার নাম লেখা থাকে। রেশন অফিসের ফাইল ঘাঁটতে পারি। সেখানে কি লিখেছে দেখা যেতে পারে।'

'সব জায়গায় যদি ওর বাবার নাম একই পান।'

'তাহলে কিছু করার নেই।'

'মনে হচ্ছে এই কেসটায় কিছু করলে সেটা নিয়ে কাগজগুলো উল্টোপাল্টা করবে।'

'দিস ইজ ব্যাড। আপনারা শুধু স্ক্যাণ্ডাল নিয়েই আছেন।'

'নট এ্যাট অল। এদেশে কিছু মানুষ কাজকর্ম, তা যাই হোক, করবে এবং সরকার তা মেনে নেবেন অথচ ওরা যদি আপনাদের কাছে প্রপার আইডেন্টিফিকেশন চায় তাহলেই আপনাদের খারাপ লাগবে, এইটে চলতে পারে না। এরা ভোট দেয় অতএব দেশের নাগরিক। যদি কোর্ট কেস না থাকে তাহলে আপনারা পাশপোর্ট কেন ইস্যু করবেন না এ প্রশ্ন আমরা তুলতে পারি।' কুসুমকলি বেশ উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

'আমি কিন্তু এখনও ডিনাই করিনি।' অফিসার বললেন, 'আপনাদের তো যেতে বলেছি।'

'যাবে কি করে ? বাইরে তো প্রচুর জনতা সিনেমা দেখতে এসেছে। পুলিস ডাকুন।'

'সেকি ?' অফিসার কুসুমকলির কথায় চমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার ?'

'শী ইজ নাউ রিয়েলি ভি আই পি। এদেশের মেয়ে প্যারিস যাচ্ছে— !'

'এজন্যে আপনারা দায়ী। মিছিমিছি পাবলিসিটি দিয়েছেন।'

'ফিল্ম স্টারদের যখন দিই তখন তো কিছু বলেন না।'

প্রায় আধঘন্টা পরে পুলিস ওদের ঘিরে বের করে এনে তুলে দিল ট্যাক্সিতে। বের হবার সময় জনতা সিটি মারল, চিৎকার করল। সুধারানীর চিবুক বুকে ঠেকছিল। মিত্তিরদার মনে হচ্ছিল মাটিতে মিশে যাওয়া ঢের ভাল। পিনটোর মেজাজ চড়ছিল আর সুরবালা খুশীতে ডগমগ করছিল। কিছুদিন আগে সোনাগাছিতে একটা ছবির শুটিং হয়েছিল। সেখানে নায়িকাকে দেখতে এমন ভিড় হয়েছিল। এইরকম আওয়াজ করছিল সবাই। গাড়িতে উঠে সে তাই হাত নাড়ল জনতার উদ্দেশ্যে।

মিত্তিরদা চলন্ত গাড়িতে বসে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কাকে হাত নাড়লে ?'

'নাড়তে হয়। দেখলে না, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ল।' সুরবালা জবাব দিল, 'আমি সুরশ্রী সেনকে হাত নাড়তে দেখেছি অমন করে।'

পিন্‌টো রুমালে মুখ মুছল, 'আপনারা বাড়িতে ফিরে যান, আমি একটু সামনে নামবো। মনে হয় পাশপোর্ট পেয়ে যাব। কুসুমকলি খুব ফাইট করেছে।'

মিত্তিরদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবে এখন ?'

'আমার পুরোন পাড়ায়। কাল রাত্রে ল্যাংড়া শিবের বউ ফেরেনি।'

'ফেরেনি মানে ? কোথায় গিয়েছে ?'

'বারমানি ম্যানসনে। একবার খোঁজ নিতে হয়।'

'এইসব ঝামেলায় না গেলেই নয় ? তোমার এখন একটু ফ্রি থাকা উচিত।'

পিন্‌টো মুখ ঘোরাল, 'দাদা, মাল্লু চাই। সব ওকে হয়ে গেলে পাঁচশো ডলার কিনতে হবে। পাঁচশো ডলার মানে সাড়ে ছয় হাজার টাকা। সেটার ব্যবস্থা করতে হবে না ? বাঁ দিকে রাখবি গাড়িটা।'

কাগজপত্র মিত্তিরদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিন্‌টো নেমে দাঁড়াতে মনে মনে গালাগাল দিলেন তিনি। এখন এদের নিয়ে একসঙ্গে পাড়ায় ঢুকতে হবে।

কিড স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছিল পিনটো। অনেকদিন পরে এই তল্লাটে এসে অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। তার শৈশব কেটেছে রিপন স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, ফ্রি স্কুলে। বালকবেলায় এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরির জন্যে কত মার খেয়েছে মায়ের কাছে। ওদের সেই বাড়িটা এখন নেই। বারঘরের ভাড়াটেরা কেউ কারো মুখ দেখত না। শুধু দোতলার মিসেস জোন্স বলতেন মাকে, 'ট্রাই টু লিভ দিস কান্ট্রি। এখানে থাকলে তোমার যৌবন গেলে আমার মত দশা হবে। কেউ আসবে না, চার্চে গেলে কথা বলবে না, শুকনো রুটি আর আলু খেয়ে থাকতে হবে। ওদের ঘরে ব্যব্যস্থা ছিল অভিনব। সোফা চেয়ার টেবিল, একপাশে পর্দার আড়ালে রান্নার ব্যবস্থা। টয়লেট ছিল মিসেস জোন্সের সঙ্গে কমন। ওই একটি ঘরের দেওয়াল থেকে মাঝামাঝি আর একটা সিলিং বসিয়ে নিয়ে সেখানে খাটের

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিচে দাঁড়ালে সিলিংটাকে হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যেত। দেওয়ালের একপাশে সিঁড়ি টাঙানো থাকত। শোওয়ার ব্যাপারটা ওপরেই হত। কিন্তু মায়ের বয়ফ্রেন্ডরা এলে তার ওপরে যাওয়া নিষেধ ছিল। সোফায় বসে ওপরের খাটের আওয়াজ শুনতো সে। মিসেস জোন্সের কাছে তাকে রেখে মা একদিন ভাইজাগে গিয়েছিল এক জাহাজির সন্ধানে। আর ফেরেনি। পরে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি চিঠি লিখেছিল মা। পিনটোকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই শেষ। চিঠিতে মায়ের কোন ঠিকানা ছিল না। ততদিনে তাদের জিনিসপত্র বিক্রী করে টাকা নিয়েছে মিসেস জোন্স। ওদের ঘরে ভাড়াটে এসে গিয়েছিল। মিসেস জোন্সের কাছে ছিল সে কয়েকমাস। তারপর বুড়ি চোখ বুঁজতেই সে ভাসতে শুরু করেছিল।

ভাসতে তাকে হবে আজীবন, পিনটো জানে। কিন্তু ফোকটে যখন প্যারিসে যাওয়ার চান্স পাওয়া যাচ্ছে তখন কোন শালা তা ছাড়ে। এখন একটু ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করতে হবে, এই যা।

বারমানি ম্যানসনের সামনে আসতেই এই দিনদুপুরে রিক্‌শাওয়ালাগুলো ঘণ্টা বাজালো। হাসি পেল পিনটোর। বেশিদিন না থাকলে মানুষ কেমন ভুলে যায়। সে কোনোদিকে না তাকিয়ে বড় গেট দিয়ে ম্যানসনে ঢুকল। বিশাল বাড়ি। লম্বায় অনেকটা। ভেতরে কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে। স্বনামে বেনামে এখানে কত লোকের যে ফ্ল্যাট রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! অথচ এই বাড়ির কেউ কাউকে চেনে না। এইসময় পিনটো কামুকে দেখতে পেল। ইলিয়ট রোডের খালিকুঠির দারোয়ান ছিল একসময়, এখন সম্ভবত এখানে ভিড়েছে। পিনটোকে দেখেই কামু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর হাতে তিনটে বিয়ারের বোতল ঝুলছে। কামু চিৎকার করল, 'আরে শালা পিনটো, তুই এখানে?'

দূরত্বটা কমাল পিনটো, 'কেমন আছ দোস্ত?'

'আর আছি। লাইন এখন বহুৎ ডাল! এখানে একটা গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকারি করি। তুমি ওস্তাদ দুহাতে কামাচ্ছ এখন। সব কানে আসে। পুরা সোনাগাছি তোমার ভয়ে কাঁপে। তা এখানে কি মনে করে?' কামুর ওপরের ঠোঁটে দুটো সেলাই আছে।

'ধান্দা ছাড়া কেউ আসে এখানে?'

'ধান্দা করার জায়গা আর নেই ওস্তাদ। এখান থেকে সব পাখি উড়ে যাচ্ছে। যত্ত নেপালি খাসিয়া ভিড় জমাচ্ছে এ পাড়ায়। খালিকুঠি সব বন্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ড বিজনেস চলছে।' কামুর মুখ বিমর্ষ, কথা বলছিল মন খারাপের ভঙ্গীতে।

'এখানকাব সব মাঠ চেনা আছে?'

'কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?'

'সোনাগাছি থেকে একটা মেয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এখানে আসে। রাত্রে চলে যায়। কোন ফ্ল্যাটে?'

কামু হেসে উঠল সশব্দে, 'গুরু, তোমার এত নাম হয়েছে তবু বাচ্চার মত কথা বল। আরে একটা কেন, পঞ্চাশটা মেয়ে সোনাগাছি থেকে আসে হাউজওয়াইফ সেজে। দেখবে?'

পিনটো কখনও নূরজাহানকে ভাল করে দ্যাখেনি। তবে ফর্সা এবং লম্বা চুল আছে মনে করতে পারল। বর্ণনা এবং নাম পেয়ে কামু বলল, 'বুঝেছি। বহুৎ খতরনক ফ্ল্যাট। তিনটে মেয়ে আসে রোজ। গুপ্তাসাহেবের ফ্ল্যাট। মাছি ঢুকতে পারে না। ওপরতলা থেকে বলে দিয়েছে গুপ্তাকে টিজ করলে উড়ে যেতে হবে এখান থেকে। তবে হ্যাঁ, কেসটা কি ?'

পিনটো ঠিক করে নিয়েছিল কামুকে কিছু বলবে না। সে হেসে বলল, 'অ্যায়সা কোই খাস ধান্দা নেই। এলাম তো দেখেই যাই। দালাল কে ?'

'দুজন। একজন ম্যাড্রাসী সাহেব। আর একজন খিদিরপুরের লোক। জাহাজী নিয়ে আসে এখানে। ওদের একটা ঝি আছে। পুরিয়া কিনতে যায় হরিলালের কাছে। ওর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবে।'

'কিসের পুরিয়া ?'

'আফিঙের।' ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল হাত ঘুরিয়ে কামু।

'এখন এখানকার শের কে ?'

'কাটা গাজী। আরে এককালে ইলিয়ট রোডে রেসের পেন্সিলার ছিল।'

'কোথায় বসে ? দেখিয়ে দেবে ?'

কামু একমুহূর্ত ভাবল, 'একটু দাঁড়াও। মালটা পৌঁছে দিয়েই চলে আসছি।'

চলে গেল কামু। আর হঠাৎই পিনটোর মনে হল, মিত্তিরদা ঠিকই বলেছে, সে ফালতু অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে। পিনটো আর দাঁড়াল না। কামু ফিরে আসার আগেই হনহন করে হাঁটতে লাগল গেট পেরিয়ে পার্কস্ট্রীটের দিকে। এখন তাকে ভদ্রলোক হতেই হবে।

ঠিক টাকা জমানোর নেশায় আজ অবধি টাকা জমায়নি পিনটো। ফলে তার কাছে এখন সাকুল্যে হাজার তিনেক রয়েছে। একথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না। সোনাগাছিতে যা তোলা পাওয়া যায়, এতকাল মাস্তানি করে যত মাল্লু ঘরে এসেছে তা জমিয়ে রাখলে দুটো বাড়ি কেনা যায় বটে, কিন্তু মদ খাওয়া যায় না। গুরু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাত দরাজ করতেই হয়। না পেলে কেউ কাউকে গুরু বলে না। সাতদিনও লাগবে না, সোনাগাছিতে টহল মারলে অনেকটাই উঠে আসবে যা দিয়ে ডলার কেনা যায়। তাছাড়া খরচও আছে অনেক। বাইরে যাওয়ার মত ভাল পোশাক নেই তার। একটা স্যুট বানাবার শখ ছিল অনেকদিনের। এই মওকায় করে নেওয়া যেতে পারে। টাই থেকে জুতো সবই নতুন দরকার। তা এসবের জন্যে তো সুরবালার কাছে মাল চাওয়া যায় না। মেয়েছেলেটা এত হাবামি যে মুঠো খুলল না সেদিন। কাগজের লোকদের ওপর বাবড়ি করে যে টাকা কামাল সেদিন তার একটা হিস্যা তো দিতে পারত। সুধারানীকে বলতে পারে অবশ্য, কিন্তু সেটা প্রেস্টিজে লাগছে।

পার্কস্ট্রীটে দাঁড়িয়ে পিনটো ভাবছিল কি করে টাকা বানানো যায়। সোনাগাছিতে সে কোন ঝামেলা করবে না। করলেই থানায় নাম উঠবে। সেটা এখন কিছুতেই না। টাকা বানাতে হবে অথচ গায়ে কাদা লাগবে না। পিনটো হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে চলে এল। সামনেই থানা। এককালে এখানকার সবাই তাকে চিনতো। কিন্তু কখনও তাকে কোর্টে পাঠায়নি। রেকর্ড ঘাঁটলে কিছু পাবে না। হঠাৎ দুটো ছেলের দিকে নজর গেল

তার। ওদের তাকানো, হাঁটার ভঙ্গী বেশ সন্দেহজনক। হাতে এখন কোন কাজ নেই বলেই পিনটো পিছু নিল। ছেলে দুটো ওয়েলেসলি দিয়ে ঢুকে পার্ক লেনে পা বাড়াল। এবং একটা পুরনো খবরের কাগজ, খালি টিনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। এই দোকানটা পরে হয়েছে। দোকানদার প্রথমে পাত্তা দিচ্ছিল না। কিন্তু ওরা কিছু বলা মাত্র পুরোন টিন খুলে মাল দিল টাকা নিয়ে। এবার বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ছেলেদুটোকে। ওরা দ্রুত ফিরে আসছিল আবার ওয়েলেসলির দিকে। পিনটোর মাথায় চট করে মতলবটা খেলে গেল। সে সরাসরি ছেলেদুটোর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আটকাল। দুটো ছেলের চোখেই ভয় যেন চলকে উঠল। পিনটো বলল, 'আমাকে সত্যিকথা বললে বেঁচে যাবি। নইলে শিরা কাটবো।'

একজন কোনরকমে বলল, 'কি বলছেন আপনি?'

'মালটা কি তাই জানতে চাইছি। শোন, আমি একবার ছুরি বের করলে ব্যবহার না করে ঢুকোই না। কি কিনলি এইমাত্র, চটপট দেখা?' পিনটোর অভ্যস্ত গলার সামনে দাঁড়াতে পারল না ছেলে দুটো। তাছাড়া একজন সাহেবের মত চেহারার লোক চমৎকার বাংলায় কথা বলছে এটাও তাদের তাজ্জব করেছিল।

এর আধঘণ্টা পরে পিনটো পুরনো কাগজের দোকানে চুপচাপ বসেছিল। ছুরিটা পাশে একটা কাগজের আড়ালে রাখা। দোকানদার পাথর হয়ে রয়েছে। কিছুতেই সে স্বীকার করেনি, সাপ্লায়ারের নাম। বলেছে সাইকেলে করে একটা লোক ড্রাগ সাপ্লাই দিয়ে টাকা নিয়ে যায়। ওর পেছনে কে আছে তা সে জানে না। যেসব ছেলে ড্রাগ খায় তাদের সে দেখলেই চিনতে পারে কিন্তু যতক্ষণ চেনা কথা না বলে ততক্ষণ মাল দেয় না। সাইকেলওয়ালা তাই বলে গিয়েছে। দিনের যে কোন সময়েই লোকটা আসে। ওকে ধরলে সাহেব সূত্র পেতে পারে। কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল পিনটো। সে তখন টাকার গন্ধ পেয়েছিল। কোনমতে একেবারে আসল লোকটার কাছে পৌঁছাতে পারলে মাল্লু পাওয়া শক্ত হবে না। যারা এই ব্যবসা করে তাদের শক্তি নিশ্চয়ই খুব কম নয় কিন্তু চট করে কেউ লাইনের লোকদের সঙ্গে ঝামেলা না পাকিয়ে একটা সমঝোতায় আসতে চাইবে। সেই মওকাটাকে কাজে লাগাতে বসেছিল সে।

কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত তার মধ্যে অস্বস্তি বিজকুড়ি কাটছিল। এপাড়ায় এখন তার কোন ঠেক নেই। বড় কর্তাদের মদত থাকলে সে নিজেই বিপদে পড়তে পারে। হঠাৎ টাকার গন্ধ তার নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। শেষ অবধি টিঁকে থাকলে সুযোগটা কাজে লাগাতে সে পারবেই। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত তার মনে দ্বিতীয় চিন্তা ঢুকছে। শেষপর্যন্ত চা খাওয়ার নাম করে সে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এল। এবং তার পরেই মুখ ফিরিয়ে দেখল লোকটা দোকান ছেড়ে প্রাণপণে উল্টোদিকে দৌড়াচ্ছে। শরীরে শীতল বাতাস লাগল পিনটোর। প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে গেলেই আক্রমণটা আসবে ঝটপট। সে প্রায় দৌড়ে বাটার দোকানের সামনে ট্রামে লাফিয়ে উঠল।

আগামীকাল ওদের কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে সোজা প্যারিস। সুধারানী অত্যন্ত উত্তেজিত এবং সেইসঙ্গে কিঞ্চিত

ভীত। তার জিনিসপত্র সবই গুছিয়ে রাখা হয়েছে স্যুটকেসে। গত একমাসে সে কলকাতাকে দেখে নিয়েছে। নিউমার্কেট থেকে হাতিবাগান কিছুই বাদ যায়নি। সবই ভাল শুধু মানুষের চিৎকার, গাড়ির আওয়াজ তার খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু এসব ঢাকা পড়েছে নতুন জিনিস কেনার আনন্দে। প্যারিস থেকে তার আর পিন্‌টোর নামে দুদুটো টিকিট এসেছে। সে দুটো হাতে নিলেই আনন্দ হয়। গৌরনিতাই ডাক্তার একদিন ম্যাপ এঁকে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কোনটে কলকাতা আর কোথায় প্যারিস। তাদের প্লেন উড়ে যাবে কত শহর গ্রাম নদী পাহাড় এবং সমুদ্রের ওপর দিয়ে। ব্যাপারটা ভাবলেই বুক ঢিপঢিপ করে। টিকিট এসে যাওয়ার আগেই পাশপোর্ট এনে দিয়েছে পিন্‌টো। ছোট বইতে তার ছবি আঁটা। টিকিট নিয়ে ওরা হাজির হয়েছিল ফরাসী সরকারের অফিসে। সেদিন সুধারানীর খুব ভাল লেগেছিল। কারণ যেখানে সে যায় সেখানে ওর নাম জানাজানি হওয়ার পরেই চাপা হাসি শুরু হয়ে যায়। অথচ ঝকঝকে সেই বাড়িটায় পৌঁছে পিনটো যখন কাগজপত্র দিল তখন একজন মহিলা কত যত্ন করে তাদের বসতে বলল। কাগজ দেখল। তারপর পিন্‌টোকে পরের দিন এসে পাশপোর্ট নিয়ে যেতে বলল। বেরুবার আগে মহিলা তাকে হিন্দিতে বলল, 'আমি আশা করি ফ্রান্স তোমার ভাল লাগবে।'

এখন তো সব তৈরী। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না সুধারানীর। সবসময় মনে হচ্ছে আগামীকাল একটা অজানা রহস্যের মধ্যে ঢুকে যাবে যেখানে তাকে কেউ চেনে না। ভাগ্যিস পিন্‌টো সঙ্গে যাচ্ছে, নইলে সে কিছুতেই একা যেত না। পিন্‌টোকে কিছুদিন হল একদম অন্যরকম লাগছে। মাস্তানি করছে না, খিস্তিখেউড় করে কথা বলে না। মোক্ষদার কাছে সে জেনেছে সোনাগাছিতে পিন্‌টোর নাকি এই কারণে প্রতাপ কমে এসেছে। পিন্‌টোকে সে একদিন আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল স্যুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছে কিনা। পিন্‌টো হেসেছিল, 'যাহোক কিছু শেষদিন নিয়ে নেব।' অবাক হয়ে সুধারানী বলেছিল, 'ওমা! তুমি জানো না ওখানে কি শীত? আমাকে গৌরনিতাই ডাক্তার বলেছে। অনেক জামাকাপড় নিয়ে যেতে হবে।'

'আমার নেই। পকেটে যা টাকা আছে তাতে অর্ধেক ডলারই কেনা হবে না।'

'ডলার দিয়ে কি হবে?'

'বাঃ! ওখানে কি খালি হাতে ঘুরব? ওদেশে টাকা বলে না।'

'ওদেশে তো টাকার নাম ফ্রাঁ। গৌরনিতাই ডাক্তার বলেছে। ডলার দিয়ে কি হবে?' সুধারানী সরল গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল। ব্যাপারটা এতদিনে জানা হয়ে গেছে পিন্‌টোর। বুঝিয়ে বলেছিল টাকাকে ডলারে পরিবর্তিত করে নিয়ে গিয়ে সেটাকে আবার ফ্রাঁতে ভাঙিয়ে নিতে হয়। সুধারানী বলেছিল, 'এত ঝামেলা না করে টাকাই ফ্রাঁতে ভাঙানো যায় না কেন? মাঝখানে দালালের মত ডলারের কি দরকার হয়?' দরকারটা কেন তা বোঝাতে পারেনি পিন্‌টো কারণ সেটা তার নিজেরই অজানা। দুদিন বাদে জমানো টাকা থেকে পাঁচ হাজার সুধারানী দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, 'ধার হিসেবে দিচ্ছি। একসঙ্গে যাব, আমি ভাল পরব আর তুমি খারাপ পরবে তা ভাল দেখায় না।'

পিন্‌টো এতটা আশাই করেনি। বিব্রত হয়েছিল সে। নেবে কিনা ভাবছিল।

সুধারানী ওই প্রসঙ্গ শেষ করেছিল, 'কথাটা আবার পাঁচ কান করতে যেও না।'

সুধারানীর সঞ্চয়ে কুড়ি হাজার টাকা ছিল। সেটা সে নিজের ঘরে খাটের নিচে চোরা বাক্সে তালাচাবি দিয়ে রাখত। নিজের জিনিসপত্র এবং ডলার কিনতে আর পিন্টোকে দেওয়ার পর সামান্যই অবশিষ্ট থাকল। এখন সে আর সন্ধ্যেবেলায় খদ্দের নিচ্ছে না। যাওয়ার আগে শরীর খারাপ করতে চায় না সে। এমনকি তাদের সামনে গানবাজনাও করতে নারাজ। সুরবালা প্রথমে আপত্তি করেছিল শেষতক মেনে নিয়েছে। বোধহয় বাইরে বের হবার পর সুধারানীর আচরণে যে পরিবর্তন এসেছে তা তাকে বিস্মিত করেছে। মেয়েটা হঠাৎ খুব চোখা চোখা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য এটা ভাল। নইলে বিদেশে গিয়ে কি করতে কি করবে তা বিশ্বাস নেই।

মালপত্র সল্টলেকের বাড়িতে একটু আধটু করে সরানো শুরু হয়েছিল। বাকিটা সুধারানীর চলে যাওয়ার পরেই সরিয়ে সে উঠে যাচ্ছে এখান থেকে।

মিত্তিরদা এখন খুব খাটছে। কিন্তু দোকান বিক্রি করতে চাইছে না মোটেই। বললেই বলে, 'কতটা দূর! সল্টলেক থেকে মিনিতে চেপে সরাসরি চলে আসব। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে এখানে এলে দুটো পয়সা আসবে।'

সুরবলার আপত্তি এখানেই। বাড়িটা হয়ে যাওয়ার পর মিত্তিরদার সঙ্গে নতুন করে সংযোগ হওয়ায় সে একটা স্বপ্ন দেখছে। এখন বাকি জীবন দুজনে মিলে শুধু প্রেম করবে। নির্জন বাড়িতে যখন আর কেউ নেই তখন দুজনে গান শুনবে টেপ বাজিয়ে আর মুখোমুখি বসে থাকবে। পনের বছর বয়সে যা সম্ভব হয়নি এখন তাই মিটিয়ে নেবার বাসনা মনে চেপে বসেছে। কিন্তু মিত্তির যদি এখানে রোজ আসে তবে—। মন না মতি। পুরুষমানুষ তা যে বয়সেরই হোক না কেন সোনাগাছিতে দিনরাত পড়ে থাকলে মতিভ্রম হতে কতক্ষণ! তাছাড়া সুরবালা এরমধ্যেই টের পেয়ে গেছে মিত্তিরদার মনে লোভ ঢুকেছে। সল্টলেকের বাড়িতে সুরবালার স্বামী হিসেবে থাকার লোভটা সে আর কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। অতএব সমানে চাপ দিয়ে যাচ্ছে সুরবালা। শাওনরামকে সে বলে রেখেছে দোকানটা বিক্রী হবে।

এবাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু সুধারানীর ঘরটা তালাবন্ধ থাকবে। ফরাসী সরকার ওকে ভিসা দিয়েছে মাত্র দশ দিনের। অর্থাৎ এমাসেই ফিরে আসবে। ভাড়াও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তদ্দিন মোক্ষদা থাকবে তার সল্টলেকের বাড়িতে। সুধারানী এলেই ও চলে আসবে। এই নোংরাঘাটা জীবনের কোন সঙ্গীকে সে আর দেখতে চায় না।

যাওয়ার আগের দিনই তিনজন লোক এল তিন নম্বরে। গৌরনিতাই ডাক্তারকে নিয়ে বিরজু আর আমেদ এসেছে। বিরজুকে মোটেই পছন্দ করে না সুরবালা। যদিও তিন নম্বরে তোলা চায়নি কখনও তবু ওর বদনাম বড্ড বেশী। গৌরনিতাই ডাক্তার বলল, 'একটা ভাল কথা বলতে ওরা ধরে নিয়ে এল আমায়। তুমি না বলো না।'

সুরবালা বুঝতে পারল না। চাঁদাটাদা চাইবে নাকি!

গৌরনিতাই ডাক্তার বলল, 'সুধাকে নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখি হয়েছে। সে আমাদের গর্ব। তাই তার যাওয়ার আগে সোনাগাছির ছেলেমেয়েরা

তাকে ওই যাকে বলে, সম্বর্ধনা দিতে চায়। একটু হৈ চৈ করা আর কি! ওরা এর মধ্যে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেছে। কাউন্সিলারকে বলব সভাপতি হতে।'

সুধাবানী হাঁ হয়ে গেল। এরকম কথা কেউ তাকে বলবে সে কল্পনাও করেনি। অবশ্য সে যে প্যারিসে যাবে তা কখনও ভেবেছিল? সুরবালা বলল, 'আমার কিছু বলার নেই। সুধা যদি চায় তো যাবে।'

বিরজু সুধারানীর দিকে তাকাল 'তোমাকে তো পাড়ার কেউ ভাল করে জানে না। অথচ এই পাড়ার কথা বলতে বিদেশে যাচ্ছ। একটু জানপহচান হওয়া উচিত।'

গৌরনিতাই ডাক্তার সমর্থন কবলেন, 'ঠিক কথা।'

অতএব সুধারানীকে সম্মতি দিতে হয়েছিল। যাওয়ার আগে বিরজু বলেছিল, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা। মিত্তিরদা আমাকে চেনে। আমি ওকে দাদার মত দেখি। যদি জিজ্ঞাসা করেন সব জানতে পারবেন। পিন্‌টো তো তোমার সঙ্গে যাচ্ছে?'

সুধারানী নীরবে মাথা নেড়েছিল।

বিরজু বলল, 'ও শালা আমাকে দেখতে পারে না। কিন্তু ওকে বলবেন আমার ওর ওপর কোন খার নেই। আমেদরা এখন আমার দলে চলে এসেছে।'

সারাদিন ধরে মাইক বাজছে আজ সোনাগাছিতে। হিন্দি গান শুনে পুজো মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'বন্ধুগণ, আজ বিকেল পাঁচটায় শীতলা মন্দিরের সামনে সোনাগাছির গৌরব শ্রীমতী সুধারানী দাসীকে এক বিরাট সংবর্ধনা জানানো হবে। আপনারা দ'লে দলে যোগদান করুন।' যত বার কানে যাচ্ছে ঘোষণা ততবার মুখে রক্ত জমছে সুধারানীর। নিজেকে খুব বড় বলে মনে হচ্ছে আজ। খামোকা মোক্ষদাকে দুশো টাকা বখশিস দিল। তাই দেখে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে যখন সুরবালা বলল, 'শোন মন দিয়ে। আমাদের মত মেয়েছেলের কামাই-এর দিন বড়জোর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। টাকা হল নিঃশ্বাসের মত। তার মর্ম বুঝবি। দিন চলে গেলে তোকে আর কেউ পুঁছবে না। তখন সেই জমানো নিঃশ্বাস ভাঙিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। মুঠো সবসময় শক্ত রাখবি, ওভাবে খুলবি না।' কথাগুলো কানে এল, কিন্তু ঢুকলো না। সুধারানীর পায়ের তলায় এখন নরম গদি।

বিকেলবেলায় পাড়ায় ফিরে হতভম্ব পিন্‌টো। শীতলা মন্দিরের সামনে বিরাট ভিড়। মাইকে হিন্দী গান বাজছে। কিছুদিন আগেই শীতলা পুজো হয়ে গিয়েছে। দলে দলে লোক ছুটছে ওইদিকে। এরকম কিছু সচরাচর সোনাগাছিতে হয় না। সাবাদিন পাড়ায় না থাকায় সে কোন খবর জানে না। এখনও ছায়া ঘন হয়নি।

আজ সারাদিন সে কেনাকাটা করেছে। প্রায় সব টাকাই শেষ হয়ে গেল। অবশ্য আর কোন খরচ সামনে নেই। নিজের জন্যে এইভাবে কেনাকাটা করতে তার খুব ভাল লাগছিল। এছাড়া সে সাহেবপাড়ায় ঘুরে ঘুরে একটা ইংরেজি-ফরাসি অভিধান কিনেছে। সাতাশ নম্বর বাড়ির তিন তলায় তার আস্তানা। বাড়িটার দোতলায় একজন ইনকামট্যাক্সের এ্যাকাউণ্টেণ্ট ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। ওদের দরজায় লেখা, গৃহস্থের বাড়ি। একতলায় গোটা চারেক মেয়ে থাকে। ট্যাক্সি থেকে নেমে পিন্‌টো দেখল রঙমাখা মেয়েগুলো আজ রকে

দাঁড়িয়ে নেই।

তিনতলায় উঠে স্যুটকেস রেখে শুতে যেতেই মাইকে ঘোষণা শুনল, 'আমাদের অনুষ্ঠান এখনই আরম্ভ হচ্ছে। মাননীয় কাউন্সিলার এসে গেছেন।'

কাউন্সিলার এপাড়ায় ! এখন তো ইলেকশনের সভা নেই। পিনটোর মনে হল সে ইতিমধ্যেই পাড়ার জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। আজ ল্যাংড়া শিবে সকালবেলায় সেই কথাই বলেছে। তার ধারণা পিন্‌টো ইচ্ছে করে তার বউকে ফিরিয়ে আনল না। নূরজাহান নাকি বোম্বাই চলে গিয়েছে। তার খোঁজে তাই ল্যাংড়া শিবে আজ রাত্রে রওনা হচ্ছে। প্রায় সত্যি অভিযোগ হজম করেছিল পিন্‌টো। এখন ঘোষণা কানে যাওয়ার পর মন খারাপ হল তার। জামা গলিয়ে সে ছাদে উঠে এল। এখান থেকে শীতলা মন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে সময় লাগল খানিকটা। একটা স্টেজ বাঁধা হয়েছে মন্দিরটার গাঁ ঘেঁষে। স্টেজে কয়েকটা চেয়ার। চেয়ারে কাউন্সিলার এইমাত্র এসে বসলেন। গৌরনিতাই ডাক্তার তাঁর পাশে। বিরজু কাউন্সিলারের পেছনে দাঁড়িয়ে। কারা যেন অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে একটি মেয়েকে নিয়ে আসছে স্টেজে। চিনতে পেরে ধাক্কা খেল যেন পিন্‌টো। আঁচলে ঘাড় মুড়ে মাথা নিচু করে সুধারানী চেয়ারে বসল জড়সড়ো ভঙ্গীতে। ব্যাপারটা কি ?

এবার বিরজু মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কাউন্সিলার সাহেব এসে গেছেন। তিনি সব বলবেন। মালা দেওয়া হবে এখন।'

বিরজুকে কেউ মালাগুলো এনে দিতে সে একে একে তিনজনকে পরিয়ে দিল। খুব হাততালি উঠল। কেউ সিটি বাজাল। এবার গৌরনিতাই ডাক্তার উঠলেন। মাইকের সামনে এসে বললেন, 'আমি সামান্য ডাক্তার। বক্তা নই। তবু আমার বুক ফুলে উঠেছে যে এখানকার মেয়ে যাচ্ছে প্যারিস। সে আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে দেশবিদেশের মেয়েরা আসবে। সুধারানী নিশ্চয়ই মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি কাউন্সিলারকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করছি।'

আবার হাততালি পড়তে কাউন্সিলার এমন ভঙ্গী করলেন তাতে মনে হল তিনি যেন বলছেন, আবার আমাকে কেন ? ফিসফিসিয়ে বিরজুকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তিনি বলে উঠলেন 'বন্ধুগণ ! আমার এলাকার মানবমানবীবৃন্দ। আজ প্রকৃত আনন্দের দিন। আজ বঙ্গজননী বিশ্বের দরবারে যাচ্ছেন। যুগে যুগে ভারতবর্ষ থেকে দূত গিয়েছে বিদেশে এদেশের বাণী প্রচার করতে। বড় আনন্দের দিন। আপনাদের মেয়ে বোন আজ মুখ উজ্জ্বল করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোন শহরের কথা সে বলবে ? যে শহরে বিদ্যুৎ নেই, রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার হয়না, চিকিৎসার সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না।' এইসময় গৌরনিতাই ডাক্তার কেশে উঠতেই কাউন্সিলার বললেন, 'না না, আপনার কথা বলছি না। সরকারি ডাক্তার পাওয়া যায় না। কলের জলের সঙ্গে কেঁচো আসে। আপনারা জানেন আমি এখানে নির্বাচিত হয়ে কত লড়াই করেছি। আজ যে মাথার ওপরে আলো জ্বলছে তার জন্যে কত রক্ত ঝরাতে হয়েছে আমাকে। জঞ্জাল যেন না জমে তার জন্যে কত চেষ্টা করতে হয়েছে। আমি সরকারকে বলেছি আপনারা যেখানে যা ইচ্ছে করুন আমার এলাকার ভোটারদের আমি আরাম দেবই। আমি জানি

এখানকার অনেক ভাইবোনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু তারা ভুল বুঝবেন। এই যে এত বড় কাজে মেয়েটা যাচ্ছে তাকে পাশপোর্টই দেওয়া হচ্ছিল না। এই আমি বললাম, না, দিতেই হবে। জেনে রাখুন, আপনাদের যখন যা প্রয়োজন আমি আছি। এলাকার উদ্যমী যুবক বিরজুকে আমি বলেছি আপনাদের খবর আমাকে জানাতে। আর বেশী কথা বলে আপনাদের বিরক্ত করব না আমি ; সুধারানী বিজয়িনী হয়ে ফিরে আসুক। আমি সরকারকে বলব তাকে সম্মানিত করতে। তার নাম পদ্মশ্রী হিসেবে যাতে সুপারিশ করা হয় তার চেষ্টা আমি প্রাণপণে করব। আপনারা আমার পাশে থাকুন। কারণ আমার শক্তি আপনারাই, আমার এলাকার মানুষেরা। নমস্কার।'

কাউন্সিলারের বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র প্রচণ্ড হাততালি উঠল। সেটা থামতে বিরজু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'আপনারা জানেন কিনা জানিনা সুধারানীর সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে আমাদের পাড়ার পিন্‌টো যাচ্ছে। পিন্‌টো যে তার দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করে ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনবে সেটা আমরা চাই। এবার আমরা সুধারানীর কাছে কিছু কথা শুনব।'

ঘোষণামাত্র চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল। সুধারানী মুখ নিচু করে বসেই আছে।

পিন্‌টো ঠোঁট কামড়ালো। বিরজু হিরো হবার জন্য এই নকশা করছে। সে চলে যাওয়ার পর তো সোনাগাছিটা ওর কাছে গড়ের মাঠ হয়ে যাবে। বুকের ভেতর ঈর্ষা চিনচিন করছিল।

স্টেজে তখন অভিনব নাটক হচ্ছে। বিরজু এগিয়ে গিয়ে সুধারানীকে বারংবার অনুরোধ করছে কিছু বলার জন্যে। সুধারানী মুখ তুলছেই না। এবার গৌরনিতাই ডাক্তার উঠলেন। সুধারানী পাথরের মত বসে আছে। সোনাগাছির পাবলিকের মুখে সিটি, কুকুরের ডাক শুরু হয়ে গেল। পিন্‌টো দৌড়ে নিচে নেমে এল। দূরত্বটা পেরিয়ে শীতলা মন্দিরের কাছে পৌঁছে শুনল বিরজু মাইকে বলছে, 'সুধারানী একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। আজকের সভা শেষ হল।'

পাবলিক হল্লা জুড়ে দিল। তারা সুধারানীর কথা শুনতে চায়।

পিন্‌টো ভিড় সরিয়ে স্টেজের দিকে যাচ্ছিল। যারা তাকে চিনতে পারল তারা পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু সেইসঙ্গে দ্বিতীয় একটা গুঞ্জন উঠল। ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'ফোকটে বিলেত চললে গুরু!'

স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে বিরজু এবার পিন্‌টোকে দেখতে পেল। তার চোয়াল শক্ত হল। সে দ্রুতগলায় বলতে আরম্ভ করল, 'সভা শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনারা বাড়ি যান। এখানে কেউ ভিড় জমাবেন না।' কিন্তু কথা শেষ করেই সে দেখল পিন্‌টো স্টেজে উঠে এসেছে। বিরজু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? এখানে কেন? এটা আমার ফাংশান!'

পিন্‌টো হাসল। তারপর কাউন্সিলাররের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

গৌরনিতাই ফিসফিসিয়ে বলল, 'পিন্‌টো। আপনি একে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

কাউন্সিলার বললেন, 'আগে জানলে দিতাম না। ভেবেছিলাম ওরই হোল্ড

বেশী।'

পিন্টো এবার বিরজুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'এই সভা করার জন্যে বিরজুভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরজুভাই এখন থেকে কাউন্সিলারের হয়ে কাজ করবে।'

যারা চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল তারা আবার ঘুরে দাঁড়াল। বিরজু কি করবে বুঝে উঠছিল না। পিন্টোর গলা কানে যাওয়ার পর সুধারানী মুখ তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জোর হাততালি পড়ল। পিন্টো বলল, 'আপনারা অনেকক্ষণ থেকে সুধারানীর মুখে বক্তৃতা শুনতে চাইছেন। বক্তৃতা দিতে পারলে তো সুধারানী এখানকার কাউন্সিলার হয়ে যেতে পারত।'

আবার হাততালির ঝড় উঠল এইসময়। বিরজু চট করে কাউন্সিলারের দিকে তাকাল। তাঁর মুখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। তিনি গৌরনিতাই ডাক্তারকে বললেন, 'ইনসাল্ট, ইনসাল্ট করছে আমাকে।'

পিন্টো সময় দিল শব্দ মরার, 'কিন্তু সবাই তো বক্তৃতা করতে পারে না। সুধারানী যা পারে তা হল গান। আপনারা জানেন এখানে যারা ব্যবসা করে তাদের খুব অল্পই গানটাকে ব্যবসার মধ্যে রাখতে পেরেছে। তাই আপনাদের এত ভালবাসার প্রতিদানে সুধারানী যদি একটা গান শোনায় তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

আচমকা সমস্ত সোনাগাছি যেন শব্দহীন হয়ে গেল। প্রত্যেকে মুখ তুলে দেখছে সুধারানীকে। পিন্টো ধীরে ধীরে সুধারানীর কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'একটা গান যদি গেয়ে দাও তো মান থাকে। নইলে লোকে বলবে আমরা ফালতু প্যারিসে যাচ্ছি।'

কথাটায় কাজ হল। সুধারানী যেন সাহস ফিরে পেল। তারপরেই বলল, 'হার্মোনিয়াম, তবলা?'

বিরজুর দিকে তাকাল পিন্টো। তারপর বলল, 'দরকার নেই। খালি গলায় গাও।'

লজ্জিত হতে হতে সুধারানী যখন শুয়ে পড়ছিল তখনই পিন্টো তাকে এই প্রস্তাব দিল। সে মরীয়া হয়ে উঠল। পিন্টোর পাশাপাশি মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল সে। পিন্টো বলল, 'হার্মোনিয়াম তবলা ছাড়া ও কোনদিন গায়নি। এইভাবে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কখনই নয়। কিন্তু ওসব যোগাড় যখন করা হয়নি তখন সুধারানী খালি গলায় গাইবে। এটাই হবে ওর বক্তৃতা।'

চোখ বন্ধ করল সুধারানী। কোন গানের লাইন তার মনে পড়ছে না। কপালে ঘাম জমল। তারপর গলা খুলল,

'রসের কথা শুনিয়ে নাগর পালিয়ে গেল ভোর রাতে
বেসুরো এই তানপুরাটা দেব আমি কার হাতে?'

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি উঠল। কেয়া বাত কেয়া বাত চিৎকার উঠল সোনাগাছি জুড়ে। কাউন্সিলারের মুখেও হাসি ফুটল। এমন কি বিরজু পর্যন্ত বলে উঠল, 'সাবাস।'

গান শেষ হওয়ামাত্র কয়েকজন লাফিয়ে উঠল স্টেজে। বিরজুর বাহিনী তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল। সবাই আর একটা গান শুনতে চায়।

এইসময় মোক্ষদার গলা শোনা গেল। 'বিনি পয়সায় আর গেয়ো নি দিদি।'

পাবলিক তখনও চিৎকার করছে আরও গাইবার জন্যে। পিন্টো মাইকে বলল, 'যে ব্যবসার যা নিয়ম। ভালবেসে একটা গান গেয়েছে সুধারানী। আপনারা ওকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। কই মালা ছাড়া ওর হাতে তো কিছু দিতে দেখলাম না।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'চাঁদার টাবা কই ? চাঁদার টাকা মেরে দেওয়া চলবে না, চলবে না।' বিরজু দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর পিন্টোকে ঠেলে মাইক থেকে সরিয়ে বলল, 'এই অনুষ্ঠান কি শেষ হয়ে গিয়েছে ? আমরা ভেবেছিলাম সব শেষে এই একশ এক টাকা সুধারানীকে দেব। ঠিক আছে এখনই দিয়ে দিচ্ছি।' পকেট থেকে সে একশ টাকা বের করে হতাশ হল। একটাকা নেই। সেটাই সুধারানীর হাতে গুঁজে দিল। গান গাইবার পরে সুধারানী যেন সাহস ফিরে পেয়েছিল। চট করে টাকাটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে আবার মাইকের সামনে দাঁড়াল এগিয়ে গিয়ে। পাবলিক ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হতেই তার গলায় সুর বাজল,

'আমার বুকে মধু আছে খাওনা কত খাবে
বদহজমের ওষুধ জানি প্রয়োজনে পাবে।
মৌচাকেরই মধু নিযে যাচ্ছি নাহয প্যাবিসে
ভিন্ন মাটি তবু জেনো আছি একই আকাশে॥'

আজ দুপুরে তিন নম্বরে কান্নাকাটির চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। শেষ মাল নিয়ে বাড়ি খালি করে সুরবালা চলে গেল সল্টলেকে। যাওয়ার আগে সুধারানীকে জড়িয়ে ধরে কত কান্না। সেই ফাঁকে নানান উপদেশ। এতদিন বটগাছের তলায় ছিলি। কিন্তু এবার রোদ ঝড় তোকে একাই সইতে হবে। পুরুষজাতটাকে কখনই বিশ্বাস করবি না। কারোর কথায় ভুলে মন দিয়েছিস কি মরেছিস। তোর তো কোন গহনাগাঁটি নেই। এবার একটা একটা করে গড়িয়ে রাখ। আখেরে কাজ দেবে। এমনি বেড়াতে যাস যাবি সল্টলেকে কিন্তু বিপদে পড়ে নিজে সামলাতে না পেরে কখনও যাবিনা। সুধারানী এইসব কথা শুনতে শুনতে কেঁদে ভাসালো। ঠিক হল সুরবালা মিত্তিবদাকে নিয়ে সল্টলেক থেকে যাবে দমদম এয়ারপোর্টে। সেইসময় মোক্ষদা তাদের সঙ্গে ফিরে যাবে। এতদিনের আবাস ছেড়ে যাওয়ার আগে সত্যি সুরবালার কষ্ট হচ্ছিল। মায়েদের ছবিগুলো যত্ন করে বেঁধে নিয়েছে সঙ্গে। পিন্টোকে বারংবার বলেছে সুধারানীর যত্ন নিতে। শেষ কথা বলেছে, 'কত পাপ কবলে বেবুশ্যে হয়ে পেট ভরাতে হয় জানিনা। কিন্তু আমরা যদি না থাকতাম, তো এর মেয়েকে ও টানতো ওর বউকে এ নিয়ে যেত। মনে রাখবি আমরা হলাম সেবাদাসী। আমাদের ভগবান তাই পাঁচ পাবলিক।'

সুরবালা চলে যাওযার পর খালি বাড়িতে বসে সুধারানী খানিকক্ষণ পা ছড়িয়ে কেঁদেছিল। মোক্ষদাকে শেষপর্যন্ত গায়ে পিঠে হাত বোলাতে হয়েছিল শান্ত করতে। বুক কাঁপানো নিঃশ্বাস ফেলে সুধারানী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার কি হবে ?'

'কি আবার হবে ? পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাবে। এত ভাল গান জানো, শরীরের এই বাঁধন, ভয় কি ? আমরা হলাম পাখির জাত। ডানা ওঠার

পর মা আর কেউ নয়। তাও তো তোমায় পেটে ধরেনি ও। তবে হ্যাঁ, যে দেশে যাচ্ছ সেখানে শুনেছি শুলেই রোগ হয়। সেইটে বাধিয়ে এসো না।' মোক্ষদা উপদেশ দিয়ে তাকে শান্ত করেছিল। তবু বুক খালি হয়ে যাচ্ছিল সুধারানীর। কিন্তু শেষপর্যন্ত দূর ভবিষ্যতের শোক আজকের সমস্যার কাছে হার মানল। মোক্ষদা বলল, 'ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। কিন্তু একটা কথা বলি। পিন্‌টোসাহেবকে মোটেই বিশ্বাস করো না। অল্প বয়েস, একসঙ্গে যাচ্ছ কিন্তু কখনও মন দিয়ে বসো না। মন ঠুনকো জিনিস নয় যে যাকে তাকে দিয়ে দেওয়া যায়। আর শরীর দেবে তাকে যে উপযুক্ত দাম দেবে। তুমি ফিরে এলে ব্যবসাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও আমি তোমার মায়ের অভাব বুঝতে দেব না।'

সুরবালা চলে যাওয়ার কিছু পরেই দোলগোবিন্দ এল। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখার পর সে সুধারানীর কাছে এল. 'প্যারিস ? কপালে কার কি লেখা আছে তা কে জানে। আসা হচ্ছে তো দশদিন পরে ? চাবিটা আমার কাছে রেখে গেলে আমি নিয়মিত দেখে যেতে পারব। শাওনরামজীর সেইরকম হুকুম। নইলে এই চোরছ্যাঁচড়ের রাজত্বে সব হাওয়া হয়ে যাবে। যাত্রা করা হচ্ছে কখন ?'

মোক্ষদা জবাব দিয়েছিল, 'হুকুম যখন হয়েছে তাই করা হবে। ভাড়াটে বলে কথা এখন। শেয়াল আর শকুনের মধ্যে কোনটে ভাল তা ভেবে লাভ কি !'

ড্রাইভারের পাশে বসল পিন্‌টো। পেছনে মোক্ষদা আর সুধারানী। ট্যাক্সিটাকে ঘিরে অন্তত শ' দেড়েক জনতা। বিকেল হবার আগেই সোনাগাছিতে উত্তেজনা। কেউ কেউ তিরিশের বি বাস ধরে রওনা হয়েছে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। আমেদের নেতৃত্বে একটা ম্যাটাডোর ভ্যানে উপছে পড়ছে মেয়েমানুষরা। সবাই যাবে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে। ম্যাটাডরের ওপরে টাঙানো একটা ফেস্টুনে লেখা, সুধারানী দাসী জিন্দাবাদ। ট্যাক্সির আগেই ভ্যানটা রওনা হয়ে গেল চিৎকার ছড়াতে ছড়াতে। গাড়ির পেছনে ঠোঁট কামড়ে বসেছিল সুধারানী। ইঞ্জিন চালু হওয়ামাত্র জানলার দিকে তাকাল। হুমড়ি খেয়ে পড়া বাচ্চা এবং মেয়েদের মুখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে ট্যাক্সিটা এগোচ্ছে। সুধারানী কোন বাড়িঘর দেখতে পেল না। এবং হঠাৎ সে শব্দ করে কেঁদে উঠে আঁচলে মুখ ঢাকল। পিন্‌টো চমকে পেছন ফিরে তাকাল। মোক্ষদা একটা হাত সুধরানীব পিঠে রেখে বলল, 'শক্ত হও। অনেক পথ যেতে হবে, শক্ত হও।'

বুকের ভেতর গুড়গুড় করছিল পিন্‌টোর। নিজের ঘরে দুদুটো তালা ঝুলিয়ে ইনকামট্যাক্সের এ্যাকাউন্টেন্টকে দেখাশোনা করতে বলে এসেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ভাল হত। এই সোনাগাছি, তার পরিচিত রাজ্য ছেড়ে প্যারিস লন্ডন করার কোন মানে হয় না। যদিও সে গোপনে ব্রিটিশ হাইকমিশনারেব অফিসে গিয়ে চারশো টাকা খরচ করে ভিসা করিয়ে নিয়ে এসেছে ইংলন্ডে যাওয়ার জন্যে যা সুধারানীকে বলা হয়নি তবু মনে হচ্ছে লোভ সংবরণ করলে ভাল হত। তার পেটে এমন কোন ইংরেজি জ্ঞান নেই যা দিয়ে সে সুধারানীকে সর্বত্র রক্ষা করতে পারে। এখন তার নিজেরই খুব ভয় ভয় করছিল। কান্নাটা কানে যাওয়ামাত্র তার মনখারাপের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। গাড়িটা চলছিল গলি দিয়ে। হর্ন বাজিয়ে লোক সরাতে হচ্ছে। হঠাৎ তার চোখে

পড়ল গলির একটা রকে পা তুলে বিরজু এদিকে তাকিয়ে আছে। সে ড্রাইভারকে ইসারায় থামতে বলতেই গাড়ি দাঁড়াল। পিন্‌টো ঝটপট দরজা খুলে ভিড় সরিয়ে বিরজুর সামনে এগিয়ে গেল। বিরজু অলসভঙ্গীতে দেখছিল। পিন্‌টোকে নামতে দেখেই সতর্ক হল। পিন্‌টো বলল, 'ঠিক হ্যায় দোস্ত। অনেক ঝামেলা করেছি, একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দুষমনি করতে হয়েছে, তুমি ওসব কথা মনে রেখনা। চলে যাচ্ছি, হাত মেলাও।'

বিরজু হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না কিছুতেই, কিন্তু প্রসারিত হাতটা ধরল। পিন্‌টো বলল, 'এখন তুমি সোনাগাছির জিম্মাদার। দেখভাল করো।' বলেই হনহনিয়ে আবার গাড়িতে ফিরে গেল। তার বুকের ভেতরটা আরও ভারী হয়ে উঠছিল।

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে পড়ামাত্রই মোক্ষদা বলল. 'প্রণাম করো, শিবঠাকুরের মন্দির, জাগ্রত শিব।'

কান্নাটা তখনও শরীরে, কিন্তু সুধারানী প্রণাম করল। উল্টোডাঙার ব্রিজে ওঠার আগে অন্তত তিনবার পথের ধারের মন্দিরের পরিচয় দিয়ে মোক্ষদা তাকে প্রণাম করাল। এখন গাড়ি চলেছে দ্রুত। পিন্‌টো ঘড়ি দেখছিল। অন্তত এক ঘণ্টা আগে ওরা রিপোর্ট করতে বলেছে। রিপোর্ট করা মানে টিকিট দেখিয়ে সিট নাম্বার নেওয়া। বেরুতে যা দেরী হয়েছে তাতে একঘণ্টা হাতে থাকবে বলে মনে হয় না। বাইরের দিকে তাকাতেই সে ভি আই পি রোড দেখতে পেল। চেনা কলকাতাটা ক্রমশ পেছনে সরে সরে যাচ্ছে।

মোক্ষদা এখন হঠাৎই কাঠ হয়ে বসে। চেনা পরিমণ্ডলের বাইরে আসামাত্র তার এই পরিবর্তনটা সুধারানী টের পেল। ভি আই পি রোডে পড়তেই চোখের আরাম হল সুধারানীর। সোনাগাছির মত তো নয়ই, এমনকি এই কয়দিনে কলকাতার যেখানেই গিয়েছে সেখানে এমন গাছপালা, ফাঁকা মাঠ চোখে পড়েনি। এমন সুন্দর রাস্তাও নয়। সে অবাক হয়ে বলল, 'এটা কোন জায়গা মোক্ষদাদিদি ?'

মোক্ষদা মাথা নাড়ল। সে জানে না। ড্রাইভার বলল, 'ভি আই পি রোড।'

'এটা কলকাতা না, না ?' সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল সুধারানী।

ড্রাইভার সজোরে মাথা নাড়ল, 'না না। এসবই কলকাতা। কলকাতা বাড়তে বাড়তে কোথায় চলে গেছে ভাবতে পারবেন না।'

সুধারানী থমকে গেল। কলকাতা কি বাড়তে পারে ? সোনাগাছিও কি বাড়ে ? সেদিন রাত্রে এক নতুন খদ্দের মজা করে কথা বলছিল। লোকটা বলছিল, 'আগে ছিল সোনাগাছি বিডন থেকে গ্রে স্ট্রিট। এখন বাড়তে বাড়তে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে।' সঙ্গীরা হৈ হৈ করে হেসেছিল। ভাল করে বুঝতে পারেনি সুধারানী কথাটার মানে। এখন মনে হল তাহলে ঠিকই বলেছে লোকটা। কলকাতা বাড়লে সোনাগাছি বাড়বে না কেন ? কিন্তু কলকাতা যদি বাড়তে বাড়তে প্যারিসে চলে যেত তাহলে খুব ভাল হত। সেটা হতে কতদিন লাগবে জানতে ইচ্ছে করছিল সুধারানীর। এই সময় পিন্‌টো বলল, 'ডান দিকে ওই গাছগুলোর ওপাশে সল্টলেক। সল্টলেকে তোমার মায়ের বাড়িতে গিয়েছ তুমি ?'

সুধারানী কৌতূহলী চোখে গাছপালার আড়ালে পেছনে চলে যাওয়া বাড়িঘর দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল, 'না। মা বলেছে ব্যবসা করতে করতে ও বাড়িতে যাওয়া চলবে না।'

পিন্‌টো বলতে যাচ্ছিল, তাহলে সুরবালা যেত কি করে? কিন্তু কিছু বলল না। আর ঝামেলা ভাল লাগছে না।

ট্যাক্সিটা থামতেই গোটা পঁচিশেক মানুষ ছুটে এল। তাদের বেশীর ভাগই মহিলা। চিৎকার করে তারা সুধারানী এবং পিন্‌টোর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নিজের নামটা কানে যাওয়ামাত্র চমকে উঠল পিন্‌টো। আর তার পরেই আমেদকে দেখতে পেল নেতৃত্ব দিতে। ট্যাক্সি থেকে নামতে খুব অসুবিধে হল। সবাই ঘিরে আছে, কেউ রাস্তা দিতে চায় না। শেষপর্যন্ত এয়ারপোর্টের পুলিশরা ছুটে এল উদ্ধার করতে। সদর প্রবেশদ্বারের সামনে স্যুটকেশ নিয়ে উপস্থিত হওয়ামাত্র আমেদ চিৎকার করে উঠল, ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ ভেতরে যেতে গেলে টিকিট কিনতে হবে। আমরা এখান থেকেই স্লোগান দিই। আবার সেই একই জয়ধ্বনি। পিন্‌টোর এবার কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু তখনই একটা কাণ্ড হল। গোটা পাঁচেক ক্যামেরা টপাটপ ছবি তুলতে আরম্ভ করল তাদের, জনতার। সুধারানী মেয়েগুলোকে চেনে না। যাদের সুরবালা উচ্চিংড়ে বলে এরা সেই ধরনের। মাসের অর্ধেক দিনই এরা ভাল খদ্দের পায় না। চোখে মুখে না খেতে পাওয়ার চিহ্ন। অথচ তার দিকে এমন করে হাসছে যেন ওদেরই কেউ ভাল কাজ করতে যাচ্ছে। বিকেলবেলার রোজগারের ধান্ধা ছেড়ে এই এত দূর ওরা তাকে বিদায় দিতে এসেছে কেন? এদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব দূরের কথা সামান্য আলাপ পর্যন্ত নেই। ওর প্যারিসে যাওয়াতে ওদের এত গর্বিত হওয়ার কি আছে?

'ম্যাডাম, এদিকে তাকান। প্লিজ একবার।'

সুধারানীর বুঝতে দেরি হল ওটা তাকেই বলা হচ্ছে। সে পেছন ফিরতেই অনেকগুলো ছবি উঠে গেল। মোক্ষদা সুরবালাকে খুঁজছিল। তাকে ওর সঙ্গে ফিরতে হবে সল্ট লেকে। কিন্তু এই ভিড়ে সুরবালা নেই। সে খুব ঘাবড়ে যাচ্ছিল। এই সময় আমেদ এসে বলল, 'দুটো টিকিট কেটেছি গুরু। তোমাদের তো টিকিট লাগবে না। ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'কে?' পিন্‌টো নিজের গলাই চিনতে পারল না এখন।

'মিত্তিরদা। চল, চল।' আমেদ তাড়া দিল।

সুধারানী মোক্ষদার হাত ধরতেই সে জোর করে ছাড়িয়ে নিল, 'না, না, আমি যাব না।'

আমেদ অবাক গলায় বলল, 'মানে?'

'আমি ম্লেচ্ছদের দেশে যেতে পারব না।'

'কি আজে বাজে বকছ?'

'ভেতরে গেলেই তো জোর করে পাঠিয়ে দেবে। না, না। আমি হিঁদু ঘরের বিধবা। কলে পড়ে লাইনে এসেছিলাম। কিন্তু একাদশী অমাবস্যায় কাউকে ঠোঁট ছুঁতে দিইনি যৌবনে। বুড়ো বয়সে ম্লেচ্ছদের দেশে যেতে পারব না বাপু।' সজোরে মাথা নাড়ল মোক্ষদা।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুবড়ি ছুটলো। ক্যামেরাম্যানদের কেউ কেউ মোক্ষদার বিব্রত মুখের ছবি তুলল। অনেক কষ্টে ওকে বোঝানো সম্ভব হল ভেতরে সুরবালা আছে। সে চাইলেও, টাকা দিলেও সুধারানীর সঙ্গে যেতে পারবে না।

কাঁচের দরজাটা যখন আপসে খুলে গেল তখন সুধারানীর মনে হল এক ভৌতিক রাজত্বে প্রবেশ করছে। চারধার থমথমে, মানুষগুলো গম্ভীর মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এত ঝকঝকে বিশাল ঘর সে স্বপ্নেও দ্যাখেনি। মাঝে মাঝে মাইকে অজানা ভাষায় একটা মেয়ে কি যেন বলে উঠছে। ওদের দেখতে পেয়ে সুরবালা দৌড়ে এল প্রায়, পেছনে মিত্তিরদা। সুরবালার শাড়ি পরার ধরন, চুলের স্টাইল এর মধ্যে কেমন পাল্টে গিয়েছে। সুধারানীকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ আদর করল সুরবালা। আর তাকে দেখে মোক্ষদার ধড়ে প্রাণ এল। মিত্তিরদা বললেন, 'ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসে যারা দিল্লীতে যাবে তাদের বোর্ডিং কার্ড নিতে অনেকবার মাইকে বলেছে। তোমাদের বোর্ডিং কার্ড লাগবে না?'

বস্তুটি কি পিন্‌টো জানে না। কিন্তু সে টিকিটগুলো নিয়ে মিত্তিরদার সঙ্গে ছুটল। লাইনে তখনও বেশ লোক। মিনিট দশেক দাঁড়ানোর পর সে টিকিট দেখাতে লোকটা দুটো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বলল, 'স্মোকিং অর নন-স্মোকিং?'

পিন্‌টো জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

লোকটা কাঁধ নাচাল, 'সিগারেট খাবেন না খাবেন না?'

'কোথায়?'

এবার লোকটার চোখে বিস্ময় ফুটল, 'বোর্ডিং কার্ড যেখানে দরকার। প্লেনে।'

'না। সিগারেট খাব না।'

'মাল কোথায়?'

'মাল?' ও, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। দুটো স্যুটকেশ।'

'নিয়ে আসুন। ওজন করব।'

মিত্তিরদা ছুটলেন স্যুটকেশ আনতে। পিন্‌টোকে সরে দাঁড়াতে হল পরের লোকটিকে সুযোগ দিতে। সে দেখল লোকটার স্যুটকেশ ওজন করে তাতে একটা কাগজ সেঁটে ওরা ভেতরে পাঠিয়ে দিল। আর লোকটা টিকিট আর একটা কার্ড নিয়ে খুশী মুখে চলে গেল।

তার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি শুরু হল। এইভাবে ওদের হাতে স্যুটকেশ দেওয়া কি ঠিক? ওরা যদি পরে ফেরত না দেয়!

ততক্ষণে আমেদ আর মিত্তিরদা দুটো স্যুটকেশ নিয়ে এসেছে। ওজন করে লোকটা বলল, 'ঠিক চল্লিশ কেজি। মনে রাখবেন এক একটায় বিশ কেজির বেশি নিতে পারবেন না। অবশ্য বাইরে বেশি পাবেন ক্লাব ক্লাশ বলে।' তারপর দুটো কার্ড আর টিকিট ফেরত দিয়ে স্যুটকেশ দুটোয় লেবেল লাগাল লোকটা। না বলে পারল না পিন্‌টো, 'স্যুটকেশ বইতে কষ্ট আপনারা নিয়ে নিচ্ছেন কেন?'

'আপনাদের বইতে কষ্ট হবে বলে।'

'না-না, কষ্ট হবে না। একটু আগে তো বইছিলাম।'

'প্লেনের ভেতরে এত বড় স্যুটকেশ নিয়ে উঠতে দেওয়া হয় না। নিশ্চিন্ত থাকুন, এ দুটো আপনাদের সঙ্গেই পৌঁছে যাবে।'

'প্লেনে না গেলে কি করে সঙ্গে যাবে ?'

'প্লেনের তলায় স্যুটকেশ নিয়ে যাওয়ার খোপ আছে। ওহো, আপনারা দিল্লী এয়ারপোর্টেই স্যুটকেশ কালেক্ট করে নেবেন। ভাববেন না আবার আমরা প্যারিসে পৌঁছে দেব। এই হল লাগেজ টিকিট। নেক্সট !'

লাইনের বাইরে বেরিয়ে এসে একটু অসহায় মনে হল পিন্‌টোর। তার যা কিছু সম্পত্তি ওই স্যুটকেশে আছে। সঙ্গে পাশপোর্ট, ডলার আর টিকিট। যদি ওই স্যুটকেশ ফেরত না পাওয়া যায় তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। মিত্তিরদা বললেন, 'আইনকানুনগুলো ভাল করে বুঝে নাও পিন্‌টো। দাঁড়াও এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করি।'

মোটামুটি সব বুঝে নেওয়ার পর সুধারানীর কাছে পৌঁছে ওরা দেখল অন্তত জনা পাঁচেক লোক খাতাপত্র খুলে প্রশ্ন করছে আর লিখছে। এবার ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে ছবি তুলছে ফটোগ্রাফাররা ! মিত্তিরদা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে রিপোর্টার।'

আর তখনই মাইকে ঘোষণা করা হল, 'দিল্লীগামী যাত্রীদের অবিলম্বে সিকিউরিটি চেকিং-এর জন্যে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

'আই সি ফোর হান্ড্রেড টু-প্যাসেঞ্জার্স আর রিকোয়েস্টেড টু...।'

পিন্‌টো বলল, 'ওরা আমাদের ডাকছে।'

মিত্তিরদা সক্রিয় হলেন। এগিয়ে গিয়ে সুধারানীকে ডাকলেন, 'সুধা চলে এস। এখনই তোমাদের প্লেন ছাড়বে। আপনারা ওকে ছেড়ে দিন।'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি পিন্‌টো ?'

সুরবালা মাথা নাড়ল, 'না, আমার স্বামী।'

একই লাইনে দাঁড়িয়েও ওদের দুজনকে দুদিকে যেতে হল। একটি মেয়ে যখন সুধারানীর শরীর পরীক্ষা করছে তখন সে প্রতিবাদ করে উঠল, 'একি হচ্ছে ?'

মেয়েটি বলল, 'পরীক্ষা করছি আপনার কাছে কোন অস্ত্র আছে কি না !'

'অস্ত্র ? আমার কাছে অস্ত্র থাকবে কেন ?'

'সেটা যারা নিয়ে যায় তারা জানে। বোর্ডিং কার্ড কোথায় ?'

'সেটা আবার কি ?'

'উফ্ ! আপনাকে চেকিং-এর সময় কার্ড দেয়নি ? চেকিং করেননি ?'

এই সময় পিন্‌টোর গলা পাওয়া গেল। ঘেরাটোপের বাইরে, 'এই যে কার্ড এখানে।'

বেরিয়ে গিয়ে সেটা নিয়ে ছাপ দিয়ে মেয়েটি বলল, 'এটা সব সময় কাছে রাখবেন।'

অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে অনেক চেয়ার। তার একটায় বসে অচেনা যাত্রীদের দিকে তাকাল সুধারানী। একটু আগে সুরবালা শেষপ্রস্থ কেঁদেছে। সুধারানীর চোখ এখনও ভিজে।.কিন্তু তার বুকের ভারটাকে আর ভারি লাগছিল না।

ঘোষণা হওয়ামাত্র বসে থাকা লোকগুলো ছুটতে লাগল যেন। ওরা ওদের অনুসরণ করল। বিরাট বাঁধানো মাঠে অনেক প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব কম বলে ওদের হাঁটিয়ে আনা হল যেখানে মালপত্র রাখা আছে। নিজেদের স্যুটকেশ

দুটো চিনিয়ে দেবার পর ওদের প্লেনের ভেতরে যেতে বলা হল। প্লেনটাকে অবাক হয়ে দেখছিল সুধারানী। সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো একটা লোক কার্ড ছিঁড়ে নিতেই ওরা সিঁড়িতে পা দিল। আর তখনই পিন্‌টো বলল, 'ওই দিকে দ্যাখো।' একটা বড় বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে অনেক লোক হাত নাড়ছে। ওদের মধ্যে কি সুরবালা আছে?

চিনতে পারল না সুধারানী। কলকাতার বিকেলের আকাশটাকে পেছনে রেখে সে প্লেনের ভেতরে পা বাড়াল।

এয়ার হোস্টেস নির্দিষ্ট আসনে পৌঁছে দেওয়ার পর সুধারানী নিঃশ্বাস ফেলল সহজভাবে। প্লেনের ভেতরে ঢোকার পর তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চারধার চাপা চাপা, কেমন একটা গন্ধ, গাদা গাদা মানুষ ঠাসাঠাসি বসে আছে। কিন্তু নিজের আসনে বসার পর মনে হল আশেপাশের মানুষগুলো কেমন সাহেব সাহেব, গম্ভীর গম্ভীর। কিন্তু এই মেয়েগুলো কারা? অমন সুন্দর সেজেগুজে হাসিমুখে খাতির করছে কেন? এতগুলো ব্যাটাছেলেকে সামলানো কম কথা নয়। যে ডাকছে তার কাছেই তো ছুটে যাচ্ছে।

পিন্‌টো ওপরে ওপরে খুব স্মার্ট হয়ে বসেছিল। ট্যাক্সি তো দূরের কথা এসি চেয়ার কারের চেয়ে প্লেনের ভেতরটা বেশি সুন্দর। এই মেয়েগুলো তাহলে এয়ারহোস্টেস। এতদিন যে গল্প সে শুনে এসেছে, এয়ার হোস্টেস সম্পর্কে তার সঙ্গে অনেকটাই অমিল। অন্তত এদের সবাই পরীর মত সুন্দরী নয়। পিন্‌টো সুধারানীর দিকে তাকাল। সুধারানী সমস্ত কিছু বিস্মরিত হয়ে মাথার ওপরে তাকিয়ে রয়েছে। সেখান থেকে একটা ছুঁচলো হাওয়া বেরিয়ে আসছে। সুধারানীর মুখটাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। যদিও তারা পাশাপাশি বসে তবু কেউ কারো শরীর স্পর্শ করছে না। এই সময় প্লেনের দরজা বন্ধ হল। যাত্রীরা যারা জানলার পাশে বসেছিল তারা কাঁচের গায়ে মুখ লাগাতেই পিন্‌টো ঝুঁকে দেখতে গেল। আবছা বিকেলে এয়ারপোর্টের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। পিন্‌টো এগিয়ে আসায় সুধারানীকে পিছু হঠতে হয়েছিল। স্পর্শ বাঁচাতে। পিন্‌টোর খেয়ালে এল না, বলল, 'বাইরেটা দেখে নাও।'

এইসময় এয়ারহোস্টেস কিছু টফি নিয়ে এল। ট্রেতে। হেসে এগিয়ে দিল। পিন্‌টো মুঠোয় ভরে বিজ্ঞের মতো বলল, 'নাও।' সুধারানী মাথা নাড়ল, 'না।'

এয়ারহোস্টেস বলল, 'বেল্‌ট্ বেঁধে নিন।'

পিন্‌টো বলল, 'বেল্‌ট্ মানে?'

'সিট বেল্ট। পাশে দেখুন।'

এয়ারহোস্টেস পেছনের দিকে চলে গেলে পিন্‌টো ওপাশের যাত্রীদের দিকে তাকাল। প্রত্যেকের কোমরে বেল্ট বাঁধা। সে নিজের আসনের দু পাশ থেকে বেল্ট তুলে নিয়ে অনেক চেষ্টার পর আটকাতে পারল। তারপর বিজ্ঞের মতো সুধারানীকে বলল, 'বেল্ট বেঁধে নাও।'

'কেন?' সুধারানীর কপালে চিলতে ভাঁজ পড়ল।

'জানি না। সবাই বেঁধেছে। আমাদের বাঁধতে বলল, শুনলে না?'

'ওগুলো ছেলেদের জন্যে। প্যান্টের ওপরে পরে।' সুধারানী মুখ ফেরাল।

'দূর প্যান্টের ওপরে পরলে সিটে আটকে থাকবে কেন?'

এই সময় এয়ারহোস্টেসটি ফিরছিল। সুধারানীর দিকে তাকিয়ে একটু উষ্ণ গলায় বলল, 'কি আশ্চর্য! সিট বেল্ট বাঁধেননি এখনও ? তাড়াতাড়ি করুন। এখনই টেক অফ করবে।'

এয়ারহোস্টেস চলে গেলে পিন্‌টো বলল, 'বেঁধে নাও। নিশ্চয়ই নিয়ম।'

সুধারানী বেল্টের দুটো প্রান্ত খুঁজে পাচ্ছিল না। পিন্‌টো ওটা খুঁজে দিলেও সে কিছুতেই আটকাতে পারল না। এই সময় ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। পিন্‌টো ঝুঁকে বেল্টের প্রান্ত দুটো নিয়ে চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ওঠা আটকালো। ওর সিঁটকে থাকা ভাবটা লক্ষ্য করে পিন্‌টো হাসল, 'তোমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন ? আমি তো ইচ্ছে করে তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি না।'

সুধারানী মুখ ঘোরাল, 'মোক্ষদা বলে দিয়েছে ইচ্ছে কিংবা অনিচ্ছা যাই হোক, বিনি পয়সায় যেন কেউ আমার গায়ে হাত না দেয়।'

পিন্‌টো হাঁ হয়ে গেল। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। আর তখনই প্লেনটা প্রচণ্ড গর্জন করে চলতে শুরু করল। সুধারানীর ভীষণ ভয় করছিল। সে খপ করে পিন্‌টোর হাত আঁকড়ে ধরতেই প্লেন মাটি ছাড়ল ঝাঁকুনি দিয়ে।

খানিক বাদে যখন শব্দ কমে এল তখন পিন্‌টো বলল, 'হাত ধরে আছ, আমি পয়সা দিতে পারব না।'

সুধারানী হেসে ফেলল। সে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমরা অনেক ওপরে না ?'

'উঠে দ্যাখো।' পিন্‌টো জবাব দিল।

সুধারানী উঠতে গিয়ে আটকে গেল বেল্টে। সে বলল, 'উঠতে পারছি না।'

পিন্‌টো মাথা নাড়ল, 'ওরা না নামালে আমরা নামতেও পারব না।'

অভিজ্ঞতা মানুষকে অভিজ্ঞ করে। দিল্লীর অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পেরে পিন্‌টো প্রাথমিক জড়তা ঝেড়ে ফেলতে পারল। সে বুঝে নিল তার পকেটে যতক্ষণ টিকিট থাকবে ততক্ষণ নিজের অধিকারেই সব কিছু চাইতে পারে। এয়ারপোর্ট ট্যাক্স পেমেন্ট করার পর পকেটে আর ভারতীয় টাকা যা রইল তাতে পকেটমানি হিসেবে যে ডলার ওখান থেকে কেনা যায় তা সম্ভব হল না। স্যুটকেশ এয়ার লাইন্সের হাতে ছেড়ে দিলে ঠিকঠাক বেল্টের ওপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ঘুরতে দেখা যায় বলে তার ধারণা হয়েছে। নবলব্ধ জ্ঞান যতটা সম্ভব সুধারানীকে দিয়ে চলেছে সে। পাশপোর্টে স্ট্যাম্প মারিয়ে কাস্টমসের বেড়া ডিঙিয়ে ওরা যখন দারুণ কার্পেট মোড়া বিশাল হলঘরে পৌঁছল তখন মধ্যরাতের বেশি দেরি নেই কিন্তু দেখলে কে সে কথা বলবে। কলকাতা থেকে দিল্লী আসার পথে যে খাবার দিয়েছিল তাতেই পেট ভরে রয়েছে। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না মোটেই।

সুধারানী চারপাশে অনেক সুন্দরী মহিলার দর্শন পেল। আহা, কি তাদের দেখতে। মাখনের মত গায়ের রঙ। পোশাকের কি বাহার। হাঁটাচলার স্টাইল চোখজুড়ানো। হঠাৎ তার মনে হল এরা সবাই তার মত প্যারিসে যাচ্ছে না তো ! যদি যায় তা হলে সে পেরে উঠবে কি করে। তার নিজের শাড়ি খুব দামী, হাজার টাকার ওপরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মত চমৎকার দেখাচ্ছে না।

সুধারানীর মন খারাপ হয়ে পড়ল। পিন্‌টোকে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না।

মাটিতে নামতে হল না, সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্লেনের ভেতরে ঢোকামাত্র সুন্দরী এয়ারহোস্টেস তাদের অভ্যর্থনা করল। সুধারানী দারুণ হকচকিয়ে গেল। এ যে সাক্ষাৎ মেমসাহেব তার দিকে নমস্কারের ভঙ্গী করছে। নিজেদের আসনে বসেই পিন্‌টো যখন বেল্ট বেঁধে দিল তখন আর এক চমক। চারধারে সাহেবমেমের মুখ। সে পিন্‌টোকে নিচু গলায় বলল, 'আমবা প্যারিসে এসে গেলাম, না? তা হলে বেল্ট বেঁধে বসছি কেন?'

পিন্‌টো হেসে ফেলল, 'প্যারিস অনেক দূরে। এই প্লেন আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে। আমরা এখনও দিল্লীতেই বসে আছি।' কথাটা শুনে আবার সাহেবমেমদের দিকে তাকাল সুধারানী। সে মনে মনে ভাবল দিল্লীতে তা হলে এই রকম লোক থাকে।

রাত্রে খাবার খায়নি ওরা। মাঝে মাঝে মাইকে যে সব কথা বলা হচ্ছে তার অনেকটাই বুঝতে পারছিল না পিন্‌টো। ভাষাটা ইংরেজি নয়। সুধারানী হঠাৎ প্রতিটি কথা জানতে চাইছে। এমন কি হেডফোন লাগিয়ে গান শুনে বলেছে, বাব্বা, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সামান্য পরে যখন জেমস বণ্ডের সিনেমা দেখানো হল তখন সে রীতিমতো উত্তেজিত। ছবিটায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল পিন্‌টো। হঠাৎ সুধারানী তার হাতে খোঁচা দিল, 'অ্যাই।'

পিন্‌টো ঈষৎ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'কলে যাব আমি।'

'কল?' জেমস বণ্ডের ব্যাপারটা মাথায় থাকায় চট করে বুঝতে পারল না পিন্‌টো।

'সেই বাড়ি থেকে বের হবার পর আর কলে যাইনি।'

এবার পিন্‌টো সোজা হল। বলল, 'আর কল ফল বলবে না। বলবে টয়লেট। চল।' প্লেনে উঠে অন্য যাত্রীকে অনুসরণ করে পিন্‌টো ইতিমধ্যে টয়লেট ব্যবহার করে এসেছে। বেল্ট খুলে সুধারানী পিনটোকে অনুসরণ করতে গিয়েই মনে করল প্লেনটা উড়ছে। সে থমকে দাঁড়াল। আবছায়া অন্ধকারে সবাই সিনেমা দেখছে। পিন্‌টো ওব হাত ধরে টয়লেটের দরজায় পৌঁছে দিল, 'সোনাগাছির মত নয়, সাহেবমেমরা এইরকম টয়লেট ব্যবহার করে। দেওয়ালে একটা বোতাম দেখবে যেটা টিপলে জল আসবে।'

দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সুধারানী। আয়নায় তাকে কেমন পেত্নীর মত দেখাচ্ছে। এইজন্যেই একটাও লোক তার দিকে তাকায়নি হ্যাংলার মতন। সে ব্যাগ খুলতে গিয়ে খেয়াল করল এখানে আসার কারণটা অন্য। সাহেবরা যদি তাদের কল এত সুন্দর করে রাখে তা হলে শোওয়ার ঘর না জানি কিরকম!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দরজা খুলে সুধারানী যখন ঝকঝকে হয়ে বেরুল তখনও সিনেমা চলছে। তার চোখ যখন পিন্‌টোকে খুঁজছে, তখন চুম্বনের শব্দ পেল। এই শব্দ তার কিছুতেই ভুল হবার নয়। পিন্‌টো এখানে দাঁড়িয়েছিল। ও কাকে আবার চুমু খাচ্ছে? টয়লেটের সামনে এক চিলতে জায়গায় দুটো মানুষকে

আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখল সুধারানী। এবং সে বুঝতে পারল ওদের সে কখনও দ্যাখেনি আগে। ছেলেটির হাত মেয়েটির সর্বাঙ্গে ঘুরছে এবং সে যে এত কাছে দাঁড়িয়ে তাতে ওরা ভ্রূক্ষেপ করছে না। পিন্‌টো ধারে কাছে নেই। সুধারানী দ্রুত প্যাসেজে চলে এল। পিন্‌টো তাকে না ডাকলে সে আসন খুঁজে পেত কি না সন্দেহ।

জায়গায় বসে হাঁপাতে লাগল সুধারানী। পিন্‌টো সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

'তু-তুমি চলে এলে কেন আমাকে একা রেখে ?' সুধারানী ভাল করে কথা বলতে পারছিল না।

'তোমার দেরি হচ্ছিল। এদিকে সিনেমাটা—'। আমতা আমতা করল পিন্‌টো।

'তুমি সিনেমাই দ্যাখো।' ঝাঁঝিয়ে উঠল সুধারানী।

'কেন, কেউ কিছু বলেছে ?' পিন্‌টো পেছন ফিরে টয়লেটের দিকে তাকাল।

'না। কিন্তু এখানে সবার সামনে ব্যবসা হচ্ছে। মাগো !'

'ব্যবসা !' হাঁ হয়ে গেল পিন্‌টো।

'আমরা যা ঘরের ভেতর করি দুজন লোক সেটা সবার সামনে করছে।'

কথাটা শোনামাত্র পিন্‌টো উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেল। কিন্তু তার ফিরে আসতে দেরি হল না। পিন্‌টো বলল, 'ধ্‌স ! ওরা প্রেম করছে।'

'প্রেম মানে ? ব্যবসা নয় ?'

'না।'

'তা হলে ওরা ভদ্রলোকদের মত ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে করছে না কেন ? ওখানেই ওরা এরপব জামাকাপড় খুলবে?' এবার সুধারানী হতভম্ব।

'না, না। ওই চুমু পর্যন্ত। সাহেবমেমরা প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া অন্যায় মনে করে না।'

'প্যারিসে আমাকেও সবার সামনে চুমু খেতে পারে ?'

'পারে।' পিন্‌টো আবার সিনেমায় মন দিল।

সুধারানীর মনে পড়ল সুরবালা বলত, লাজলজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ওই তিনটে যে দূর করতে পারবে পুরুষের মন জয় করতে তার দেরি হবে না। ব্যবসা ফুলে উঠবে রম রম করে। একবার এক ভদ্দরঘরের বউ লাইনে এসে এমন লজ্জা দেখাতো যে তার খদ্দেরই জুটতো না। কিন্তু কেউ যদি সোনাগাছির রাস্তায় চুমু খাওয়াখাওয়ি করে তা হলে পাঁচ পাবলিক পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। সোনাগাছির বাইরের ভদ্রবাড়ির মেয়েরা তো স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে চুমু খেতেই পারে না। তাও সব দরজা জানলা বন্ধ করে। সাহেবমেমদের মনে হচ্ছে ওসবের বালাই নেই। তবু এরা ভদ্দরঘরের সাহেবমেম। ব্যবসা করে যে সব মেম তাদের কি অবস্থা কল্পনা করে ম্রিয়মান হল সুধারানী। সে যে কিছুতেই ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। নিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাতেই সিনেমার পর্দায় চোখ রাখতে চোখ গোল হয়ে গেল তার। জেমস বণ্ডের ঠোঁটে সাপের মত জিভ বের করে একটা মেয়ে ছোবল মারছে!

প্যারিস এয়ারপোর্টে পৌঁছে ইমিগ্রেশনের মুখোমুখি হয়ে একটু ঝামেলায়

পড়ল ওরা। কাগজপত্র দেখার পর অফিসার সুধারানীকে রেডলাইট এরিয়ার এক্সপার্ট বলে কিছুতেই ভাবতে পারছিল না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কর ?'

পিন্‌টো জবাব দিল, 'শী এন্টারটেইনস মেন।'

'এন্টারটেইনস। হোয়াট শর্ট অফ এন্টারটেইনমেন্ট ?'

'শী টেকস মানি অ্যান্ড সিঙ্গ। দেন স্লিপ।'

'দেন শী ইজ হোর।' লোকটা চোখ ছোট করল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল পিন্‌টো, 'ইয়েস, ইয়েস। শী ইজ হোর।'

'অ্যাণ্ড ইউ ? ইউ আর এসকর্টিং হার ? পিম্প ?'

'ইয়েস স্যার।'

এবার লোকটার মুখে হাসি ফুটল, 'ওঃ! ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ইন প্যারিস।'

মালপত্র নেওয়ার জায়গায় পৌঁছে সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি বলল গো ?'

সুধারানীর দিকে না তাকিয়ে পিন্‌টো বলল, 'জানতে চাইল কেন এসেছি ? তুমি পাবলিকের সঙ্গে শোও আর আমি তোমার দালাল কিনা!'

'তুমি বলোনি যে আমি গানও গাই ?'

'বলেছি।'

'কিন্তু তুমি আমার দালাল নও তো।'

'এখন তো তাই।'

'আগে হলে আরও ভাল ব্যবসা হত, না ?' সরল গলায় সুধারানী বলল, 'তুমি কি সুন্দর ইংরেজি বল। আমি তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম, তুমি দেখলে না।'

একটু আগের খারাপ হয়ে যাওয়া মন এই মুহূর্তে ভাল হতে আরম্ভ করল পিন্‌টোর।

কিন্তু একটু বাদেই চোখে অন্ধকার দেখল পিন্‌টো। লাইন করে স্যুটকেশ আসছে চলন্ত বেল্টে চেপে। যে যারটা তুলে নিচ্ছে। কিন্তু নিজেদের দুটোকে দেখতে পাচ্ছে না। উদ্বেগ শুরু হবার মুখে সুধারানীর স্যুটকেশ এসে গেল। খপ করে সেটাকে তুলে মাটিতে নামিয়ে নিজেরটাকে খুঁজল পিন্‌টো। একে একে সব কটা স্যুটকেশ গহ্বর থেকে উঠে এল শুধু তারটা নেই। সে প্রায় আর্তনাদ করল, 'আমার স্যুটকেশ ?'

সুধারানী বলল, 'ওগুলোর মধ্যে নেই ?'

পিন্‌টো জবাব না দিয়ে পড়ে থাকা ঘুরন্ত স্যুটকেশগুলোর ওপর ব্যাকুল নজর বোলাল।

'তা হলে ওই গর্তের ভেতর আছে। নেমে গিয়ে দ্যাখো না।'

'ওই গর্তের মধ্যে নামব কি করে ?'

যেখান থেকে স্যুটকেশগুলো বের হচ্ছিল সেখানে একটা উর্দিপরা লোক দাঁড়িয়েছিল। পিন্‌টো তার কাছে ছুটে গিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমার স্যুটকেশ কোথায় ?'

লোকটা ফরাসিতে কি জবাব দিল বোঝা গেল না। পিন্টোর কান্না পেয়ে গেল। তার সমস্ত সম্পত্তি ওই স্যুটকেশের ভেতরে। সে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল বেল্টটাকে ঘিরে। এই সময় একটি লোক এসে তাকে ইংরেজিতে বলল তুমি যদি তোমার মালপত্র হারিয়ে থাক তা হলে ওই ওপাশের এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে খবর নাও।

পিন্টো ফিরে তাকাল। দু দুটো ফুটবল মাঠ ঢুকে যায় এমন বড় ঘরে সে দাঁড়িয়ে। এক পাশের দেওয়াল ধরে সার দিয়ে ছোট ছোট কাউন্টার। সে সুধারানীর দিকে তাকাল। সুধারানী নিজের স্যুটকেশের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। হনহনিয়ে কাছে পৌঁছে সেটাকে তুলে নিয়ে পিন্টো বলল, 'পেছন পেছন এসো।'

কাউন্টারের মেয়েটাকে পিন্টো সমস্যাটা বলতেই সে কাগজপত্র বের করে লিখতে লাগল টিকিট দেখে। তারপর জিজ্ঞাসা করল স্যুটকেশে কি কি ছিল? পিন্টো যতটা সম্ভব মনে করতে পারল বলতে লাগল। তার দিদিমা এবং মায়ের একটা ছবি সে সঙ্গে এনেছে সেটাও বাদ দিল না। ওই ছবির কোন কপি নেই। ওটা তার চাই-ই চাই। মেয়েটি বলল, ওরা খুব চেষ্টা করবে খুঁজে বের করতে। প্যারিসের ঠিকানা দিলে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করবে। এমন হতে পারে ওই স্যুটকেশ কোন কারণে দিল্লী এয়ারপোর্টেই রয়ে গেছে। কারণটা জানার চেষ্টা করবে মেয়েটি।

পিনটোর পক্ষে প্যারিসের ঠিকানা বলা সম্ভব ছিল না। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে উদ্যোক্তারা। অথচ তাদের কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটিকে আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে ব্যাপারটা জানাতেই তার চোখ উজ্জ্বল হল। সে কেবলই ঘুরে ঘুরে সুধারানীকে দেখতে লাগল। ফরাসী ভাষায় তার সহকর্মিনীকে কিছু বলায় উৎসাহ সংক্রামিত হল। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের ঠিকানা লিখে নিয়ে সইসাবুদ করিয়ে পিন্টোকে কুড়ি ডলার দিল একদিনের অতি আবশ্যকীয় জিনিস কিনতে। খুব অসহায় লাগছিল পিন্টোর। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল তার কিছু করার নেই। কাস্টমসের অফিসাররা ওদের শুধু চেয়েই দেখল। সুধারানী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে ওরা স্যুটকেশ ফিরিয়ে দিল না?'

মাথা নাড়ল পিন্টো, 'কালকে দেবে বলেছে?'

'তাহলে আজ জামাকাপড় ছাড়বে না?'

উত্তরটা দেওয়ার আগেই দুজন মানুষের ওপর নজর পড়ল পিন্টোর। ওরা এখন বিধিনিষেধের বাইরে চলে এসেছে। অনেক মানুষ সেখানে অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে উঁচিয়ে ধরা প্ল্যাকার্ডে নানান নাম লেখা। এই দুজনের প্ল্যাকার্ডে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'সুধারানী দাসী ফ্রম ইন্ডিয়া।'

পিন্টো চাপা গলায় বলল, 'ওই যে ওরা আমাদের নিতে এসেছে।'

সুধারানী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে বুঝলে?'

'বুঝেছি। এখন মুখ হাসি হাসি করে রাখবে।' বলে পিন্টো এগিয়ে গেল। পুরুষটি মহিলার দিকে তাকাল। মহিলা এগিয়ে এল, 'ইয়েস?'

'উই আর ফ্রম ইন্ডিয়া। শী ইজ সুধারানী দাস।' পিন্টো সুধারানীকে দেখাতে

গিয়ে আবিষ্কার করল যে সে বোকা বোকা হাসছে। চাপা গলায় পিন্‌টো তাকে হাসি থামাতে বলল। ততক্ষণে মেয়েটি পৌঁছে গেছে সুধারানীর কাছে। অনর্গল ফরাসীতে কিছু বলে দু হাতে জড়িয়ে ধরল সে তাকে। সুধারানী কি করবে বুঝে উঠছিল না। মেয়েটি সেই অবস্থায় বলল, 'ওয়েলকাম ওয়েলকাম!' তারপর একটু সরে দু হাতে সুধারানীকে ধরে বলল, 'ইউ আর বিউটিফুল।'

সুধারানী কিছুই বুঝতে পারল না। পিন্‌টো গলা তুলে জানাল, 'তোমাকে সুন্দর বলছে।'

সুধারানীর মুখে পলকেই রক্ত জমল। সে আচমকা বলে উঠল, 'যাঃ!'

পুরুষটি ফরাসী ইংরেজিতে অনর্গল বুঝিয়ে যাচ্ছিল পিন্‌টোকে। পিন্‌টো ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিল। ওদিকে সুধারানী পাথরের মত দাঁড়িয়ে। মেয়েটি চেষ্টা করে যাচ্ছে কোন কথা বোঝাতে। পিন্‌টো জিজ্ঞাসা করল, 'সুধারানী, তোমার কি হয়েছে?'

সুধারানী এবার ফিক করে হেসে ফেলল, 'আমি যে ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি শুধু শুনে যাও, যা বোঝার বুঝে আমি তোমাকে বলে দেব।' পিন্‌টো গম্ভীর গলায় জানাল।

এখন প্যারিসে বিকেলের আগে শীত জোরদার নয়। আজকের দিনটা রোদের দিন। তাই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বাইরে এসেও ওদের অসুবিধে হল না। দিল্লীর গরমে শীতবস্ত্রের কথা মাথায় আসেনি। পিন্‌টো নজর করল। ওদের যাবা অভ্যর্থনা করতে এসেছে তাদের শরীরে হালকা পশম চাপানো রয়েছে। সুধারানীর স্যুটকেশ পেছনে তুলে দিয়ে ওদের পেছনের আসনে তুলে দিয়ে উদ্যোক্তা দুজন গাড়ি ছাড়ল। গাড়িতে চড়েই পিন্‌টো মুগ্ধ। এয়ারকণ্ডিশণ্ড তো বটেই সেই সঙ্গে আরামের নানান উপকরণ ছড়ানো। আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল সুধারানী। পিন্‌টোর হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল ওর হাত ধরতে কিন্তু ও নিজেকে সামলে নিল। বলা যায় না এই জন্যেই সুধারানী চেঁচিয়ে পয়সা চেয়ে বসতে পারে। গাড়ি চলছে বিমানবন্দরের বিভিন্ন চিহ্ন দু পাশে রেখে। পিন্‌টো হঠাৎ দেখল স্পিডোমিটারের কাঁটা একশ'তে ঠেকেছে। এটা নিশ্চয়ই মাইল নয়, সে মনে মনে বলল। কিন্তু কিলোমিটার হলেও সামান্য ঝাঁকুনি লাগছে না তো। এই সময় ওদের গাড়ি হাইওয়েতে উঠে আসতেই পিন্‌টো তাজ্জব হয়ে গেল। রেড রোডের মত চওড়া দুটো রাস্তা পাশাপাশি। দু দিক দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে বিভিন্ন গতিতে। অথচ কেউ হর্ন বাজাচ্ছে না। একমুখী রাস্তায় অন্তত তিনটে লাইন। আর গাড়ির সংখ্যা অগুণতি। অথচ কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। সে ব্যাপারটা সুধারানীকে বোঝাবার জন্যে ফিরতেই সুধারানী বলল, 'তোমার মাথায় কোন বুদ্ধি নেই।'

পিন্‌টো বলল, 'তার মানে?'

'তুমি যদি এদের বলতে স্যুটকেশ হারানোর কথা তা হলে এরা ঠিক বের করে দিত। এবা সবাই নিজেদের ভাষা বোঝে, আমাদের মতন নয়।' সুধারানী মাথা নাড়ল।

এই সময় মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

পিন্টো তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, 'নো নো। অনলি আই হ্যাভ লস্ট মাই স্যুটকেশ।'

'মাই গড! হাউ?' মেয়েটি আঁতকে উঠল। পিন্টো তাকে এয়ারলাইন্সের কাগজপত্র দিয়ে পুরো ব্যাপারটা কোন মতে বুঝিয়ে দেওয়ার পর মেয়েটি সোজা হল, 'ইউ মাস্ট গেট দ্যাট।'

কথাটা কানে ঢোকামাত্র পিন্টো হালকা হয়ে গেল কিছুটা। সে সুধারানীর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। ব্যাপারটা তার নিজের মাথায় আসেনি। সে বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

সুধারানী হেসে বলল, 'এই কথাটার মানে জানি। গৌরনিতাই ডাক্তার শিখিয়ে দিয়েছে।'

প্যারিস শহরে গাড়ি ঢোকার আগে থেকেই সুধারানী মুগ্ধ। যদিও সে কলকাতাই ভাল করে দ্যাখেনি তবু মনে হল এইসব সাহেব-মেমরা প্রচণ্ড বড়লোক, নইলে রাস্তাঘাট পর্যন্ত এত ঝকঝকে রাখবে কি করে! যেদিন নিউমার্কেটে সুরবালা আর মিত্তিরদা তাকে নিয়ে জামাকাপড় কিনতে গিয়েছিল সেইদিন দুপুরে গ্লোব নামের সিনেমাহলে একটা ইংরেজি সিনেমা জোর করে দেখিয়েছিল। কথা না বুঝলেও বাড়িঘর রাস্তাঘাট দেখে অবাক হয়েছিল সে। এখন চোখের সামনে সেই একই দৃশ্য দেখছে। ওই সিনেমাটায় কোন মেয়ে ছিল না। এখন এখানে মেয়েদের সংখ্যা যে কম নয় তা বুঝতে পারছে। তাদের সাজগোজ দেখে, সুধারানীর মনে হল সোনাগাছির হিন্দী বলিয়ে মেয়েরা ধারে কাছে যেতে পারে না।

একটা বড় হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। হোটেলের দরজায় নীল ফেস্টুনে ফরাসীতে কিছু লেখা। একজন কর্মচারী ছুটে এসে পেছন থেকে ব্যাগটা বের করে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুধারানী চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার ব্যাগ?'

পিন্টো কোনক্রমে তাকে সামলালো, 'হারাবে না। ও এদেরই লোক।'

এয়ার কন্ডিশন্ড হোটেলে পা দিয়ে সুধারানীর শীত শীত করতে লাগল। ভেতরটা কি ঠাণ্ডা। পা ডুবে যাচ্ছে গদির মধ্যে। যে মেয়েটি ওদের এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গিয়েছিল সে দুটো চাবি নিয়ে ওদের সামনে এল, 'ইওর রুম ইন ফার্স্ট ফ্লোর, ইউ আর ইন ফিফ্‌থ। টেক রেস্ট। উই উইল মিট এ্যাট ডিনার। ডিনার ইজ এ্যাট সেভেন। হ্যাভ এ নাইস টাইম।' কথাগুলো বলে মেয়েটি হাসিমুখে চলে গেল।

অর্থাৎ দু'জনের জন্যে দুটো ঘর। এই মুহূর্তে চাবিদুটো হাতে পাওয়ার পর পিন্টোর মনে হল ওরা কি ইচ্ছে করেই তাদের আলাদা করে দিল? সুধারানীকে নিশ্চয়ই বেশি সম্মান দেবে কিন্তু তাকে ছয়তলায় পাঠানো হচ্ছে কেন? ওপরের ঘরগুলো কি খুব বাজে! ও দেখল ওপাশের লিফটে মানুষজন ওঠা-নামা করছে। সে সুধারানীকে ইঙ্গিত করল সঙ্গে আসতে। সুধারানী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'পায়ের তলার গদি এত নরম কেন?'

'ফাইভ স্টার হোটেলে এরকম হয়। শোন, তোমাকে দোতলায় একা থাকতে হবে। আমি ছয়তলায়। যখনই দরকার পড়বে আমাকে খবর দেবে।'

'আমি একা থাকব?' সুধারানী যেন আঁতকে উঠল।

'তাই নিয়ম। এখানে কোন ভয় নেই। ঘরে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে। চল, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে আমাকে খবর দিতে গেলে।' পিন্‌টো দেখল লিফট নেমে এসেছে। সে সুধারানীর হাত ধরে ভেতরে ঢুকতেই একজোড়া মানুষ চটপট ঢুকে বোতাম টিপেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। অবাক সুধারানী সিঁটিয়ে গেল পিন্‌টোর শরীরে। নড়ে উঠে লিফটটা যখন উর্ধ্বগামী তখন সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'এই মেয়েটা কি ব্যবসা করছে?' পিন্‌টো একপলক তাকাল। একদম তাদের ঘাড়ের কাছে ওরা অথচ কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মাথা নাড়ল, 'না। দেখো না। খারাপ ভাববে।'

'বাঃ। ওরা চুমু খেলে দোষ নেই আর দেখলেই খারাপ ভাববে কেন?'

'যে-দেশের যা নিয়ম।' লিফট উঠছিল সোঁ সোঁ করে।

'তুমি যদি এখন আমাকে চুমু খাও তাহলে কেউ কিছু বলবে না?'

'না।' পিন্‌টো সুধারানীর দিকে তাকাল।

'সোনাগাছির রাস্তায় যদি তুমি খেতে তাহলে তোমার মাস্তানি বেরিয়ে যেত। তাই না?'

প্রশ্নটা শেষ হওয়ামাত্র লিফট থামল। ছেলেমেয়ে দুটো বেরিয়ে যাওয়ামাত্র খেয়াল হল পিন্‌টোর, ওরা একতলার বদলে চারতলায় এসে গিয়েছে। সে এক নম্বর বোতাম চাপ দিতেই দরজা বন্ধ হয়ে লিফট নীচে নামতে লাগল। সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তোমার ঘরে।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘরে আমাকে থাকতে হবে?' বলে ছুটে গেল বিছানার দিকে, 'দ্যাখো দ্যাখো কি নরম! আচ্ছা দুটো বিছানা কেন?'

'হোটেলে থাকে এরকম। এই হচ্ছে ওয়ার্ডরোব। এখানে তোমার জামাকাপড় রাখবে। এইটে টয়লেট। এসে দেখে নাও। ওইটেকে বলে কমোট। ওখানে বড় কাজ সেরে পাশের রোল করা কাগজ ব্যবহার করতে পার।'

'মগ নেই?' সুধারানী কাঁদো কাঁদো হল।

'না।' পিন্‌টো মাথা নাড়ল, 'ওইটে বাথটব। সাবান শ্যাম্পু সব আছে। শোন, এখানে তুমি সোনাগাছির মত পিটপিটিয়ে থাকবে না। মেমসাহেবদের মত চটপটে হতে হবে। আর হ্যাঁ, এই যে মাথার কাছে এই যন্ত্রটা, এটা টেলিফোন।' সামনে টাঙানো নির্দেশিকা পড়ে নিয়ে পিন্‌টো জানাল, 'এই যে এইটে, জিরো, এইটে টিপলে একটা লোক কথা বলবে। মেয়েও হতে পারে। কি বলল বোঝার দরকার নেই। তাকে বলবে রুম ফাইভ টেন।'

সুধারানী কয়েকবারের চেষ্টায় ইংরেজি শব্দ তিনটে রপ্ত করল। পিন্‌টো বলল, 'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবে। এই যে এইরকম। কখনও চাবি ভেতরে রেখে বাইরে যাবে না। ঠিক আছে? তাহলে আমি আমার ঘরে চলি।'

'আমার খুব ভয় করছে।' সুধারানী সরল সত্য জানাল।

'দূর, ভয়ের কি আছে।' সুধারানীর কাঁধে হাত রাখল পিন্‌টো।

'তুমি কি পরে শোবে গো! তোমার তো কিছু নেই। আমার একটা শাড়ি

নিয়ে যাবে ?'

'না-না। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। সুধা !'

'কি ?'

'আমি তোমাকে একটা চুমু খাবো ?'

'কেন ?'

'আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে।'

'ইস ! আজ সকাল থেকে কেউ দাঁত মাজিনি। এখন খেলে খুব বিশ্রী লাগবে।'

চকিতে সুধারানীকে লক্ষ করলো পিন্‌টো। তার মনে হল এটা ছেনালীপনা নয়। কথাটা বিশ্বাস করেই বলল সুধারানী। সে আর কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে আবার ঠেলে বন্ধ করে লিফটের দিকে হাঁটতে লাগল।

বন্ধ ঘরে সুধারানী চারপাশে তাকাল। তারপর দরজাটা টানল। খুলল না। তবু সে হুকটা আটকে দিল। তারপর সোজা টয়লেটে ঢুকে গেল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল পৃথিবীর মানুষেরা কত রকমের আরাম ভোগ করে। এইসব আরামের ব্যবস্থা যদি সোনাগাছিতে করা যেত ! সে নিজেকে আয়নায় দেখল। পিন্‌টো হঠাৎ চুমু খেতে চাইল কেন ? ওর মনে হল এখানে এসে চারধারে যা হচ্ছে তা দেখে পিন্‌টোর এবার সত্যিকারের সাহেব হতে ইচ্ছে করছে।

লিফটের সামনে দাঁড়িয়েছিল পিন্‌টো। একটু আগে একটা অদ্ভুত দেখতে মেয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে ঘরের নাম্বার দেখতে দেখতে সুধারানীর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার বয়স তিরিশের কম নয়। হাতে যে ঝোলা ব্যাগ রয়েছে সেটা দেখে বোঝা যায় সে এইমাত্র এসেছে। চাবি ঘুরিয়েও যখন দরজা খুলতে পারল না তখন মেয়েটি একটু হতাশ হল। পিন্‌টো বুঝতে পারছিল না মেয়েটি ওই ঘরের দরজা খুলতে চাইছে কেন ? ওর গায়ের রঙ তামাটে। লম্বা ছিপছিপে শরীর। মেদ নেই কিন্তু যৌবন আছে আর সেটাকে দেখাবার চেষ্টা সহজেই নজরে পড়ে। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো, চামড়ার মিনি স্কার্ট ; আর পিঠ-কাটা জামা। মাথার চুল ছেলেদের ছাঁটে এবং রঙকরা। সোনালী রঙ চোখ কাড়ছে। পিন্‌টো ঠিক বুঝতে পারছিল না ঠিক একেই বণ্ড হেয়ার বলে কিনা ? এবার মেয়েটি দরজায় শব্দ করল।

পিন্‌টো এগিয়ে গেল, 'একসকিউজ মি, মে আই হেল্প য়ু !'

মেয়েটি কাঁধদুটো উঁচু করে চোখ বন্ধ করল। তারপর দরজাটাকে ইশারায় দেখাল।

'দেয়ার ইজ এ গার্ল ইনসাইড। শী ইজ ফ্রম ইণ্ডিয়া। হোয়াট ইজ ইওর রুম নাম্বার ?'

মেয়েটি হেসে বলল, 'ইংলিশ ? নো !'

পিন্‌টো একটু অবাক, মেমসাহেব ইংরেজি জানে না ? কোন্ দেশের মেয়ে ? সে চাবিটা দেখতে চাইল। হ্যাঁ একই নম্বর। তাহলে কি দু'জনকে একঘরে রাখছে ওরা ! অগত্যা পিন্‌টো দরজায় আঘাত করল, 'সুধা, সুধারানী ! আমি পিন্‌টো, দরজা খোল।'

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। পিন্‌টো এবার ঘাবড়ে গেল। দরজা তো

ভেতর থেকে বন্ধ হবার কথা নয়। সে আবার শব্দ করতে মেয়েটি অবোধ্য ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করল। পিন্‌টো মাথা নাড়ল, 'আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আর ইউ ফ্রেঞ্চ?'

'নো ফ্রেঞ্চ। মেক্সিকান।'

'শী ইজ ইন্ডিয়ান।' ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল পিন্‌টো।

'ইন্ডিয়ানা? আমেরিকান?'

'নো-নো। ইন্ডিয়ান।'

'ও! গাঁদি? ইনদিরা গাঁদি!'

পিন্‌টো হেসে মাথা নাড়ল। এবং তখনই দরজাটা একটু একটু করে খুলতে লাগল। পিন্‌টো সেটাকে সামান্য ঠেলে বলল, 'আমি পিন্‌টো।'

সুধারানীর গলা শোনা গেল, 'আমি এখনও মুখ ধুইনি।'

পিন্‌টো সোজা হল, 'আমি সেজন্যে আসিনি। তোমার ঘরে একজন থাকবে।'

'আমি এখনই লোক বসাব না। তোমাকে দালালি করতে কে বলেছে?'

'উফ! এটা সেই ব্যাপার না। ইনি একজন মেমসাহেব। তোমার মত মেক্সিকো থেকে এখানে এসেছে। এই ঘরে ওকে থাকতে দিয়েছে এরা।'

এবার দরজা খুলল। পিন্‌টো ঘরে ঢুকে হতভম্ব। শায়া ব্লাউজের ওপর প্রকাণ্ড একটা তোয়ালে জড়িয়ে সুধারানী ছুটে বাথরুমে চলে গেল। সে মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কাম ইনসাইড। শী নো ইংলিশ।'

মেমসাহেব ঘরে ঢুকতেই পিন্‌টো দরজা টেনে দিয়ে লিফটের দিকে হাঁটতে লাগল।

তোয়ালে জড়িয়ে পিন্‌টোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যত না লজ্জা তার চেয়ে আরও বেশি অস্বস্তি আর একটা উটকো লোকের মুখোমুখি হওয়া। সোনাগাছিতে ব্যবসার শেষপর্বে কখনই আলো জ্বালাতে দিত না সে। নর-নারীর যৌনসঙ্গমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুধারানী সুরবালার কাছে ঠিক বয়সে পেয়েছিল। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় সতর্কীকরণও। ক্রমশ তার মনে ব্যাপারটি যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ধরানার কারণেই সে কখনই অশোভন কিছু করেনি। বিদেশে যাওয়ার নিমন্ত্রণ আসার পর সে যখন শরীর ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল তখনও বুঝতে পারেনি সামান্য অনভ্যাস তাকে অনেক জড়তা এনে দেবে। এবং এই কারণেই এখন সুধারানী বাথরুমে দাঁড়িয়ে মনে মনে পিন্‌টোকে গালাগাল দিল। সে জানে পিন্‌টোর কাজ তার সুবিধে অসুবিধে লক্ষ রাখা। এটা কি ব্যাপার হল?

শাড়ি পাল্টানো হল না, যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়ে সুধারানী দরজা ঈষৎ খুলে ঘরটিকে লক্ষ করল। ঘরে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে দরজা আরও একটু ফাঁক করল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল। এ কে? দ্বিতীয় খাটটিতে যে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে তাকে মেয়ে বলে ভাবতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। ওরকম চুল এবং পোশাক কোথাকার মেয়েরা পরে? তাহলে একে নিয়েই পিন্‌টো ঘরে ঢুকেছে। সে চারপাশে তাকিয়ে পিন্‌টোকে দেখতে পেল না। এবং তখনই চোখে পড়ল তার নিজের স্যুটকেস-এর

পাশাপাশি আরও একটা চমৎকার ব্যাগ ঘরের এককোণে রাখা হয়েছে। এই মেয়েছেলেটা কি তার সঙ্গে এক ঘরে থাকবে?

এইসময় মেয়েটি তড়াক করে উঠে বসল খাটের ওপর। সে বিস্মিত খুব এবং সেটা বুঝতে সুধারানীর অসুবিধে হল না। ওরকম রঙিন চুল, স্বাস্থ্যবতী শরীর, এমন কি পা থেকে থাই পর্যন্ত যে মুক্তাঞ্চল সেখানেও যত্নের চিহ্ন, সোনাগাছির কোন মেয়েই ভাবতে পারবে না।

এবার মেয়েটির ঠোঁট নড়ল। মেমসাহেব কি ইংরেজি বলছে? সুধারানী কোনমতে মাথা নাড়ল। মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করল কিছু যার শেষটায় ছিল, 'ইনদিরা গাঁদি?'

ঝট করে মাথায় নামটা চলে এল সুধারানীর। ইন্দিরা গান্ধীর নাম বলছে কেন? তিনি তো সুধারানীকে চিনতেন না। তাকে যখন মেরে ফেলেছিল তখন সোনাগাছিতেও বন্‌ধ হয়েছিল।

এদিকে মেয়েটি বারংবার নামটা জপে যাচ্ছে। ফলে সুধারানীকে মাথা নেড়ে বলতে হল, 'হ্যাঁ। ইন্দিরা গান্ধী। মরে গেছে।'

নাম শোনামাত্র মেয়েটি এক লাফে দূরত্ব ঘুচিয়ে সুধারানীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল দুই গালে শব্দ করে। তারপর একগাল হেসে নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'মারিয়া।'

সুধারানীর শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠল। মেয়েছেলেটা তাকে চুমু খেল? এদেশে কি ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলেকেও চুমু খায়? সে ঢোঁক গিলল। মেয়েটি ততক্ষণে সমানে বলে চলেছে বুকে আলতো হাত ঠেকিয়ে 'মারিয়া—মারিয়া।'

সুধারানী ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে সামান্য শান্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'মারিয়া?'

'সি মারিয়া।' মেয়েটি আবার হাসল। তারপর ইশারায় সুধারানীকে দেখিয়ে মাথা নেড়ে কিছু জানতে চাইল। কয়েকবার ওরকম করার পর সুধারানীর মনে হল মেয়েটার নাম মারিয়া এবং সে তার নাম জানতে চাইছে। সুধারানী বলল, 'সুধা।'

'সুদা।' মেয়েটি আবার হাসল। তারপর নিজের বুকে হাত রেখে উচ্চারণ করল, 'মে মারিয়া,' তারপর সুধারানীর বুকের ওপর হাত রেখে বলল, 'সুধা।'

'সুধারানী মাথা নাড়তে কলের পুতুলের মত এক পাক নেচে নিয়ে সিগারেট নিয়েই মেয়েটি বাথরুমে চলে গেল। সুধারানী আড়চোখে দেখল বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হল না পুরো। এ কি ধরনের মেয়েছেলে বাবা। খাটের ওপর এসে চুপটি করে বসল সুধারানী। এবং তখনই টেলিফোনটা আলো জ্বেলে শব্দ করতে লাগল বিপ, বিপ, বিপ।

সুধারানী সেদিকে তাকিয়ে প্রথমে কি করবে বুঝে উঠছিল না। তারপর ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুলতেই হ্যালো হ্যালো শব্দ শুনতে পেল। কানের কাছাকাছি এনে সে কোনমতে বলল, 'উনি বাথরুমে গিয়েছেন।'

'দূর শালা। আমি তোমাকে চাইছি।'

'কে আপনি?'

'আরে বাবা, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি পিন্‌টো।'

'পিন্টো। ও। এভাবে মেঘনাদের মত আড়ালে থেকে কথা বলছ কেন?'

'মেঘনাদ কে?'

এই প্রথম নিজের ওপর আস্থা ফিরে এল সুধারানীর। মোক্ষদার কল্যাণে রামায়ণ মহাভারত তার মুখস্থ হয়ে গেছে বললেই চলে। পিন্টো বোধহয় মহাভারত কি তাই জানে না। সে চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই মেয়েছেলেটাকে এখানে ঢুকিয়ে গেলে কেন?'

'আমি ঢুকাইনি। যারা আমাদের এখানে এনেছে তারাই ঢুকিয়েছে। ও এখন তোমার ঘরে থাকবে। যদি ডিস্টার্ব করে তাহলে আমাকে বলবে।'

'ও কি ব্যবসা করে?'

'হ্যাঁ। নাহলে ডাকবে কেন?'

'ওর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কথাও ও কিছু বুঝতে পারছে না। শোন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাল জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। আমাদের খেতে যেতে হবে।'

'এম্মা! ছি ছি।'

'কি হল, খাওয়ার কথা শুনে ছি বলছ?'

'না-না। মেয়েছেলেটা বাথরুম থেকে ন্যাংটো হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ইস।'

'এ্যাঁ।' টেলিফোনে পিন্টোর স্বর যেন চটকে উঠল।

'কি বলছি তোমায়। শুধু একটা জাঙ্গিয়া—'

'জাঙ্গিয়া নয়,' পিন্টো বলল, 'প্যান্টি।'

'হ্যাঁ, প্যান্টি ছাড়া কিছু নেই পরনে।'

'বলে যাও, বলে যাও।'

হঠাৎ খেয়াল হল সুধারানীর। সে চাপা গলায় বলল, 'এই জন্যে ব্যাটাছেলেদের দু'চোখে দেখতে পারি না। মা বলে চিতায় উঠেও ছোঁকছোকানি যায় না। ঠিক বলে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে সে এবার মারিয়ার দিকে তাকাল। মেয়েটা তার চেয়ে অনেক লম্বা। কি শরীর। অনেক সময় প্রয়োজনে সুরবালা তার সামনেও জামাকাপড় ছাড়ে। কিন্তু সেটা হয় ঝটপট, আব্রু রেখে। এ যে শুধু প্যান্টি পরে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসময় মারিয়া ব্যাগ থেকে একটা বিয়ারের ক্যান বের করে মুখ খুলে খানিকটা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে সুধারানীর দিকে এগিয়ে ইশারা করল খেতে। ওটা কি? বোতলে যেমন সরবত থাকে এও কি তাই? সুধারানী ভাব জমাবার জন্যে টিনটা নিল। তার নাকে সামান্য বাস এল। এটা সে চেনে। ব্যবসার সময়ে অনেক পুরুষ মদ না খেয়ে থাকতে পারে না। তারা চায় সুধারানীও খাক সঙ্গে। কিন্তু হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করে না তার। মোক্ষদার পরামর্শ মেনে বিয়ার খাওয়ার অভ্যাসটা করেছে। এই টিন থেকে বিয়ারের গন্ধ বের হচ্ছে। সে মুখে ঢালল পদার্থটা। সোনাগাছির বিয়ারের মত ঝাঁঝ নেই কিন্তু তিক্কুটে স্বাদের সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ মিশে রয়েছে।

ওপরে একটা ঢোলা জামা পরে মারিয়া নিজের বিছানায় বসে শরীরটাকে দেখিয়ে কিছু কথা বলল। সুধারানী এখন অনেকটা সহজ। সে পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিল, 'দারুণ দেখতে। তুমি যদি সোনাগাছিতে ঘর নিতে তাহলে খদ্দের

সামলাতে পারতে না মারিয়া।'

নিজের নামটা কানে যাওয়ায় মারিয়া খুশি হয়ে বলল, 'সি সুধা।'

টেলিফোন নামিয়ে পিন্টো তার গৃহসঙ্গীর দিকে তাকাল। ওরকম বিশাল চেহারার নিগ্রো সে আগে কখনও দ্যাখেনি। লোকটা জুতো জামা পরে সটান শুয়ে আছে। ঘরে ঢোকার পর বলেছিল, 'হেই মিস্তার, দিস্ ইজ সাম, গ্রেটেস্ট পিম্প টাইম স্কোয়ার এভার প্রোডিউসড। এ্যান্ড নাউ হু দি হেল ইউ আর?'

'দিস ইজ পিন্টো। পিন্টো ফ্রম গোল্ডেন বাঞ্চ, ইন্ডিয়া।'

লোকটা কাঁধ নাচিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। পিন্টোর খুব অবাক লাগছে। টাইম স্কোয়ারটা কোথায়? তাদের দালালদের চেহারা এত বড় হয়? সোনাগাছির ইংরেজি নাম শুনে লোকটা খেয়ালই করল না। অথচ সে এতদিন শুনে এসেছে সোনাগাছির নাম সমস্ত পৃথিবীর কারবারীরা জানে।

সুধারানীর সঙ্গে কথা শেষ হওয়া মাত্র দরজায় শব্দ হল। পিন্টো দরজা খুলে দেখল দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে। তাদের বুকে ব্যাচ আঁটা। একজন বলল, 'হেলো!'

পিন্টো মাথা নেড়ে শব্দটা ফিরিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে ওরা সামের দিকে একপলক তাকাল। তারপর লিস্ট বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া?'

'ইয়েস।'

দুটো ব্যাচ বের করে এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'দিস ইজ ফর ইউ, এ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর দি গার্ল। ইউ মাস্ট ডিসপ্লে দিজ অন ইওর চেস্ট। ওকে! উই আর মিটিং এ্যাট ডিনার। প্লিজ কাম ইন দ্য ডাইনিং রুম, ইন টাইম।'

পিন্টো মাথা নেড়ে ব্যাচদুটো তুলে নিতেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'এ্যান্ড নাউ, ইউ, ইউ আর ফ্রম ইউ. এস. এ, ইজন্ট ইট?'

সাম উঠল না। ডান হাত সামান্য তুলে নামিয়ে রাখল। পিন্টো যে কথাগুলো বলেছিল মেয়েটি সেই কথাই সামকে বলে ব্যাচ দিয়ে যখন ঘর ছেড়ে গেল তখনও সাম শুয়ে। চলে যাওয়ার পর বলল, 'বিচ্।'

পিন্টো জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াটস দ্য ট্রাবল?'

'ট্রাবল? হু কেয়ারস ট্রাবল। অনলি প্রব্লেম ইন দিস প্লেস ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। নো বডি আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ একসেপ্ট দিজ ভলান্টিয়ার্স। কান্ট আর্নমানি অন বার্গেন। ইউ ডোন্ট নো ডোরা। শী ইজ গ্রেটেস্ট বিচ আই হ্যাভ এভার সিন। শী উইল ট্রাই টু ওভারটেক মি।' শরীরটাকে টেনে টুনে সাম টেলিফোনের কাছে নিয়ে গিয়ে বোতাম টিপল। ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'হু? ও নোহ্। অস্ট্রেলিয়া? আই ওয়ান্ট ডোরা ফ্রম ইউ. এস. এ।' সাম মাথা নাড়ল, 'ম্যারিকা এন্ড অস্ট্রেলিয়া স্টেইং টুগেদার। হাই ডোরা! হোয়াট দি হেল আর ইউ ডুয়িং দেয়ার? লুক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ফাসি বিজনেস। জাস্ট গিভ মি এক্সাক্ট শেয়ার এ্যান্ড ডু হোয়াট এভার। ওকে!' সাম মুখ কোঁচকাল। কয়েকবার ডোরা ডোরা বলে ডাকল। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে ফিক ফিক করে হাসল, 'ইউ নো বাডি, গার্লস নিড থ্রেটনিং এভরিটাইম দে টক। আই হার্ড লট অফ থিংস

এ্যাবাউট প্যারিস। ইটস এ গোল্ডমাইন। হোয়াট ইজ ইওর প্লান ? হাউ ইজ ইওর গার্ল ?'

'শী ইজ গুড।'

'হাউ মাচ ইউ আর্ন এ ডে ?'

পিন্টো সামের দিকে তাকাল। কি উত্তর দেবে সে! মাস্তানী আর মেয়ের দালালি তো এক জিনিস নয়। একটু বাড়িয়ে বললে কেমন হয়, 'ফোর হান্ড্রেড রুপিস।'

'রুপিস! কনভার্ট দ্যাট ইন ডলার।'

'সে থার্টি ডলার্স।'

'মাই গড। অনলি থার্টি ডলার্স ?' হো হো করে হাসল সাম, 'আই আর্ন এ্যাট লিস্ট হান্ড্রেড এ ডে। সো দে সোল্ড ভেরি চিপ ইন ইন্ডিয়া।'

পিন্টো কথাটা হজম করল। সোনাগাছির দালালরা দিনে তিরিশ টাকাও রোজগার করে না এটা বললে কি করত লোকটা ?

দরজায় শব্দ হল। সাম উঠে হেলতে দুলতে সেটা খুলতেই একটা কালো আগুন যেন সাপের মত ছোবল মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'ইউ, ইউ বাস্টার্ড, আর ইউ থ্রেটনিং মি, আমাকে ছাড়া তোর কি মূল্য ? এখানে কে পুঁছতো তোকে ? বল, বল ?' দু'হাতে আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করতে করতে সাম পিছু হটছিল। আর সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে কিছু বলে যাচ্ছিল। ওর বিশাল চেহারাটাকে এখন খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। শেষতক বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সাম। আর সেই বন্ধ দরজার ওপরে কয়েকবার লাথি চালিয়ে গালাগালি ছুঁড়ল মেয়েটা। পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চি লম্বা, নিগ্রো শরীর কিন্তু মুখ-চোখ টানা মেয়েটা ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। বসে চিৎকার করে বলল, 'আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ। আজ এর শেষ না করে যাব না। দেখি কতক্ষণ বসে থাকিস ওখানে।'

সাম-এর কোন জবাব পাওয়া গেল না। পিন্টো বুঝল মেয়েটা এত উত্তেজিত যে তার অস্তিত্ব লক্ষ করছে না। এতক্ষণ যে লোকটা এত রোয়াব দেখাচ্ছিল তার এই পরিণতি দেখে সে বেশ খুশি হল।

মেয়েটি সামের সিগারেট প্যাকেট নিতে হাত বাড়াতেই পিন্টোকে দেখতে পেল। তাব চোখ ছোট হল, 'হু আর ইউ ?'

'দ্যাটস দ্য কোশ্চেন আই শুড আস্ক ইউ।'

'আই অ্যাম ডোরা। দে ইনভাইটেড মি টু জয়েন কনফারেন্স।'

'দিস ইজ পিন্টো। আই হ্যাভ কাম ফর দ্য সেম ফ্রম ইন্ডিয়া।'

'ওঃ, ইন্ডিয়া! টাজমহল ?'

'ইয়েস। নাউ, হোয়াটস দ্য প্রব্লেম ? হোয়াই ইউ আর সো এ্যাঙ্গরি উইদ হিম ?'

ডোরা পরিষ্কার চোখে তাকাল, 'ওয়েল, আমি ভেবেছিলাম সাম এঘরে একা থাকে।'

'না, ঘরটা আমার আর ওর জন্যে বরাদ্দ।'

পিন্টোর কথার জবাব না দিয়ে ডোরা একটা সিগারেট এগিয়ে ধরল ওর

দিকে। পিন্‌টো হাসল, 'নো, থ্যাঙ্কস। কিন্তু লোকটাকে বাথরুমে বসিয়ে রাখবে কতক্ষণ ?'

'দশ মিনিট। ও জানে দশ মিনিটে আমার রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আর সেটা জানে বলে ওকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। ডু ইউ নো হোয়াট হি ক্রেইমস ? হি ওয়ান্টস টু বি রিকগনাইজড ম্যাজ মাই কোচ। এখন এই কনফারেন্সে এসে আমার চোখ খুলে গেছে। যেসব মেয়েরা এসেছে তাদের এসকর্টরা কত স্মার্ট, কত পোলাইট। লুক, আজকাল প্রফেসনাল না হলে ভাল বিজনেস হয় না। আই মাস্ট গেট রিড অফ হিম। সামকে নিয়ে ঘোরা আর একটা ষাঁড়কে কাছে রাখা এক ব্যাপার।'

'কিন্তু সাম বলেছে তোমার মত মেয়ে আর নেই।'

'সত্যি কথা বলতে তো পয়সা খরচ হয় না।' ডোরা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওকে বল আমাকে ফোন করতে।'

কোনদিকে না তাকিয়ে ডোরা চলে গেল। পিন্‌টো ধাতস্থ হতে সময় নিল। তারপর বাথরুমের দরজায় টোকা দিল, 'হাই সাম, শী হ্যাজ গন।'

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলল। সাম বেরিয়ে এলে পিন্‌টো দেখল লোকটা এর মধ্যে স্নান করে নিয়েছে দরজার দিকে তাকিয়ে সাম বলল, 'কিছু বলে গেছে ?'

'হ্যাঁ। তোমাকে ফোন করতে বলেছে।'

'গুড। শী ইজ রিয়েল সুইটি।'

ডিনারের আগে সমস্যায় পড়ল পিন্‌টো। সাম যেভাবে সাজগোজ করছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে পোশাক সে পরে রয়েছে তা মানানসই হবে না। অথচ সুধারানীকে নিয়ে ডিনারে যেতে হবে তাকে। সাম তার সমস্যার কথা শুনে একটা চামড়ার জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল, 'এইটে গলিয়ে নাও। তোমার বড় হবে কিন্তু সবসময় মনে রাখবে যে তুমি নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ লোকটির আশ্রয়ে আছ।'

পিন্‌টো ওটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাক কোঁচকাল। প্রথমত বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে জ্যাকেটটা। দ্বিতীয়ত, তার হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে ঝুল। সে ঠিক করল যে পোশাকে এসেছে তা যদি ডিনারের যোগ্য বলে ওরা মনে না করে তাহলে সে ফিরে আসবে। সাম বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই। ডলার, ট্রাভেলার্স চেক এবং পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যতদূর সম্ভব ভদ্রস্থ হয়ে পিন্‌টো বের হল।

সুধারানী ওর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজার শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল সেই মেয়েটা নেই কিন্তু ঘরে চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। সে দরজায় গিয়ে কান পাততে পিন্‌টোর গলা পেল।

ঘরে ঢুকে পিন্‌টো চমকে উঠল, 'যাচ্চলে ! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি ?'

হাই তুলল সুধারানী, 'হ্যাঁ বাবা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ওই মেয়েটা কখন চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। জানো মেয়েটাকে যা ভেবেছিলাম, তা নয়, বেশ ভাল।'

'ঠিক আছে। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। চটপট তৈরী হয়ে নাও।'

'কেন ? আমি কোথাও যাব না। আমি ঘুমাবো।'

'দূর ! এখন আমাদের ডিনারে যেতে হবে।'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'ডিনারে। সেখানে আর যারা এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'ডিনারে কি হয়?'

'ওঃ। দুপুরের খাওয়াকে লাঞ্চ আর রাতের খাওয়াকে ডিনার বলে।'

'খেতে খেতে সবার সঙ্গে দেখা হবে?'

'হ্যাঁ। তোমার সবচেয়ে ভাল শাড়ি পরে নাও।'

সুধারানী খুশী হল। সাজতে তার ভাল লাগে। কিন্তু এবার এমন সব জামা সে কিনেছে যা আগে কখনও পরেনি। স্যুটকেশ খুলে সে কয়েকটা শাড়ি বের করল, 'কোনটা পরব?'

এরকম প্রশ্নের সামনে কখনও পড়েনি পিন্‌টো। তবু তার মনে হল আজ প্রথম দিনেই সুধারানীকে দারুণ দেখানো দরকার। সে ঝুঁকে শাড়ি পছন্দ করতে লাগল।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে, যখন দশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে ডিনারের সময় থেকে, তখন সুধারানী ঘর থেকে বের হল। তার পরনে পাকা সোনা রঙের সিল্কের শাড়ি যার এক ইঞ্চি কালো পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে হাত কাটা কাঁধ আঁকড়ে থাকা কালো ব্লাউজ, সামান্য উঁচু করে বাঁধা টপনট খোঁপা, মুখে ঠোঁটে রঙের সমান আস্তরণ। ওর খোলা পুরুষ্টু হাতের দিকে তাকিয়ে পিন্‌টোর বুকে বেড়াল মুখ ঘষছিল। সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কেমন লাগছে গো?'

'দারুণ।' বলে করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়ে সুধারানীর বুকে ব্যাচটা আটকে দিল পিন্‌টো।

'এটা কি গো?'

'তোমার পরিচয়পত্র। এটা কখনই হারাবে না। এটা দেখে ওরা তোমাকে চিনবে।'

সুধারানী হাসল, 'তুমি কি ভাল! এ মা! একদম মনে ছিল না।'

'কি?'

'দাঁত ধোওয়ার পর তোমাকে চুমু খাব ভেবেছিলাম।'

'থাক। পরে হবে।'

'সে তো ঠিকই। এখন খেলে লিপস্টিক উঠে যাবে।'

রিসেপশনে নামতে নামতেই পিন্‌টো টের পেল সবাই তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। অবশ্য সেটা সুধারানীর জন্যই হচ্ছে। রিসেপশনিস্ট বলল, 'জলদি হোটেলের সামনে চলে যাও। ওখানে তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

সেন্ট্রালি হিটেড্ হোটেলের বাইরে পা দিতেই কুঁকড়ে উঠল পিন্‌টো। দিনের বেলায় এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় বিন্দুমাত্র টের পায়নি অথচ এখন ঠাণ্ডা যেন চুঁইয়ে ঢুকছে হাড়ের ভেতরে। তাকালে মনে হবে রাত তো দূরের কথা সন্ধ্যে পর্যন্ত নামেনি কিন্তু ঘড়ি বলছে ডিনারের সময় হয়েছে। সে সুধারানীর দিকে তাকাল। হাত খোলা, পেট উন্মুক্ত কিন্তু সুধারানীকে দেখে মনে হচ্ছে না শীত করছে ওর। এখন নাহয় আলো আছে কিন্তু রাত্রে, যখন ঠিকঠাক রাত নামবে তখন যে ঠাণ্ডা পড়বে তা সইবে কি করে? পিন্‌টো ইতস্তত করছিল। এইসময় একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাত নেড়ে সমানে কিছু বলে ইঙ্গিত

করল তাকে অনুসরণ করতে। সুধারানী পিন্‌টোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে কিছুই বুঝতে পারেনি। সে হেসে ফেলল, 'তোমাকে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছে।'

পিন্‌টো গম্ভীর হয়ে গেল, 'চল, আমাদের ডাকছে।'

লোকটার বুকে আঁটা ব্যাচ নজরে পড়ায় পিন্‌টো সুধারানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। হোটেলের বাঁ দিকের গলিতে দুটো বাস দাঁড়িয়ে। লোকটা তাদের সেখানে নিয়ে যেতেই দুজন ব্যাচপরা মহিলা হাসিমুখে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। পিন্‌টো লক্ষ্য করল এদের চোখও সুধারানীকে দেখে মোহিত হয়েছে।

দুটো বাসে দুজনকে আলাদা উঠতে হল। মেয়েদের যে আলাদা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা পছন্দ না হওয়ায় সুধারানী বেঁকে বসতে যাচ্ছিল। পিন্‌টো অনেক কথায় রাজী করিয়েছে। লম্বা উঁচু, দুপাশে কাঁচের দেওয়াল, শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসে বসে সুধারানী বুঝতে পারল সে মিছিমিছি ভুল করেছিল। কারণ এই বাসে যত সাজুগুজু করা মেয়েরাই যাচ্ছে। সে উঠতেই মারিয়া হাত তুলেছিল পেছন থেকে। কি করবে বুঝতে না পেরে সে সামনের একটা খালি আসনে বসে পড়েছিল। বসে দেখল, তর পাশের আসনের মেয়েটি, যার পা অবধি সাদা সিল্কের ঝোলা গাউন, মুখ ফিরিয়ে নিল রাস্তার দিকে, যেন সুধারানীর সঙ্গ পছন্দ হচ্ছে না। সুধারানীরও রাগ হয়ে গেল। সে একটু বেশী রকমের উল্টোমুখী হয়ে বসল। বসেই বুঝতে পারল বাসের অন্যান্য মেয়েরা তার দিকে বারংবার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। নিশ্চয়ই এই শাড়িটাকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। সে সুরবালার কাছে কৃতজ্ঞ হল আর একবার। নিজের শাড়ি, নিজের জামা এবং পাশের মেয়েটাকে এড়াতে সুধারানীর মন পড়ে থাকায় সে রাস্তাঘাট কিংবা ঘরবাড়ি কিছুই দেখছিল না। হঠাৎ সম্মিলিত চিৎকার কানে আসতে সে চোখ তুলে হতভম্ব হয়ে গেল। একি কাণ্ড ? সিনেমাহলের মত বাড়িগুলোর সামনে ল্যাংটো মেয়েদের ছবি, শুধু তাই নয়—সুধারানী চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ তার শরীরে একটা অস্বস্তি বাড়তে লাগল। ড্রাইভার মাইকে ঘোষণা করল, 'পিগাল।'

রাস্তাটার দুপাশে একই ধরনের বাড়ি। প্রতি বাড়ির সামনে নারী পুরুষের মিলনের নানান প্রক্রিয়ার ছবি। কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'মুলারুজ, মুলারুজ।' সুধারানী মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল। সে এসবের কিছুই বুঝতে পারছিল্ না। বাস অঞ্চলটা পেরিয়ে আসার পর তার খেয়াল হল ওই রাস্তায় সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে। যদি ওটা সোনাগাছির মত ব্যবসাকেন্দ্র হয় তাহলে সাধারণ মানুষ হাঁটবে কেন ? সোনাগাছির রাস্তায় ছেলেমেয়ের সঙ্গে তো কাউকে বেড়াতে যেতে দেখা যায় না।

সুধারানীকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল পিন্‌টো। সবাই ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়। কি করে অত সুন্দর পোশাকটাকে সে ম্যানেজ করছে, কি দারুণ দেখতে তাকে এই সব প্রশ্ন এবং প্রশংসার জবাব দিতে হচ্ছে ওর হয়ে পিন্‌টোকে। বিরাট হলঘরে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গল্প করার জন্যে। পঁচিশটি বিভিন্ন দেশের মেয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই তাদের এসকর্টরা পাশে রয়েছে এখানে। পিন্‌টো লক্ষ্য করছিল বেশীরভাগ

মেয়ের পরনে শরীর দেখানো স্কার্ট, কেউ কেউ অবশ্য প্যান্ট পরে এসেছে। শুধু ব্যতিক্রম হওয়াতেই সুধারানী সবার নজর কাড়ছে।

উদ্যোক্তারা ঘুরে ফিরে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামীকাল বিকেল থেকে অধিবেশন আরম্ভ হবে। ঠিক তিনটের সময় হোটেল থেকে বাস সবাইকে নিয়ে বের হবে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার জন্যে। অধিবেশন বসবে দুদিন। তাই প্রতিদিন পনেরজন মেয়ে ছয় মিনিট করে বলার সুযোগ পাবে। নিজস্ব এলাকার পুরুষদের ব্যবহার সম্পর্কে তারা ওই সময়ের মধ্যে গুছিয়ে বলবে, উদ্যোক্তারা এই আশা করে। ভাষাসমস্যা নিয়ে উদ্যোক্তারা বিব্রত নয়। প্রতিটি প্রতিনিধির জন্যে একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তারা ফরাসীতে অনুবাদ করে দেবেন। এইসঙ্গে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করল যে দশজন মেয়েকে সবচেয়ে ভাল বক্তা হিসেবে গণ্য করা হবে তাদের নিয়ে পাঁচদিনের একটি পরিক্রমা করা হবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের মেয়েদের অবস্থা পর্যালোচনা করবে এই মেয়েরা। আপাতত আফ্রিকার তিনটি দেশে প্রতিনিধিদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানকার সমশ্রেণীর মেয়েদের অবস্থা জেনে রিপোর্ট তৈরী করা হবে। তবে অবশ্যই এই পাঁচ দিনের জন্যে প্রত্যেককে সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হবে। উদ্যোক্তারা ফরাসী এবং ইংরিজিতে ছাপানো প্রোগ্রাম সবাইকে দিলেন। কেউ অসুস্থ না হলে ওর পরিবর্তন হবে না।

পিন্টো সুধারানীর নাম খুঁজতে গিয়ে অবাক হল। প্রতিটি মেয়ের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী তার বলার সময় স্থির হয়েছে। সুধারানীকে রাখা হয়েছে শেষদিনের শেষ বক্তা হিসেবে। টি থেকে জেড অক্ষরের নামের কেউ নেই এখানে। সুধারানীকে এখন ভাল করে বোঝাতে হবে। কিন্তু যে দোভাষী ওরা আনবে সে কি বাংলা বুঝতে পারবে। পিন্টো মুখ তুলে দেখল সুধারানী আর সেই মেক্সিকান মেয়েটি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে। ওর হঠাৎ মনে হল সুধারানী ইতিমধ্যেই খুব সচল হয়ে গেছে। মেয়েটি যখন কথা বলছে সুধরানী তখন চুপ করে শুনছে। অথচ কেউ কারো ভাষা বোঝে না। খুব মজা লাগছিল পিনটোর। ড্রিঙ্কস সার্ভ করা হচ্ছে। ও ইচ্ছে করেই সরে দাঁড়ল। এইসময় সাম তাকে ডাকল। সামের হাতে একটা বড় বিয়ারের জাগ।

সামের পাশে সেই কালো মেয়েটি আর সাদা সিল্কের পা ঢাকা পুরোনো স্টাইলের পোশাক পরা সুন্দরী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। সাম চিৎকার করে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বলবে না মদ খাও না! লুক অ্যাট হিম বেবি, হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া, সিগারেট খায় না মদ খায় না।'

ডোরা বলল, 'দ্যাটস গুড। উই নো ইচ আদার, ইজন্ট ইট?'

পিন্টো মাথা নাড়ল, 'ওয়েল , উই হ্যাভ সিন ইচ আদার।'

'আঁ?' চমকে উঠল ডোরা। তারপর একটা হাতে পিন্টোর বুকে চাপ দিল, 'ইউ! ইউ নো হাউ টু টক। হাউ ইজ শী?'

'কার কথা বলছ?' প্রসঙ্গ খুব দ্রুত পাল্টে যাওয়ায় বুঝতে পারল না পিন্টো।

'ইওর গার্ল? হাউ মেনি ডেস ইউ আর টেকিং কেয়ার অফ হার?'

'নো! আই অ্যাম নাইদার কোচ নর হার এজেন্ট। আই অ্যাকম্পানিড হার অন রিকোয়েস্ট। দ্যাটস অল।' সত্যি কথাটা বলল পিন্টো।

সাম চোখ ছোট করল, 'আর ইউ নট ইন দিস বিজনেস ? ইউ ডোণ্ট ফাইট ? ইউ ডোণ্ট কিল পিপল ?'

'আই নো হাউ টু ম্যানেজ দেম উইদাউট ব্লাডশেড।'

'ওঃ! হাউ নাইস। লার্ন দ্যাট স্যাম।' ডোরা খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল। তারপর সাদা পোশাকের মেয়েটিকে বলল, 'ওহো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। এ হল পিন্‌টো। রিয়েল ডিসেণ্ট ম্যান ফ্রম ইণ্ডিয়া। অ্যান্ড শী ইজ লিজা ফ্রম সোহো, লন্ডন।' লিজা মাথা নাড়ল পিন্‌টোর দিকে তাকিয়ে। আর পিন্‌টোর হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল ধড়াস করে। লন্ডন ? ইংলন্ড। যেখানে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে এতদিন। কি বলবে বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'হু ইজ এসকর্টিং ইউ লিজা ?'

'নান। বিকজ আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইট।' মেয়েটির গলা খসখসে।

'খুব ভাল লাগল কথাটা শুনে। আবার দেখা হবে।' পিন্‌টো হঠাৎই হাঁটতে লাগল। মেয়েটির বলার ধরন পছন্দ হচ্ছিল না তার। এ মেয়ে বরফের মত, পাশে থাকলে জমে যেতে হয়।

রাতের খাবার খেতে খুব কষ্ট হল সুধারানীর। দুপাত্র মদ পেটে পড়ায় যে মেজাজ হয়েছিল সেটা কেটে গেল পিন্‌টোর মুখে মাংসগুলো গরু এবং শুয়োরের শুনে। লম্বা টেবিলের ওপর বিভিন্ন পাত্রে হরেকরকমের খাবার সাজানো রয়েছে। অনেক বলে একটুকরো প্যাসট্রি নিতে রাজী করাল পিন্‌টো। সে বোঝাতে চাইল যে দেশে এসেছে সেই দেশের মত আচরণ করতে হবে। নইলে শরীর নিয়ে মুশকিলে পড়ে যাবে সুধারানী। নিজের খাবার নিয়ে সে ইচ্ছে করেই সুধারানীর কাছ থেকে সরে গেল। এখান থেকে ইংলন্ড মোটেই দূরে নয়। তাকে একবার সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু কবে ? কাল সকালে গিয়ে পরশু বিকেলে ফিরে আসা যাবে ? আগামীকালের রাতের অনুষ্ঠানে তো সুধারানীর কিছুই করার নেই। এইসময় সে লিজাকে দেখতে পেল। সমস্ত হলঘর জুড়ে যখন প্রতিনিধিরা খাচ্ছে, গল্প করছে তখন মেয়েটা ছোট্ট প্লেটে খাবার নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে, চুপচাপ। সোহো। পিন্‌টো শুনেছে সোহো হল লন্ডনের সোনাগাছি। সামের কাছে জেনেছে টাইম স্কোয়ারও নিউইয়র্কের তাই। সে ধীরে ধীরে লিজার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল, 'হাই, লিজা, তুমি আমার একটা উপকার করতে পার ?'

লিজা খাবারে মন দিল, 'আই অ্যাম প্রফেশনাল।'

'আই ওয়ান্টেড টু নো অ্যাবাউট লন্ডন। আই হ্যাড নেভার বিন দেয়ার।'

'হোয়াই ডোণ্ট য়ু গো টু আওয়ার এজেন্সি হেয়ার। দে উইল লাভ টু টেল ইউ।'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল পিন্‌টোর। এত ডাঁট কেন মেয়েটার ? সে চাপা গলায় উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'ইউ ডোণ্ট নো হাউ টু বিহেভ উইদ এ জেণ্টলম্যান।'

'আই ডোণ্ট নো হোয়েদার এ পিম্প ক্যান বি কাউন্টেড অ্যাজ এ জেণ্টেলম্যান।'

'আই অ্যাম নট পিম্প। আই লিভ অন মাই ব্রেইন অ্যান্ড মাস্‌ল। মাই গ্রান্ড

মাদার ইজ স্টেয়িং ইন লন্ডন। আই হ্যাভ নেভার সিন হার! বাট ইউ, ইউ আর সো হার্টলেশ, সো ক্রুড···।' পিন্টো ঘুরে দাঁড়াতেই হাসি শুনতে পেল। লিজা হাসতে হাসতে বলল, 'হার্ট! হু ক্রিয়েটেড দ্যাট? গড? সরি! বিকজ হি হিমসেল্ফ ডাজ নট নো দ্যাট। হি ইজ হার্টলেশ টু।' আবার বরফের শীতল স্পর্শ। পিন্টো লম্বা লম্বা পা ফেলে জনতার মধ্যে চলে এসে অবাক হল। একটা সাদা ছোকরা সমানে আলাপ জমিয়ে যাচ্ছে সুধারানীর সঙ্গে। সুধারানীও ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। ওদের ভাষাটা কি? কারণ সুধারানীর পক্ষে বাংলা ছাড়া আর কিছুতেই কথা বলা সম্ভব না। ছেলেটা মাঝে মাঝেই সুধারানীর কোমরে হাত রাখছে এবং সুধারানী তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করছে না। ওদের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ানো পছন্দ করল না পিন্টো। সে এগিয়ে যাচ্ছিল এইসময় ডোরা তাকে ডাকল, 'এই যে পিন্টো। তুমি কি খুব ব্যস্ত?'

'না। কেন কি ব্যাপার?'

'তোমার কাছে একটা সাহায্য চাই।'

'আই অ্যাম প্রফেশনাল।' লিজার ভঙ্গীটাকে হুবহু নকল করল পিনটো।

'মি টু। উই উইল সেটল ইট।'

'বেশ বল, কি করতে হবে।'

'সাম আজ রাত্রে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় কিনা আমাকে জানাবে?'

'ও কোথায় যাবে?'

'আমি জানি না। বাট আমার একটা হাঞ্চ হচ্ছে ও বেরুবে। টাকা রোজগারের জন্যে অন্যের পা চাটতেও রাজী আছে।'

'তোমার রুম নাম্বার?'

'ওয়ান ওয়ান ওয়ান।'

'ওকে।' বলে ফিরতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল পিন্টো। ছেলেটা সুধারানীকে জড়িয়ে ধরে আরামসে চুমু খাচ্ছে। পিন্টো দ্রুত দূরত্ব কমাল। তাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটা মুখ তুলল কিন্তু সরল না। পিন্টো গম্ভীর গলায় বলল, 'ইয়েস, জেন্টলম্যান, ইউ আর টু পে টু হানড্রেড ডলার্স ফর দ্যাট কিস।'

'টু হান্ড্রেড ডলার্স?' চোখ বড় হয়ে গেল ছেলেটার, 'বাট ইটস এ ফ্রেন্ডলি কিস? ইজন্ট দ্যাট বেবি?'

সুধারানীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই সে যখন একই ভঙ্গী করল তখন পিন্টো খুশী হল। পিন্টো বলল, 'আই থিংক ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ট্রাবল?'

'আই কান্ট পে টু হান্ড্রেড। ইউ কান্ট স্টার্ট দ্যাট ড্যাম প্রফেশন হেয়ার। আই ওন দিস প্লেস।' ছেলেটি ফুঁসে উঠল।

পিন্টো হাসল, 'সরি মিস্টার। উই আর ইন্ডিয়ান। আমাদের ওখানে কোন মেয়েকে চুমু খেলে হয় বিয়ে করতে হয় নয় টাকা দিতে হয়। তুমি নিয়ম ভাঙতে পারো না। তাহলে এই মেয়েটি বেইজ্জত হবে। উদ্যোক্তারা প্রত্যেক দেশের সিস্টেমকে সম্মান দিচ্ছেন।'

লোকটাকে খুব অপ্রস্তুত দেখাল। সুধারানী জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ ওকে?'

পিনটো বলল, 'তোমাকে ওর বেশ ভাল লেগেছে। কিছু টাকা দিতে চায়।'

ততক্ষণে লোকটি পকেট থেকে পার্স বের করে বলল, 'আমার কাছে ফ্রাঁ আছে, ডলার নেই।' বলে হাজারখানেক ফ্রাঁ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

টাকাটা গোনা শেষ করতেই সাম ছুটে এল, 'হাই, তুমি কি করে টাকা ঝাড়লে?'

পিন্টো চোখ টিপল, 'জানতে হয়। এসব সোনাগাছিতে পাবে।'

'সোনাগাছি? সেটা কি?'

'একটা জায়গা। অ্যান্ড শী ইজ কুইন অফ সোনাগাছি।'

পিন্টোর দৃষ্টি অনুসরণ করে সাম সুধারানীর দিকে তাকাতেই সুধারানী বলল, 'বাব্বা, এই দৈত্যটা আমার দিকে তাকাচ্ছে কেন? কি বলেছ ওকে।'

পিন্টো জবাব দিল, 'ওর তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। বলছে তোমার হয়ে দালালি করতে চায়। ও নাকি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দালাল।'

হঠাৎ সুধারানী পিন্টোর কনুই ধরল, 'দরকার নেই বাবা। ওকে কাটিয়ে দাও। তোমরা বরং কথা বল, আমি মারিয়ার কাছে যাই।'

সবাই হোটেলে ফিরে এসেছিল। পিন্টো যখন সুধারানীকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল তখন মারিয়া লাউঞ্জে। পিন্টো চলে যাওয়ার পর শাড়ি পাল্টে মুখে জল দিয়ে স্থির হয়েছিল সুধারানী। এতক্ষণ দুটো ব্যাপার মাথা জুড়ে বসেছিল। ওই সাদা সাহেবটা যখন চুমু খেয়েছিল তখন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি আজ পর্যন্ত অমন চুমু তাকে কেউ খায়নি। লোকটা তাকে যা বলেছিল তার বিন্দুবিসর্গ সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু মানুষের চোখ, ঠোঁট এবং হাতের আঙুল যে কত কথা বলতে পারে তা আজ স্পষ্ট বুঝেছে। পিন্টো না এসে পড়লে কি যে হত! এবং তখনই তার মনে হল, ভালবেসে মানুষটা যে টাকা দিয়ে গিয়েছে তা পিন্টোর কাছেই রয়ে গেছে। মোক্ষদা তাকে বলেছে যা করবে টাকা নিয়ে করবে এবং সেটা নিজের কাছেই রাখবে। পিন্টোর কছে টাকাটা চাইতে হবে। আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখল সুধারানী।

দ্বিতীয়ত, হোটেলে ফিরে এসে পিন্টো তাকে বলেছে আগামী পরশু বক্তৃতা দিতে হবে। গৌরনিতাই ডাক্তার যদিও সব কথা সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন তবু এখন তার কিছুই মনে পড়ল না। এত সাহেব মেমের সামনে কথা বলতে হবে ছয় মিনিট? কি কথা বলবে তা নতুন করে পিন্টোর কাছে বুঝতে হবে। সে মারিয়ার বিছানার দিকে তাকাল। মেয়েটা কখন আসবে? ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে পর্দা সরাল। সামনেই রাস্তা। সেখানে বেশ ভিড়। উল্টোদিকের দোকানে অনেক আলো জ্বলছে। মেয়ে পুরুষ ঢুকছে বেরোচ্ছে। এইসময় তার চোখ আটকে গেল। একজনের ওপর। না, কোন সন্দেহ নেই। মারিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে একটা লোক ওই দোকানের ভেতরে চলে গেল। মারিয়া কোথায় গেল? বুকের ভেতর হঠাৎ একটা ইচ্ছার জন্ম হল। মারিয়া যদি যেতে পারে তো সে কেন যাবে না। কিন্তু কিভাবে যাবে সে? সুধারানী বিছানায় ফিরে এল। এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। একবার, দুবার। সুধারানী রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে অচেনা ভাষায় পুরুষকণ্ঠ বেজে উঠল।

সুধারানী কিছুক্ষণ শোনার পর রিসিভার নামিয়ে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে

বলল, 'মানুষ যে কেন ছাই এক ভাষায় কথা বলে না!'

মিনিট দশেক ঘরে থেকে সাম বলল, 'হাই পিন্‌টো। লেটস গো টু পিগাল।'

'পিগাল? হোয়াট দ্যাট?'

'ওহো! যাওয়া আসার পথে দ্যাখোনি। অনলি পর্নো এরিয়া অফ প্যারিস।'

'দূর!' পিন্‌টো পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

'আই সি! তাহলে আমি একটু একাই ঘুরে আসি।' দরজায় পৌঁছে সাম বলল, 'ডোরা ফোন করলে বলবে ঘুমিয়ে পড়েছি।' সাম চলে গেলে পিন্‌টো শুয়ে শুয়ে ইংলন্ডের কথা ভাবছিল। ভিসা নেওয়া আছে, পকেটে পুরো পাঁচশো ডলার হয়েছে। পৌঁছে গেলে কোন অসুবিধাই হবেনা। কিন্তু সুধারানীকে সঙ্গে নিয়ে ইংলন্ডে যাওয়া যাবে না। দিদিমা যদি বেঁচে থাকে তাহলে পরিচয় দিলে যে ঠিক কিরকম ব্যবহার পাওয়া যাবে সে কল্পনা করতে পারছে না। উনি খাতির যে করবেন এমন ধারণা নেই। যদি না করেন তাহলে সে ফিরে আসবে। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়? উত্তেজনায় পিন্‌টোর ঘুম আসছিল না।

রিসিভার তুলে সে ডোরার ঘরে ফোন করল। খবরটা দিলে যদি কিছু পাওয়া যায়! কিন্তু ফোন বেজে গেল, কেউ ধরল না। তাহলে সামের খবর দেবে কাকে?

পিন্‌টো আবার ঘর ছেড়ে বের হল। সোজা একতলার লাউঞ্জে এসে সোফায় বসল। বিশাল হোটেল। কিন্তু এখন রিসেপশনে দুজন ছাড়া কেউ নেই। পিন্‌টোর একবার মনে হল সুধারানীর খবর নেওয়া দরকার। সেই লোকটা আবার হোটেলে এসে উপস্থিত না হয়। তারপরেই ফ্রাঁগুলোর কথা ভাবল। আজ রাত্রে কথা বললে যদি সুধারানীর টাটকা টাটকা স্মৃতি ভেসে আসে! দরকার নেই।

এইসময় সে লিজাকে দেখল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে কাউন্টারে চাবি দিয়ে সোজা দরজার দিকে এগোচ্ছে। এত রাত্রে যাচ্ছে কোথায়? পিন্‌টো উঠে দাঁড়াল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে লিজা চারপাশে তাকাল। তারপর অলস পায়ে ফুটপাথে হাঁটতে লাগল। এই জায়গাটায় তেমন লোকজন নেই। দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করছিল পিনটো। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বেশ চওড়া একটা রাস্তায় চলে এল। যেখানে আলো ঝলমল করছে। এত সুন্দর সাজানো রাস্তা জীবনে দ্যাখেনি পিন্‌টো। যতদূর চোখ যায় সোজা চলে গিয়েছে। এত রাতেও জমজমাট ভিড় খোলা রেস্টুরেন্টে, কাফেতে। পিনটো আবিষ্কার করল কিছু মেয়ে এইসময় খদ্দের ধরতে বেরিয়েছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় রাত্রের চৌরঙ্গী-মিউজিয়াম এলাকার মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই।

লিজার কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ একটা লোক লিজাকে দেখে টুপি তুলল। লিজা তার দিকে তাকালই না। লোকটা এগিয়ে গিয়ে লিজাকে প্রায় আটকাল। দূর থেকে পিন্‌টো কিছুই বুঝতে পারছিল না। লোকটা লিজাকে রাজী করানোর চেষ্টা করছে কিন্তু লিজা ওকে এড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগল। পিনটো যখন লোকটাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে তখন সে ঠোঁট কামড়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

লিজা হাঁটছে। দেখে মনে হয় একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে সে। আলোকিত রাস্তা পাব হয়ে আবছা অন্ধকারে পৌঁছে যখন লিজা আকাশের দিকে তাকাচ্ছে তখন দুটো পুলিশকে দেখতে পেল পিন্‌টো। অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এসে ওরা লিজাকে প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করছে। কিছু না ভেবেই পিন্‌টো পা চালাল।

পুলিশ দুটোর একজন বলছে, 'কাম অন, শো মি দ্য রিজন। হোয়াই ইউ আর হেয়ার। ডু ইউ হ্যাভ এনি লাইসেন্স টু পিকআপ ক্লায়েন্ট অ্যাট দিস প্লেস ?'

'আই টোল্ড ইউ, আই অ্যাম নট ইন দ্যাট মুড।' লিজা প্রতিবাদ করল।

'কাম অন বেবি ! ইউ হ্যাভ টু গো উইদ আস।' পুলিশটা হাসল। সম্ভবত সে ইংরাজি জানে বলেই কথা বলছিল। সঙ্গীটি ফরাসীতে কিছু বলতেই পিন্‌টো এগিয়ে গেল, 'হাই লিজা। হোয়াটস দ্য ট্রাবল ?'

'হু দ্য হেল আর ইউ ?' পুলিসটা চমকে উঠল। পিন্‌টো দেখল লিজা খুব অবাক হয়ে গেছে। সে উত্তর দিল, 'উই আর ফ্রেন্ড।'

'হোয়েন ইটস স্টার্টেড ? রাইট নাউ ?'

'এক্সকিউজ মি জেন্টলম্যান। উই আর অনার্ড গেস্ট অফ ইউ। উই আর ডেলিগেটস।'

'শো মি ইওর আইডেনটিটি।'

পাশপোর্ট বের করে দিল পিন্‌টো। লোকটা টর্চ জ্বেলে উল্টেপাল্টে দেখল, 'ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া ? বাট শী ইজ নট ইন্ডিয়ান।'

'দ্যাটস রাইট। বাট উই হ্যাভ দ্য সেম ব্যাচ।' পিন্‌টো নিজের এবং লিজার বুকের ব্যাচদুটো দেখাল। পুলিশ দুটো নিজেদের মধ্যে ফরাসীতে বাক্যবিনিময় করে বলল, 'ইউ মাস্ট নট স্টে হেয়ার। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি ইউ এগেন।'

ওরা চলে যেতে লিজা বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

পিন্‌টো হাসল, 'ইটস নট প্রফেশনাল। ইজন্ট ইট ?'

এবার সরল হাসি ফুটল লিজার মুখে, 'ইউ আর ইনটেলিজেন্ট। হোয়াই ডিড ইউ ফলো মি ফ্রম দ্য হোটেল ?'

'বিকজ আই ডিড নট ওয়ান্ট ইউ টু সেপন্ট দ্য নাইট অ্যাট পুলিশস্টেশন।'

'দ্যাটস রাইট।' লিজা মাথা নেড়ে হাত ধরল পিন্‌টোর, 'লেটস গো ব্যাক।'

গতকালই অধিবেশন জমে উঠেছিল। পনেরজন মেয়ে এবং অনুষ্ঠানের সভানেত্রী বক্তৃতা করেছিল। এবং সেই বক্তৃতা ইংরেজি এবং ফরাসীতে তাৎক্ষণিক তর্জমা করে দেওয়ায় বিরাট অধিবেশন কক্ষে হাসি বা ধিক্কারের তুফান উঠেছিল। অবশ্য অনেক মেয়েই ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারছিল না। তাদের নিয়ে অন্য ধরনের রস তৈরী হচ্ছিল। সুধারানী গতকাল সমস্তসময় পিন্‌টোর পাশে বসে দেখেছে কাণ্ডটা। মেয়েরা কেউ বুক চাপড়ে, কেউ বা কোমরে হাত রেখে কথা বলে গেছে। আগামীকাল তাকেও বলতে হবে। সে একসময় পিন্‌টোকে বলেছিল, 'আমি কাল ওপরে উঠব না।'

'ওরা তোমার মুখ দেখবে বলে এখানে আনেনি।' পিন্‌টো ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল। আর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল সুধারানী। হঠাৎ যেন পিন্‌টোর ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। কেমন ছাড় ছাড় কথা বলছে। বেশী বললে

ঝাঁঝিয়ে উঠছে। সুধারানীর একদম ভাল লাগছে না।

আজ সকালে উদ্যোক্তারা ওদের প্যারিস ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। সেই যে লম্বা লোহার খাঁচার মত জায়গা, যেখানে লিফটে চেপে উঠতে হয়, সেখানে গিয়ে সুধারানী পাত্তা পায়নি পিন্‌টোর। হাঁটু দেখানো বুক খোলা এতরকমের মেয়ের ভিড়ে ওর মাথা নিশ্চয়ই গুলিয়ে গিয়েছে। আজ দুপুরে ঘুরে আসার পরে একটা কাণ্ড হয়েছে। মারিয়া হঠাৎ ইশারায় ওকে শাড়ি পরিয়ে দিতে বলল। মজা লেগেছিল সুধরানীর। ব্লাউজটা একটু আলগা হল। কিন্তু ওসব পরাবার সময় সুধারানী আবিষ্কার করল মেমসাহেবদের শরীর ঠিক তাদেরই মত। কোন বিশেষ কারিগরি ভগবান ওখানে করেননি। কিন্তু দেখলে মনে হয় কত চটকদার। শাড়ি পরার পর মারিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল। আঁচলটাকে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারছিল না। ইশারায় তাকে সমঝে দিচ্ছিল সুধারানী। শেষ পর্যন্ত কোমরে গুঁজে দিতে মারিয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিজেকে দেখল। দেখা হয়ে যাওয়ার পরে সে নিজের স্যুটকেস থেকে একটি পোশাক বের করে ইশারায় কাছে ডাকল সুধারানীকে। দ্বিধা ছিল কিন্তু সেইসঙ্গে কৌতূহলও। যেভাবে শিশুকে জামাকাপড় পরানো হয় সেইভাবে মারিয়া তাকে নতুন পোশাক পরিয়ে দিল। খুব লজ্জা করছিল সুধারানীর। কিন্তু মারিয়া এসব নিয়ে মাথাই ঘামাল না। সে যতক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ততক্ষণ সুধারানী নড়েনি। এবার আয়নায় নিজেকে দেখে চিনতেই পারছিল না। তাকে ওই চুলটুকু বাদ দিলে ঠিক মেমসাহেবদের মত দেখাচ্ছে। হাঁটুর ওপর টাইট হয়ে নেমেছে স্কার্ট। কোমরের চামড়ায় টাইট হয়ে বসেছে জামাটা যা দেখতে ঠিক জালের মত। বুকের ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত খোলা। কিছু পরে থাকার অনুভূতি হচ্ছে না। কিন্তু লজ্জাটা আস্তে আস্তে সরে গেল। নিজেকে উন্মোচন করার জন্যে একটা বেপরোয়া ভাব ওকে পেয়ে বসল। তার মনে হল এই পোশাকের সঙ্গে লম্বা মোটা বেণী মিলে যে সৌন্দর্য দিচ্ছে তা ওই মেমসাহেবরা পাবে কোথায়! সে আর মারিয়া ওই বিপরীত পোশাকে লাউঞ্জে গিয়ে বসেছিল। মারিয়া স্বীকার করবে কিনা জানা নেই কিন্তু যত মানুষ ওখানে আসাযাওয়া করেছিল তারা হাঁ করে সুধারানীকেই দেখেছিল। সুধারানীর খুব মজা লাগছিল। সে কল্পনায় নিজেকে সোনাগাছিতে দেখল। এই সাজে সে যদি সোনাগাছিতে দেখা দেয় তাহলে মোক্ষদার নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকবে না।

হঠাৎ তার চোখ বড় হয়ে গেল। বাইরের দরজা দিয়ে পিন্‌টো ঢুকছে। কিন্তু তার হাত যে মেয়েটার কনুই জড়িয়ে তাকে প্রথমে চিনতে পারল না সুধারানী। ওরা যখন লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে বলতে তখন মনে পড়ল। সেই সাদা পোশাকের মেয়েটা। গতকাল যখন ওই মেয়েটা বক্তৃতা করেছিল তখন দুতিনজন ছাড়া কেউ হাততালি দেয়নি। এই মেয়েটার সঙ্গে পিন্‌টো ঘুরছে বলেই কি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না? সুধারানী নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল, 'পিন্‌টো।'

লিফট এসে গিয়েছিল। পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল পিন্‌টো। লিজা জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ তোমাকে ডাকছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না। ওঃ মাই গড! সুধা? লিজা

তুমি ওপরে যাও, আমি এখনই আসছি। আফটার অল আই অ্যাম সাপোজড টু এসকর্ট হার টিল শী লিভস প্যারিস!'

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে লিজা লিফটে উঠে গেলে পিন্টো এগিয়ে গেল। একি দেখছে? দুদিনেই কি ভোল পাল্টে গেল মেয়েটার। এত সেক্সি, এত আকর্ষণীয়া, কখনও মনে হয়নি ওকে। কিন্তু পোশাকটা পেল কোথায়? পিন্টোর বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠল। সে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সুধারানী বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

'বিউটিফুল।' কথাটা না বলে পারল না পিন্টো।

'তবু তো ওই সাহেবপেত্নীর সঙ্গে ঘুরছ।' সুধরানী ঠোঁট বেকাল।

'না-না। মানে আমার স্যুটকেসটা পেয়ে গেছি আজ। তাই ওদের ধন্যবাদ জানাতে বেবিয়েছিলাম। এ পোশাক পেলে কোথায়?' জিভ শুকনো মনে হচ্ছিল পিন্টোর।

'মারিয়া দিয়েছে। মারিয়াকে দেখেছ?' হাত ধরে মারিয়াকে তুলল সুধারানী।

পিন্টো বুঝতে পারল। সুধারানীর নতুন চেহারায় দৃষ্টি এমন আটকে ছিল যে সে মারিয়াকে লক্ষ্য করেনি। ও হেসে বলল, 'হেলো!'

মারিয়া শাড়ির আঁচলে হাত রেখে হাসল।

সুধারানী বলল, 'আমি কি বলব বলে দাও।'

পিন্টো মাথা নাড়ল, 'তোমার যা ইচ্ছে। যে মেয়েটা বাংলা থেকে ইংরেজি ফরাসী করবে সে অসুস্থ। ওরা তাই আমাকেই বলেছে ইংরেজি করে দিতে। এদের একজন সেই ইংরেজিকে ফরাসীতে অনুবাদ করে দেবে। তুমি থেমে থেমে যা ইচ্ছে বলে যেও। যা বলতে হবে আমি ইংরেজিতে গুছিয়ে বলব।'

'যা ইচ্ছে মানে, কি?' সুধারানীর মনে হল পিন্টো আবার তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

'এই ধরো, মোক্ষদাকে গালাগাল করবে, গৌরনিতাই ডাক্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে কিছু কথা বলবে। কিছু না পারো তো আমাকে গালাগাল দিও।'

'আমি পাগল নাকি?'

'ওরা তো বাংলা বুঝবে না। তোমার কোন চিন্তা নেই। ঠিক সময়ে তৈরী হয়ে থেকো। আর এই সাজে যেও না। বাঙালির শাড়ি পরা উচিত। বাই মারিয়া।' বলে পিন্টো মারিয়ার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল।

খুব রাগ হচ্ছিল এবং সেইসঙ্গে কান্না পাচ্ছিল সুধারানীর। এইসময় একটি লোক লাউঞ্জে ঢুকে সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। লোকটাকে কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না সে। কিন্তু সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছিল খুব বড়লোক।

ওদের সামনে এসে লোকটা কৃতার্থ মুখে মারিয়ার দিকে তাকাল। যেন ওই সাজে সে মারিয়াকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী ভেবেছে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল। মারিয়া সেই হাত ধরে সুধারানীকে কিছু বলে এগিয়ে গেল লোকটার সঙ্গে দরজার দিকেই। একা, সেই বিরাট লাউঞ্জে একা দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড কান্না পেয়ে গেল সুধারানীর। সে কোনরকমে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ উপচে জল আসার মুহূর্তে হঠাৎ তার মোক্ষদার কথা মনে পড়ল, 'পিন্‌টো সাহেবকে মোটেই বিশ্বাস করো না। অল্প বয়েস, একসঙ্গে যাচ্ছ কিন্তু কখনও মন দিয়ে বসো না। মন ঠুনকো জিনিস নয় যে যাকে তাকে দেওয়া যায়।'

অমনি শরীরে প্রতিরোধ শক্তি জন্মাল। চোখের জল থমকে গেল। সুধারানী উঠে বসল। পাগল ! সে কেন পিন্‌টোকে মন দিতে যাবে। কিন্তু তাহলে এই কান্না এল কেন ? বুকের ভেতর টনটনানি হচ্ছিল কেন ? নাকি পিন্‌টো নয়, ওই পুরুষটি মারিয়াকে নিয়ে গেল বলে নিজেকে ফালতু মনে হচ্ছিল তার ? এবার ওর মনে পড়ল গত পরশু মারিয়াকে ওই লোকটির সঙ্গে সামনের দোকানে ঢুকতে দেখেছে সে। লোকটা কি মারিয়ার পাহারাদার ?

কিন্তু পিন্‌টো তাকে যথেষ্ট সময় দিচ্ছে না। সে টাকা না দিলে ফুটুনি করা বেরিয়ে যেত। কথাটা এখনই পিন্‌টোকে বলা দরকার। টেলিফোনের সামনে গিয়ে রিসিভার তুলে সে জিরো বোতামটা টিপল। ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলতে অনেক ভয়ে আউড়ে রাখা শব্দগুলো উচ্চারণ করল, 'রুম ফাইভ টেন।'

তারপরে মৃদ্ বাজনা শুনতে পেল। এরকম বাজনা এঘরে টেলিফোনেও বাজে। কিন্তু কেউ আর কথা বলছে না। সুধারানী বুঝতে পারল পিন্‌টো ঘরে নেই।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সুধারানী চুল খুলতে বসল।

অডিটোরিয়ামে তিল ধারণের জায়গা নেই। দেশ বিদেশের সাংবাদিকরা তো আছেনই, টিভি ক্যামেরাও চলছে। গত রাতে যেসব মেয়েরা বক্তৃতা করেছে তারা রয়েছে স্টেজের পেছনের সারিতে। সামনের সারিতে আজকের পনেরজন বসে। পাশাপাশি পনেরটি অপ্সরা।

সভানেত্রী ফরাসিতে ঘোষণা করলেন। সেটির ইংরেজিতে তর্জমা করা হল, 'পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা হল পুরুষের মন এবং শরীরের আনন্দবর্ধন। আমরা জানি যাদের বারবণিতা বলে সমাজ এককালে ঘেন্না করত তারাই সমাজকে রক্ষা করেছে। নইলে আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে পুরুষের লালসার শিকার দেখা যেত। সময় পাল্টেছে। মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টেছে। চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, টিউববেবি ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু বারবণিতাদের পাড়ার কতটা পরিবর্তন ঘটেছে ? বারবণিতাদের জীবনযাত্রা, ল্যান্ডলেডির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, মাস্তানদের কাছে তাদের যে পরাধীনতা—এসবের কতটা পরিবর্তন ঘটেছে ? কিন্তু আমরা তার চেয়ে জানতে আগ্রহী যেসব খদ্দের এই প্রক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখেন, রেডলাইট এলাকায় আনন্দ পেতে যেসব পুরুষ আসেন তাদের ব্যবহারে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে ? মনে রাখবেন, ল্যান্ডলেডি, মাস্তান এবং হ্যাঁ পুলিশের হামলার তারতম্য ঘটে খদ্দেরের ব্যবহারের ওপর। যদি খদ্দেররা এঁদের মানুষ বলে মনে করেন, শরীরের বিনিময়ে শুধু অর্থ নয় সেইসঙ্গে একটু বন্ধুত্ব দিতে পারেন তাহলে এঁরা ওইসব বাধাগুলো তুচ্ছ করতে পারবেন। গতকাল আমরা যে পনেরটি মেয়ের কথা শুনেছি তারা আশাপ্রদ কিছু শোনায়নি। আজ আমরা আরও পনেরজনের কাছে জানতে পারব পৃথিবীর এই শ্রেণীর মেয়েরা ঠিক কিভাবে বেঁচে আছে। এইসঙ্গে আমি আবার ঘোষণা করছি এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে উন্নত

এবং অর্ধউন্নত দেশের মেয়েরা। তিরিশজনের মধ্যে দশজনকে বেছে নিয়ে আমরা একটা সমীক্ষকদল তৈরী করে একেবারে অনুন্নত দেশে যাব। এই মেয়েরা ওদেশের সমজীবিকার মেয়েদের নিজের চোখে পরীক্ষা করে আমাদের জানাবে। সেই রিপোর্ট যদি প্রয়োজন হয় আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংরক্ষণ দপ্তরে প্রেরণ করব।

এরপরে একে একে নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী মেয়েদের ডাকা হল। প্রথমে এল ডেনমার্কের একটি মেয়ে। সে নিজের ভাষায় বলছিল। ফরাসী এবং ইংরিজিতে তার তর্জমা চলছিল। মেয়েটি বলল, পুরুষরা যারা আমাদের কাছে আসে তারা সত্যি বিচিত্র। নাটক দেখতে গিয়ে অভিনয় শেষ হলেও অনেকে আসনে বসে থাকে কিন্তু আমাদের কাছে এসে কাজ হয়ে যাওয়ার পরেই ওদের ধান্দা কী করে পালানো যায় তাড়াতাড়ি। কেউ কেউ তো আমার নামও জানতে চান না। আমিও নাম জিজ্ঞাসা করি না। কারণ কে বলতে পারে একই দিনে আমি বাবা আর ছেলেকে আপ্যায়ন করেছি কিনা!

জার্মানীর মেয়েটি বলল, 'পুরুষরা হচ্ছে একটি নচ্ছার জাত। ওরা যখন প্রেম প্রেম ভাব দেখায় তখন জানতে হবে ওদের পকেটে পয়সা কম। একমাসে আমি কুড়িটি পুরুষের সঙ্গে সময় কাটালে তার আঠারোজনই এক ব্যবহার করে। কেউ কেউ তো আমার নাম জানতেই চান না। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয় কুড়িতে দুইজন। আর বন্ধুত্ব মানে তো একতরফা সুযোগ নেওয়া। আমার ল্যান্ডলেডি তো পয়সা ছাড়বেন না।'

ইংলন্ডের মেয়ে লিজা বলল, 'ব্যাপারটা অভিনব, পুরুষের ব্যবহার। ওরা তো একটাই ব্যবহার জানে। আর পাগলা কুকুর যেমন মাছ আর মাংসের স্বাদের পার্থক্য জানে না তেমনই তো ওদের চরিত্র। আজ থেকে দুশো একশ বছর আগের পুরুষের তবু হিম্মত ছিল। তারা আসত প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে, রাত কাটিয়ে সবার সামনে দিয়ে ফিরে যেত। ওরা তখন আমাদের মিসট্রেসের সম্মান দিত। আর আজকের পুরুষ আসে রুমালে মুখ ঢেকে। সোহোতে এককালে আমাদের ব্যবসা ছড়ানো ছিল। গুটিয়ে গুটিয়ে এলাকাটা ছোট হলেও গোপনে গোপনে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত দেশে। রেড লাইট এরিয়া বলে তাই সত্যি কিছু নেই।'

ফরাসী মেয়েটি বলল, 'সত্যি বলতে কি আজকাল খদ্দের এলে বেশ ভয় হয়। না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু নতুন লোক দেখলেই ভাবি এর এইডস নেই তো? আর আমাদের কাছে এলে এইডস হতে পারে এই ভয়ে নতুন খদ্দেরের আসা কমেও গেছে। ফলে কম পয়সায় খদ্দের নিতে হচ্ছে। এই সেদিন সাঁজেলিজে হাঁটছি একজন এসে খুব সাধল। বললাম, আসতে পারো কিন্তু তিনশো ফ্রাঁ লাগবে। সে বলল, পঞ্চাশ হয় না। আজকাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েও কেউ দর করে না। কথা না বাড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। পরের দিন লোকটাকে দেখলাম বউকে নিয়ে হাঁটছে। যেমন কুশ্রী দেখতে তেমন চলন। ভাবলাম গিয়ে বলি পঞ্চাশ ফ্রাঁতে এই জিনিসও পাবে না। কিন্তু বললাম না। ওর বউটার জন্যে কষ্ট হল।'

যখনই কোন বক্তৃতা শেষ হচ্ছিল তখনই প্রচণ্ড হাততালি পড়ছিল।

সভানেত্রী সবশেষে সুধারানীকে দাসীকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করলেন। সেইসঙ্গে ওর বক্তৃতা তর্জমা করে দেবার জন্যে সুধারানীর এসকর্টকে উঠে আসতে অনুরোধ করলেন। পিন্টো আজ খুব সেজেগুজে এসেছে। স্যুটকেস ফিরে পাওয়ায় দামী পোশাক পরতে পেরেছে সে। স্মার্ট ভঙ্গীতে স্টেজের একপাশে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়াল। সভানেত্রী আর একবার সুধারানীকে ডাকলেন।

লাল সিল্কের শাড়ি পরে পনেরজনের সব শেষে বসে ছিল সুধারানী। স্টেজে উঠে বসার পর থেকেই তার হাত পা ঘামছিল। কি বলবে সে ? তার পাশের মেয়েরা কেমন হেসে হেসে অথবা ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলছে। তার দুটো হাঁটু থরথর করে এমন কাঁপতে লাগল যে একটা কথাও মনে আসছিল না।

তৃতীয়বারে নিজের নামটা উচ্চারিত হতে শুনল সুধারানী। তার বুক ধ্বক করে উঠল। অডিটোরিয়ামে যে স্বল্প আলো জ্বলছে তাতেই হাজার মানুষকে দেখতে পেল। টিভির ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্যে যে তীব্র আলো ফেলা হচ্ছে তাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল এবার। সুধারানীর কান্না পাচ্ছিল। ওরা তাকে বক্তৃতা দিতে ডাকছে। কিন্তু কি কথা বলবে সে ! এখান থেকে একছুটে পালিয়ে গেলে কেমন হয় ?

ততক্ষণে দর্শকরা অধীর হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ শব্দ করছে মুখে। সভানেত্রী অদ্ভুত চোখে এদিকে তাকালেন। সুধারানীর পাশে যে মেয়েটি বক্তৃতা শেষ করে বসেছিল সে ওকে ইশারা করল উঠে এগিয়ে যেতে। এইসময় লম্বা পা ফেলে পিন্টো এগিয়ে এল সামনে। 'কি হল ? ওরা তোমাকে ডাকছে !'

সুধারানী কিছু বলতে চেষ্টা করল পিন্টোকে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় জেগে ওঠা ঘামের অস্তিত্ব অনুভব করল। পিন্টো ঝুঁকে বলল, 'সুধা ওঠ। যা ইচ্ছে বলে যাও। আমি গুছিয়ে ইংরেজি করে নেব। এখানে কেউ বাংলা বুঝবে না। শুধু ঠোঁট নাড়ো প্লিজ।'

এবার সুধারানী মাথা নাড়ল। 'আমি পারব না।'

'না। তোমাকে পারতেই হবে। তুমি না বললে লোকে আমাদের গালাগাল দেবে। ইন্ডিয়ার বদনাম করবে। তোমার দেশের মুখ ছোট হবে সুধা। ওঠো। আমার হাত ধর।' পিন্টো সুধারানীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সুধারানী ধীরে ধীরে উঠল। সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। পিন্টো যখন ওকে হাঁটিয়ে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল তখন স্টেজটা টলছে। যেন তার হাঁটু নেই। জিভ শুকিয়ে কাঠ। ওকে দাঁড় করিয়ে যাওয়ার আগে ফিসফিস করে পিন্টো বলল, 'মনে যা আসে তাই বলতে আরম্ভ কর।'

সুধারানী এসে দাঁড়াতেই হাততালি পড়ল প্রচণ্ড। ওর পোশাক, রঙ এবং সঙ্কোচ দর্শকদের ভারি ভাল লাগছিল। নিজের মাইকের সামনে ফিরে গিয়ে পিন্টো ঘোষণা করল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। মিস সুধারানী দাসী অফ ইন্ডিয়া আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি একটু অসুস্থ। খুব অল্প কথায় ভারতবর্ষের খদ্দেরদের সম্পর্কে এবারে বলবেন '

সুধরানী চোখ বন্ধ করল। কিছু মনে পড়ছে না তার। সে মরীয়া হয়ে গৌরনিতাই ডাক্তারের মুখ মনে করার চেষ্টা করল। সে মাথা নাড়ল। এখন

গৌরনিতাই ডাক্তারের মুখটাই মনে পড়ছে না। পিন্টো অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। সুধারানী যদি একবার মুখ খোলে তাহলে বক্তৃতা আরম্ভ করবে সে। কলকাতার খদ্দেরদের প্রশংসা করবে। কি বলবে তাও ঠিক করা হয়ে গেছে। কিন্তু যদি সুধারানী কথা না বলে তাহলে আরম্ভ করবে কি করে!

সে সুধারানীকে নানান ভাবে ইশারা করতে লাগল। কিন্তু সুধারানী চোখ বন্ধ করায় কিছুই দেখতে পেল না। এদিকে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া দর্শকরা আবার উশখুস করতে লেগেছে। হঠাৎই কেউ একজন চিৎকার করে ফরাসীতে কিছু বলে উঠতেই প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুবড়ি উঠল। দর্শকরা পিন্টোকে ইশারা করতে লক্ষ্য করে আরও বেশী মজা পেয়েছে। ততক্ষণে পিন্টো বুঝে নিয়েছে সুধারানী বক্তৃতা করা দূরের কথা কথাও বলতে পারবে না। চকিতে সোনাগাছির সভার স্মৃতিটা তার মনে ভেসে উঠল। সে বলল, 'লেডিজ এ্যান্ড জেন্টলমেন। সুধারানী কথা বলছে না ভেবে আপনারা চিন্তিত হচ্ছেন। কিন্তু এর একটা কারণ আছে। সুধারানী ঠিক আর পাঁচটা সাধারণ বারবণিতার মত খদ্দেরকে আপ্যায়ন করে না। সে প্রথমে গান গায়। তারপর তার ব্যবসার বাকিটা। আজ সুধারানী ভাবছে আপনাদেরও গান গেয়ে এই সমস্যার কথা জানাবে। তাই সে ভাবছে।' অমনি হাততালি পড়ল। এখানে হার্মোনিয়াম নেই। যেন পিন্টো পরামর্শ করতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে সুধারানীর পাশে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কিছু না পারো তো গান গাও।'

সুধারানী চোখ খুলল। পিন্টো আবার বলল, 'দোহাই একটা গান গাও।'

'গান ? গান গাইব ?' সুধারানীর কণ্ঠস্বর মাইকের মাধ্যমে দর্শকরা প্রথম শুনতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। পিন্টো বলল, 'হ্যাঁ। যে কোন গান।'

পিন্টো নিজের জায়গায় পৌঁছে হাত নাড়তে লাগল। সুধারানী ঠোঁট চাটল। কি গান গাইবে সে। চোখ বন্ধ করে একবার ভাবল। তারপর পাশে তাকাল। খালি গলায় কি করে গাইবে সে। শেষপর্যন্ত একটা জেদ একটু একটু করে বড় হল। সে সুর ভাঁজতেই দর্শকরা চুপ। সুধারানী গাইল। সুর কাঁপল প্রথমটায় তারপর গলা ঠিক হল। সুধারানী গাইল,

'যোয়ানকালে নাগর আমার সাধু সেজেছিল
মরার আগে পাকা চুলে কলপ মেখে এল
আমার বুকে ঘাই মেরেছে প্রেমের পাকা মাছ
ফোকলা দাঁতে নাগর বলে কাঁটাগুলো বাছ।'

ক্রমশ ছন্দসুরে গলা খুলল। দুলুনি এল শরীরে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে হাততালি পড়ল তালে। পিন্টো গলা তুলল, 'যৌবনের সুখ নিতে যে আসে তার যৌবন আছে কিনা কে জরিপ করবে ? আমরা হলাম সেই ঘাসের মত যার ওপর সিংহ যেমন হাঁটে তেমনি ইঁদুরও দৌড়ে যায়। আমাদের বুকে প্রেমের তুফান উঠল কি না উঠল তাতে খদ্দেরের বয়েই গেল। তারা আমাদের হাড়মাংস শুষে নিতেই ব্যস্ত থাকে।' মনে যা এল তা বানিয়ে বলছিল পিন্টো। শ্রোতাদর্শকের কানে পৌঁছাতে তারা সুরের তালে আরও উত্তাল হল। সুধারানী যখন থামল তখন সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দিত করতালি লক্ষ পায়রা ওড়াচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে। সভানেত্রী গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সুধারানীকে।

ঘর্মাক্ত সুধারানী কোনমতে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল।

পিন্‌টো বিশ্বাস করতে পারছিল না শেষ পর্যন্ত সুধারানী গাইবে এবং সেই গান শুনে শ্রোতারা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে ? সে যখন অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসল তখন কিছু দর্শক তার দিকে অভিনন্দন ছুঁড়ে দিল। যেন গভীর খাদে ঝুলন্ত শরীরটা আচমকা একটা আরামদায়ক চেয়ারে এসে বসল। পিন্‌টো দেখল সভানেত্রী আবার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমরা এতক্ষণে সুধারানী দাসী অফ ইন্ডিয়ার কথা শুনলাম। আমরা বুঝতে পারলাম ইন্ডিয়ার রেডলাইট এরিয়ায় বৃদ্ধদের যাতায়াত বেশী। সুধারানী দাসী অবশ্য ছয় মিনিটের বেশী সময় নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে পুরুষের আনন্দ বাড়ানোর জন্যে ইন্ডিয়ার মেয়েরা আগে গান শুনিয়ে থাকেন। এবং সেই গান যে সত্যি আনন্দদায়ক তা আপনাদের দেখেই বোঝা গিয়েছে।'

সুধারানী মাথা নিচু করে বসেছিল। তার হৃদস্পন্দন এখনও স্বাভাবিক হয়নি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে শেষপর্যন্ত একটা পুরো গান গাইতে পারল। এবং ওই গানটির জন্যে যে বক্তৃতা করতে হলনা সেই কারণে সে পিন্‌টোর প্রতি কৃতজ্ঞ হল। যদি পিন্‌টো গানের কথা মনে না করিয়ে দিত তাহলে কি অবস্থা হত ?

এদিকে তখন দর্শকদের সামনে সভানেত্রী ঘোষণা করছেন, 'তিরিশজন প্রতিনিধি খুব অল্প কথায় তাঁদের দেশের পুরুষ খদ্দেরদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তবু বিচারকরা দশজনকে নির্বাচিত করেছেন প্রতিনিধিত্ব করতে। এই দশজন আগামী কাল একটি বিশেষ বিমানে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সফরে যাবে। সেইসব দেশের রেড লাইট এরিয়ার প্রকৃত ছবি আমরা জানতে পারব। যেসব প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম বলছি. তাঁরা একে একে সামনে এসে দাঁড়ালে আপনারা অভিনন্দন জানান।'

সভানেত্রী একটি কাগজ দেখে নাম পড়ছিলেন। সুধারানী লক্ষ্য করল তাদের এবং পেছনের লাইন থেকে এক একজন মেয়ে উঠে সামনে গিয়ে লাইন করে দাঁড়াচ্ছে আর দর্শকরা হাততালি দিচ্ছে। তবে ওদের বক্তৃতা করতে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি কারণে ঘটছে তা ওর বোধগম্য হল না। সে দেখল ডোরা নামের মেয়েটা উঠল। কিন্তু লিজাকে ডাকা হল না। এমনকি মারিয়াকেও নয়। হঠাৎ তার কানে নিজের নামটা ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। সভানেত্রী দ্বিতীয়বার হাসতে হাসতে বললেন, 'সুধারানী দাসী অফ ইন্ডিয়া।' সে মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা শব্দ করতে লাগল, জনতা উচ্ছ্বলিত হল। সবাইকে দেখাদেখি সুধারানী মাথা দুলিয়ে সেটা গ্রহণ করল। সভানেত্রী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করামাত্র চিৎকার শুরু করল ফরাসী দর্শক। তারা সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে সুধারানীর গান শুনতে চায়। কাঁধ নাচালেন সভানেত্রী। কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ দেখা গেল মঞ্চে দাঁড়ানো মেয়েরা তালে তালে তালি দিচ্ছে। পিন্‌টো আর দেরি করল না। দ্রুত স্টেজে উঠে চিৎকার করল, 'একটা তালের গান ধরো। সবাই তোমার গান শুনতে চাইছে।' সুধারানীর মনে পড়ল, মোক্ষদা বলেছিল বিনিপয়সায় ওদের দুদুটো গান শোনাবে না। কিন্তু এখন তালে তালে হাততালির আওয়াজে সে সব বিস্মরিত হল।

সমস্ত বোধঅবোধের পাঁচিল খসে পড়ল তার। মাইকের সামনে গিয়ে শরীর দোলাল সুধারানী—

'সোনা সোনা সোনাগাছি
জেনে রেখ আমি আছি
ঠিকঠাক একদম ঠিকঠাক।'

শব্দে-সুরে যে দুলুনি তা ছড়াল সর্বত্র। পিন্‌টো এর কি ইংরেজি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যে মেয়েটি ফরাসিতে তর্জমা করছিল সে পিন্‌টোকে ইঙ্গিত করছিল বারংবার। পিন্‌টো বানাল তালে—'গোল্ড গোল্ড গোল্ডেন, মোর দ্যান হেভেন, শী ইজ গোল্ডেন গার্ল।' সুধারানীর গানের সুরে তার কথাগুলো কানে যেতেই দর্শকরা চিৎকার করে উঠল। সুধারানী তখন গাইছে—

বুক বুক বুক জুড়ে
রাখি আমি তাকে মুড়ে
দুনিয়াটা সোনাগাছি হয়ে যাক।'

কিছুতেই ঘুম আসছিল না সুধারানীর। অনুষ্ঠানের পর যখন খাওয়াদাওয়ার পাট চলছিল তখন সে ঠিক খেয়াল করেনি। সবাই তাকে ঘিরে এত ব্যস্ত যে সে সময় পায়নি পিন্‌টোর খবর নেবার। এখানে এসে কদিন শুধু মিষ্টি খেয়ে থাকছিল সুধারানী। আজ মুরগির মাংস নিয়েছিল। নিয়ে যখন পিন্‌টোর খোঁজ করেছিল তখন দেখা পায়নি। অনুষ্ঠানের পরেই গ্রীনরুমে সেই লোকটি এসেছিল। তার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে সম্ভাষণ করেছিল। এক পলকেই চিনতে পেরেছিল সুধারানী। এবং সে আবিষ্কার করেছিল শিরায় শিরায় শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়েছে। লোকটি যেসব কথা বলছিল তার সবটাই অন্ধকারে শুধু হোটেল শব্দটি কানে লেগেছিল। কিন্তু তারপরেই পিন্‌টোকে না দেখতে পেয়ে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল সুধারানীব। তার কেবলই মনে হচ্ছিল আজ যে সবাই তাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা করছে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পিন্‌টোর। পিন্‌টো একদিন তাকে চুমু খেতে চেয়েছিল। লোকটিকে দেখার পর থেকেই সুধারানী তাই পিন্‌টোকে আরও বেশী করে চাইছিল। কেউ টাকা দেয়, কেউ সোনাব হারও দেয়। পিন্‌টো তাকে সম্মান এনে দিয়েছে। অতএব মোক্ষদা যাই বলুক সে দাম পেয়ে গেছে। অতএব পিন্‌টোকে সে চুম্বনের অধিকার দিতেই পারে।

কিন্তু বাস যখন তাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল তখনও পিন্‌টো নেই। আর লাউঞ্জে ঢুকতেই সে লোকটিকে দেখতে পেল। ওকে দেখে এগিয়ে এল লোকটি। খুব বিনীত গলায় কিছু বলল। সুধারানীর সঙ্গে বাস থেকে নামা একটি মেয়ে সেই কথা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। লোকটি খুব ভদ্রভাবে সুধারানীর হাত ধরে সোফার দিকে যেতে অনুরোধ করল। হঠাৎ সুধারানীর মনে বিরূপ ভাবনা এল। সুরবালা বলেছিল যদি বসতেই হয় তো বৃদ্ধদের সঙ্গে বসতে। এখানে যুবকদের মধ্যে এমন একটা অসুখ আছে যা গৌরনিতাই ডাক্তারও সারাতে পারে না। এই রোগ যাদের হয় তাদের প্রথমদিকে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

লোকটি এমন হতভম্ব হয়ে পড়ল যে এক ইঞ্চি নড়ল না। ঘরে ঢোকা পর্যন্ত যেন ভূতে তাড়া করেছিল সুধারানীকে।

গতরাতে মারিয়া এসেছিল সে ঘুমিয়ে পড়ার পরে। আজ ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। সুধারানী অবাক হয়ে গেল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মারিয়া কাঁদছে। ওর পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। সুধারানী কান্নার কারণ জানে না। ওকে দশজনের মধ্যে নির্বাচিত করা হয়নি বলে কি কাঁদছে? একটু আগে বাসে বসে মারিয়া তো কাঁ .নি। আগামীকাল মেয়েরা যে যার দেশে চলে যেতে পারে। যারা ফ্রান্স বেরিয়ে দেখতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা করা হবে। শুধু ওই দশজনকে নিয়ে প্লেন উড়বে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে। মারিয়া কেন কাঁদছে?

সুধারানী ওর পাশে বিছানায় বসে পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ মারিয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। সুধারানীর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সশব্দে। ব্যাথিত গলায় সুধারানী প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে মারিয়া?'

মারিয়া জবাব দিল না। সুধারানীর মনে পড়ল প্রশ্নটার মানে মারিয়া বুঝবে না এবং উত্তরটাও তাব জানা হবে না। সে চুপচাপ ওর মাথা কোলে নিয়ে বসে রইল।

রাত বাড়লে নিজের বিছানায় শুয়ে মারিয়াকে ঘুমাতে দেখল সুধারানী। তার এত বছর বয়সে কোন যুবতী মেয়েকে এমন অসহায় অবস্থায় কাঁদতে দ্যাখেনি সে। একা বসে বসে ভাবনাটা নিজের দিকে ফিবিয়ে আনল অজান্তে। পিন্‌টোর জন্যে মন কেমন করতে লাগল তার। পিন্‌টো কি কাল তার সঙ্গে যাবে না? তাহলে সে অন্যদের কথা বুঝবে কি করে? কিন্তু এখন অনুমানে অনেকটা সে বুঝে নিতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেছে কিন্তু সে আর কতটা? পিন্‌টো তো তাকে নিয়েই দেশে ফিরবে। সে টেলিফোন তুলল। যতবারই পাঁচতলার ঘরে বাজনা বাজছে ততবারই একটা হেঁড়ে গলা জবাব দিচ্ছে। পাঁচতলা। পাঁচতলার দশনম্বর ঘর।

লিফটে উঠতে সাহস হল না। নির্জন হোটেলের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে বেশ ভয় করছিল সুধারানীর। গুণে গুণে পাঁচতলায় উঠে সে খানিকটা জিরালো। তারপর দশ নম্বর ঘর খুঁজতে লাগল। দরজার গায়ে নম্বর লেখা আছে পেতলের অক্ষরে। দশটা চিনতে তার অসুবিধে হল না। দরজা বন্ধ। সে চাপ দিল, ভেতর থেকেই বন্ধ। সুধারানী দশ নম্বর দরজায় শব্দ করল দুবার।

একটু বাদেই দরজাটা খুলে গেল। মুখ উঁচু করে লোকটাকে দেখেই আঁতকে উঠল সুধারানী। সাম তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বিশাল চেহারায় শুধু একটা সর্টস আটকানো। কালো দীর্ঘ দেহের সঙ্গে সর্টসের সাদা রঙটা চোখে বড্ড লাগছে। হলদে দাঁত বের করে সাম হাসল, 'হা-ই।'

কোনরকমে নিজেকে সামলে সামের ফাঁক দিযে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল সুধারানী। সেটা লক্ষ্য করে সাম একপাশে সরে গিয়ে ভেতরে দিকে হাত প্রসারিত করে আহ্বান জানাল ঢুকতে। ঘরের ভেতর এক দুই পা ঢুকে সুধারানী ডাকল, 'পিন্‌টো!'

সাম এবার দরজা ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর দুই হাত নেড়ে বলল, 'নো পিন্‌টো। নো-নো! আন্দারস্তান্দ!'

সুধারানী মুখ তুলল। না পিন্টো। কথাটার মানে কি পিন্টো নেই। সাম তখনও হাত নাড়ছে যার মানে, নেই। কখন আসবে পিন্টো ? সুধারানী আঙুল তুলে ইশারায় সেই প্রশ্নটা জানতে চাইল।

ব্যাপারটা বোধগম্য হবার পর সাম গলা খুলে হাসল। শব্দে অন্যসময় আঁতকে উঠত সুধারানী কিন্তু এখন মনে হল লোকটাকে দেখে তেমন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হাসি থামিয়ে পিন্টোর বিছানার দিকে তাকিয়ে সাম বলল, 'পিন্টো গন। গন উইদ লিজা। নো লিজা ? হাঁ ! পিন্টো এন্ড লিজা গন টু লন্ডন। লন্ডন। নো লন্ডন ? লন্ডন।'

'লন্-ড-ন।' শব্দটা টেনে টেনে উচ্চারণ করল সুধারানী।

'ইয়া ! লন্ডন !' লাফিয়ে উঠল সাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে পিন্টোর জায়গা দেখিয়ে বলল, 'নো স্যুটকেস। নো ব্যাগ।' ড্রয়ার টেনে ইশারা করল কিছু নেই ওতে। তাবপর বলল, 'পিনটো-লিজা-লন্ডন। আন্দারস্তান্দ ?'

সুধারানীর সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল। সে যদিও সামের সব কথা বুঝতে পারছে না তবু ধরতে পারছে যে পিন্টো নেই। পিন্টো আর লিজা কি লন্ডনে চলে গিয়েছে ? পিন্টো তাকে ফেলে চলে গেছে ?

সাম হঠাৎ রিসিভার তুলে নিয়ে রিসেপশনের কথা বলল। তারপর ওটা রেখে হাত নেড়ে জানাল ওরা চলে গেছে। মুহূর্তেই অন্ধকার দেখল সুধারানী। এই পৃথিবীতে সে একা। চারপাশে কোন চেনা মানুষ নেই। পিন্টো তাকে ছেড়ে চলে গেল ওই সাদা মেয়েটার সঙ্গে ? আর সে কিনা পিন্টোকে টাকা দিয়েছিল এখানে আসার জন্যে ? সুধারানী যেন অন্ধ হয়ে গেল। টলতে টলতে সে সামনের বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার কান্না আসছিল না। কিন্তু সমস্ত শরীর জুড়ে একটা গরম হাওয়া পাক খাচ্ছিল। বিছানায় মুখ গুঁজে সে যেন ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল।

সাম ওকে দেখল। শাড়ি সরে গেছে শরীর থেকে। কোমরের চকচকে নরম চামডায় আলো পড়ায় মাখনের মত মনে হচ্ছে। সাম উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর বিছানার একপাশে বসে পিঠে হাত রেখে বলল, 'ডোন্ট গেট আপসেট বেবি ! কাম অন। বি স্টেডি।'

ওর গলার স্বর সুধারানীর কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না। সে পাথরের মত পড়ে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাম কোমরের খোলা চামড়ায় আঙুল রাখল। তারপর ফিসফিস করে বলল 'বিউটিফুল।'

সাম দুহাতে অবলীলায় সুধারানীকে টেনে নিয়ে এল বুকে। আর তখনই সুধারানী সশব্দে কেঁদে উঠল। কান্নাটা যত বাড়ছে তত বিব্রত হচ্ছে সাম। সে বলার চেষ্টা করল, 'ডোন্ট ক্রাই বেবি। উই মেন আর অল দ্য সেম। সামটাইম ওমেন টু। আই লাভ ডোরা। শী নো লাভ মি। বাট আই অ্যাম নট ক্রাইং। অ্যাম আই ?'

সুধারানী কিছুই শুনছিল না। চওড়া বুকের দেয়ালে সে অসহায় ভাবে মাথা রেখেছিল। তার ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকায় দাঁত চিকচিকিয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে সাম মাথা নামাল। তার পুরু ঠোঁটে সুধারানীর ঠোঁটের স্বাদ নিয়ে বলল, 'ওকে বেবি ! আই অ্যাম হিউম্যান। আই ক্যান রেপ ইউ। সো লিভ দিস রুম।

গেট আপ। কাম ইন সেক্স। হাই বেবি!'

প্যাবিস-লন্ডন শেষ ফ্লাইট যখন হিথরোতে নামে তখন অবশ্যই ভাল রাত। আইনরক্ষকদের সন্তুষ্ট করে পিন্‌টো লিজার সঙ্গে টিউবে চেপে চলে এসেছিল পিকাডেলিতে। অতিরিক্ত রোমাঞ্চিত ছিল সে। যেন পারলেই দিদিমার ঠিকানা খুঁজে হাজির হয় সেই রাত্রে। কিন্তু মধ্যরাতে লন্ডনের কিছু এলাকায় মানুষজন সামান্য ঘুরলেও বাকী শহরটা ঘুমিয়ে থাকে।

টিউবে উঠে লিজা ওকে বলেছিল, 'তুমি এই শহরে নতুন। আজকের রাত আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পার। কাল দিনের বেলায় একটা আস্তানা খুঁজে নিও।'

পিন্‌টো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাকে আলাদা থাকতে হবে?'

'অফ কোর্স। তুমি আমার বিজনেস দেখাশোনা করবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমাকে আমি দেখাশোনা করব। তাছাড়া আমি কখনও নিজের ফ্ল্যাটে ক্লায়েন্ট এন্টারটেইনমেন্ট করি না।' কথাগুলো বলে হেসেছিল লিজা। পিন্‌টোর মনে হয়েছিল বরফের মধ্যে গুঁজে রাখা ইস্পাতে কেউ আলো ফেলল।

কিন্তু তখনও অন্ধকার নামা লন্ডন, পিকাডেলির টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে লিজার ফ্ল্যাটে যাওয়ার পথে বন্ধ দোকানপাট বাড়িঘর তাকে মোহিত করে রেখেছিল। একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলায় উঠে তালা খুলেছিল লিজা। একটাই ঘর, বাড়িতে কেউ নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'কাল সকালে আমরা ব্যবসার কথা বলব। তুমি ওই সোফাটায় শুয়ে পড়তে পার। ওপাশে টয়লেট। আর আমি সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে চাই না, আমাকে ডেকো না। গুড নাইট।' টয়লেটে চলে গিয়েছিল লিজা।

আর অবাক হয়ে বসেছিল পিন্‌টো। মেয়েটা কি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। যে গলায় এবং ভঙ্গীতে কথা বলছে তা প্যারিসে গত দু'দিনে একবারও দেখতে পায়নি। এই যে টয়লেটে ঢোকার আগে বলে গেল গুডনাইট, তার মানে কি ও আর আজ রাত্রে কথা বলতে চায় না? পিন্‌টো কি করবে বুঝতে পারছিল না।

সোনাগাছিতে সে মাস্তানি করত কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হত সে চারপাশের মানুষের চেয়ে অনেক বড়। ওরা তার সাদা চামড়া দেখে সমীহ করত, ইংরেজি শুনে প্রশংসা করত এবং নিষ্ঠুরতা দেখে ভয় পেত। যেহেতু টাকাগুলো সে একাই ভোগ করত না তাই তার দল ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্যারিসে যাওয়ার খবরটা চাউর হবার পর থেকে বিরজুর দল ভারী হচ্ছিল। কিন্তু সে কখনও সোনাগাছিতে মেয়েদের দালালি করেনি। কোন মেয়ের জন্যে কখনও খদ্দের ধরে আনেনি। কিন্তু ইংলন্ডে থাকতে গেলে তাকে তাই করতে হবে। কিভাবে সরকারের কাছে অনুমতি পাওয়া যায় তা লিজা ঠিক করবে বলেছে। সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। স্টেশন থেকে আসার পথে যে জায়গায় কিছু মানুষ এখনও ঘুরছিল সেখানে নিওন আলোর দেওয়ালি তৈরি করেছে। নগ্ন মেয়েদের ছবি আর স্পেশ্যাল বেড শো দেখার আমন্ত্রণ আলোয় লেখা ছিল। লিজা বলেছিল ওই জায়গাটির নাম সোহো। ট্যাক্সি দাঁড়ায়নি। রাস্তাটা একটু ঘুরপথে ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে সোনাগাছির কোন মিল পায়নি। ওটাই তার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র? যদি সরকার তাকে এই দেশে থাকতে দেয়।

কিন্তু কে এখানে ওই কাজ করতে চেয়েছিল ? সে ? কখনই নয়। লিজার সঙ্গে এদেশে এসেছে সে দিদিমার সঙ্গে দেখা করবে বলে। লিজা যদি তার ব্যবহার পাল্টাতে পারে তাহলে সে কেন পাল্টাবে না। লিজা যদি মনে করে সে তার কর্মচারী তাহলে ভুল করবে।

এইসময় টেলিফোন বাজল। পিন্‌টো রিসিভার তুলে হেলো বলতেই ওপাশ থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'হু ইজ দিস বাস্টার্ড ?'

'হুম ডু ইউ ওয়ান্ট ?'

'লিজা, হোয়ার ইজ শী ?'

এইসময় লিজা বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। রিসিভারটা টেনে নিয়ে বলল, 'ওয়েল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। হিজ মাই ফ্রেন্ড। নট বেডপার্টনার। ওকে।'

রিসিভার রেখে লিজা বলল, 'মাই হাজবেন্ড। এই ঘরে কোন পুরুষ নিয়ে আসব না এমন কন্ট্রাক্ট ছিল। আমাকে বোঝাতে হবে তুমি ঠিক পুরুষ নও।'

এতক্ষণে লিজার ব্যবহারের একটা কারণ খুঁজে পেল পিন্‌টো। টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে তার খুব ইচ্ছে করছিল সুধারানীর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আর কিছু করার নেই। নো ওয়ে টু রিটার্ন। মনে মনে বলল পিন্‌টো।

ডোরার সঙ্গে বেরিয়েছিল সুধারানী। সম্মেলনে যোগ দিতে আসা মেয়েদের মধ্যে এখন দশজনই হোটেলে রয়েছে। যাওয়াব আগে মারিয়া একটাও কথা বলেনি। এবং ওর দেওয়া পোশাকটি ফেরত নেয়নি। যদিও নিজের শাড়িটাকে সুধারানী ওয়ার্ডরোবে আবিষ্কার করেছে। সাম চলে গেছে সকালের ফ্লাইটে নিউ-ইয়র্কে। যাওয়ার আগে কোনক্রমে বোঝাতে পেরেছে, ইন্ডিয়া নয়, সুধারানীর উচিত টাইম স্কোয়ারে চলে আসা। সাম যদি ওর ভার পায় তাহলে ডলারে ডলারে মুড়ে দেবে সুধারানীকে। একটি ডলার মানে ইন্ডিয়ার বারো টাকা। এরকম যৌবন যার শরীরে, ওইরকম সুর যার গলায় তার আসল জায়গা আমেরিকা। গত রাত্রে ঘরে ফিরে সুধারানী কাঁদেনি। পিন্‌টোর জন্যে মনে শুধু ক্রোধ জমা হচ্ছিল।

আজ ডোরার সঙ্গে বেরুনোর সময় সে ইচ্ছে করে শাড়ি পরেনি। মারিয়ার পোশাক পরে রাস্তায় বেরুতে যে সঙ্কোচ ছিল তা খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠল। ডোরার সঙ্গে তার কথা হচ্ছে ইঙ্গিতে। এরই মধ্যে সে ডোরার অনেক কিছু নকল করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে শব্দ করে যখন সে হাসছিল তখন রাস্তার লোক তাকাচ্ছে। সুধারানীর আজন্ম ঢেকে রাখা পা হাঁটু এবং উরুতে নবীন পোশাকে চকচকে আলো ছড়াচ্ছে। সুধারানীর মনে হচ্ছিল এতকাল সোনাগাছিতে সে জীবনের সবরকম সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল। সেখানে শুধু কয়েকটি ঘরের মধ্যেই তার সময় কাটতো কখন খদ্দের আসবে এই আশা নিয়ে। আর এখানে চারপাশে শুধু আনন্দ আর স্বপ্নের মত জীবন। সত্যি এখান থেকে আর সোনাগাছিতে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। সামের কথা শুনলে তার বাকি জীবনটাই পাল্টে যাবে। ওরা রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে আইসক্রিম কিনল। পয়সা দিল ডোরাই। সুধারানীর ব্যাগে পাঁচশো ডলারের ট্র্যাভেলার্স চেক আছে। ওগুলো কোন ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে সই করে দিলেই নাকি টাকা

পাওয়া যাবে। ডোরাকে দেখালে নিশ্চয়ই সে বুঝবে। ওরা মর্মাতের সামনে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ডোরা তাকে ইশারা করে উল্টো ফুটপাত দেখাল। সেখানে একজন মধ্যবয়সী লোক শাড়িপরা মেয়ের কোমর জড়িয়ে হাঁটছে। মেয়েটা কি বাংলা জানে ? বিদেশে এসে এই প্রথম একটি শাড়িপরা মেয়েকে দেখল। সুধারানী আচমকা হাত নাড়ল। ভদ্রলোক সেটা দেখে অবাক হয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুধারানী দৌড়ে রাস্তা পার হল, 'আপনারা কি বাঙালী ?'

ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। ভদ্রলোক কাঁধ নাচিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেলেন। ওরা ভাষা বুঝতে পারল না। অথচ শাড়ি পরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই একই দেশের লোক। আর তারপরেই মনে হল সোনাগাছিতে কিছু খাসিয়া মেয়ে এসেছে যারা শাড়ি পরে। অর্থাৎ শাড়ি পরলেই ভাষা এক হয় না। সে খুব মন খারাপ করে রাস্তা পেরিয়ে ডোরার কাছে এল। ডোরা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। সুধারানীর মুখ দেখে ওর হাত ধরে হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়েই একটা জামাকাপড়ের দোকানে ঢুকল ডোরা। দোকানটা এত সাজানো যে খুব ভয় করছিল সুধারানীর। টাইপরা সাহেবরা জিনিসপত্র বিক্রি করছে। ডোরা কিছু কিনল না। শুধু ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখে বেরিয়ে এল। প্রথমে এর জন্যে বেশ লজ্জা হচ্ছিল সুধারানীর। পরে মনে হল এই না কেনাটাই স্টাইল।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন পঁপিদ্যু সেন্টারের কাছে তখনই ডোরা তাকে ইশারা করল। একটা লোক অনেকক্ষণ তাদের পেছনে হাঁটছে। এবার লোকটা প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে। সুধারানী তাকাতেই ডোরা আবার ইঙ্গিতে নিষেধ করল। লোকটা দুঃসাহসী হয়ে সামনে এগিয়ে এসে কিছু বলতেই ডোরা মাথা নাড়ল, 'নো ফ্রেঞ্চ।'

'উই !' লোকটাকে চিন্তিত দেখাল, 'ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড।'

'ইয়েস। উই ক্যান বি ফ্রেন্ড।' ডোরা মাথা নাড়তেই লোকটা বিগলিত হল। ডোরা বলল, 'বাট উই আর হাঙ্গরি। হাঙ্গরি !' বলে ইশারায় জানাল খিদে পেয়েছে। লোকটা সাততাড়াতাড়ি চারপাশে তাকাল। ডোরা হাত দেখিয়ে একটা বড় রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে দিতে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে এগোল ওদের নিয়ে। সুধারানীর খারাপ লাগছিল। ডোরা এই অজানা লোকটার কাছে হ্যাংলার মত খেতে চাইল কেন ? কিন্তু তার এখন কিছু করার নেই। মৃদু বাজনা বাজছে, স্বর্গের মত সাজানো রেস্টুরেন্টে ওরা ঢুকল। পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিট মুগ্ধ হয়ে শিখল সুধারানী ডোরার কাছে কিভাবে খদ্দেরকে বধ করে প্যারিসের সেরা খাবার খেতে হয়। লোকটা এর মধ্যে অন্তত চারবার তার পায়ে জুতোর চাপ দিয়েছে। ডোরা ওকে শুধু হাতে হাত রাখতে দিয়েছে কিন্তু আর একটু খাওয়ামাত্র এমনভাবে থামিয়ে দিয়েছে যাতে লোকটি রাগ না করতে পারে। বিল যে টাকায় মেটানো হল তা দেখে মাথা খারাপ হবার যোগাড়। বাইরে বেরিয়ে আসার আগে লোকটা টয়লেটে গেল। আর অমনি ডোরা চটজলদি তাকে নিয়ে ফুটপাতে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকল। যতক্ষণ ওই রেস্টুরেন্টের সামনেটা দেখা যায় ততক্ষণ চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে পেছন ফিরে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে জড়িয়ে ধরল সুধারানীকে।

এবার হাসি সংক্রামিত হল। ব্যাপারটাকে আর মোটেই হ্যাংলামো বলে মনে হল না। পায়ে চাপ এবং হাত ধরার বিনিময়ে ওই খরচা ঠিকই হয়েছে।

সেদিন দুপুরে দ্যগল এয়ারপোর্ট থেকে যখন ওরা প্লেনে উঠল তখন পিন্টোর জন্যে কোন শোক নেই সুধারানীর। বরং প্যারিসের জন্যে ওর মন কেমন করছিল। জীবনে এই প্রথম একটি সুন্দর শহরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল সে। শুধু রাস্তাঘাট কিংবা মানুষজন নয়, প্যারিসে পিন্টোর ব্যবহার তার মনের অনেক জড়তা দূর করতে সাহায্য করল। নির্বাচিত নয়জন মেয়ে প্লেনে তুফান তুলছিল, সুধাময়ী তাদের সঙ্গে সুর মেলাল। ফ্রান্সের সীমানা ডিঙ্গিয়ে স্পেনে ঢুকে পড়ল প্লেন। তারপর ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে চলে এল আফ্রিকায়। ক্যাপ্টেন দেশগুলোর নাম বলে যাচ্ছে। এই দশজনের কেউ আসেনি আফ্রিকা থেকে। মরোক্কো পেরিয়ে সাহারার ওপর দিয়ে মালির দিকে যাচ্ছিল ওরা। সুধারানী নামগুলো শোনে, কিছুটা বোঝে কিছুটা নয়। কিন্তু সোনাগাছি এবং কলকাতার বাইরে পৃথিবীতে এত দেশ রয়েছে ? এত ? এটা ভাবলেই তার বিস্ময় সীমা ছাড়ায়।

অতলান্তিকের কূলের দেশটির নাম সিয়েরা নিওন। তিয়াত্তর হাজার তিনশো ছাব্বিশ বর্গমাইলের এই দেশের জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। ওদের প্লেন যখন নামল ফ্রি টাউন এয়ারপোর্টে তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শহরের অনেক বাইরে এই এয়ারপোর্ট কিন্তু সমুদ্রের গন্ধ বাতাসে ছড়ানো। ওদের লাইন করে যেতে বলা হল আইনরক্ষকদের সামনে যারা পাশপোর্ট ভিসা খুঁটিয়ে দেখবে এই দেশে ঢোকার পক্ষে উপযুক্ত কিনা। যে দু'জন কর্তা সম্মেলনের পক্ষ থেকে ওদের নিয়ে এসেছেন তাদের কাছে অবশ্য আলাদা কাগজপত্র ছিল এই মেয়েদের সিয়েরা নিওনে প্রবেশ এবং তিনদিন থাকার অনুমতিসহ। কিন্তু যেহেতু পাশপোর্টে ব্যক্তিগতভাবে ভিসা নেয়নি তাই ঝামেলা চুকোতে আরও রাত হল। এবং যে মুহূর্তে অফিসাররা জানল এই দশজনের জীবিকা কি অমনি তাদের ব্যবহার পাল্টে যেতে লাগল। ডোরার সঙ্গে একজনের রীতিমত বচসা শুরু হয়ে গেল। লোকটি ডোরাকে সরাসরি প্রস্তাব দেওয়ায় সে চিৎকার করে বলেছিল, 'তুমি আমাকে কি মনে কর ? হ্যাঁ, আমি বেশ্যা। কিন্তু আমি তখনই বেশ্যাগিরি করি—যখন আমার টাকার দরকার হয় এবং চারপাশে দেওয়াল থাকে। তোমরা পুরুষেরা ঘুম থেকে ওঠার পর এবং ঘুমুতে যাওয়ার আগের সময় পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে একটা বেশ্যার চেয়েও বেশি বেশ্যাগিরি কর। ইউ অলওয়েজ ড্রিম টু স্লিপ উইদ এ গার্ল হুইজ ইজ মোর দ্যান প্রস্টিটিউশন!' অফিসারের বন্ধুরা ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও নিজেরা হিহি করে হেসেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে আসার পথে ওরা নির্জন রাজপথ, যা অতিরিক্ত রকমের ঝকঝকে দেখেছিল। হোটেলে ঢোকার পর ওদের অভিভাবকরা সবাইকে ডেকে উপদেশ দিল যেহেতু এই দেশে স্বৈরাচারী সরকার বিদ্যমান তাই কোন অবস্থাতেই ওরা সরকারী আমলাদের সঙ্গে যেন বিরোধে না যায়। অনেক কষ্টে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ এদেশে আসার অনুমতি পেয়েছে। তেমন সমস্যার সম্মুখীন হলে কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে। অত্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই কেউ যেন হোটেলের বাইরে যায়। কিন্তু সেটা না হলেই ভাল হবে। যখনই যাওয়া হবে তখনই সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে উদ্যোক্তারা মেয়েদের সঙ্গে যাবেন।

প্রায় সারারাত ধরে টেলিফোন বাজল। ডোরা অনেক চেষ্টা করেও লাইনটা কাটতে পারল না। যতবারই সে রিসিভার তুলেছে ততবারই একটি পুরুষকণ্ঠ কামাতুর প্রস্তাব দিচ্ছে। ডোরা রেগেমেগে বলেছিল, 'উই হ্যাভ কাম ইন দি ল্যান্ড অফ উলভ্‌স।'

সুধারানী কথাটার মানে বুঝতে না পারলেও ঘটনাটা ধরতে পারছিল। কিন্তু তার একটুও ভয় করছিল না। লোকটা ডোরাকে না জ্বালিয়ে যদি তাকে জ্বালাতো তাহলে সে কি করত এইটে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন মেয়েদের নিয়ে একটি মিনিবাস বের হল। সময়টা দুপুর। উদ্যোক্তাদের দু'জন এবং ইউনিফর্ম-পরা একটি অফিসার সঙ্গে আছেন। ওরা রাজপথে প্রচুর বন্দুকধারী সৈনিককে দেখতে পেল। তারা কঠোর মুখে চারপাশে লক্ষ করছে। এর মধ্যে তিনবার তাদের গাড়ি থামিয়ে পরিচয়পত্র চাওয়া হয়েছে। সুধারানী দেখল যদিও দোকানপাট খোলা কিন্তু ক্রেতাদের ভিড় তেমন নেই। সমস্ত শহরটা যেন থম মেরে রয়েছে। গাড়িটা বন্দর এলাকায় ঢুকে একটা ঘিঞ্জি পাড়ার সামনে দাঁড়াল।

এই সময়টায় সোনাগাছিতে খদ্দের সচরাচর আসে না। এলেও হাঁড়ি চড়ানো মেয়ে না হলে তাদের কেউ ঘরে বসায় না। দশজন একই পেশার আগন্তুকের অবশ্যই খুব মজা লাগছিল। এ তাদের একদম নতুন ভূমিকা। ফ্রি টাউনের মেয়েরা কে কেমন ব্যবসা করছে তা জানতে বলা হয়েছে তাদের। সঙ্গী দুই অভিভাবকের পাশাপাশি সরকারি মানুষটি না থাকলে অবশ্য আরও ভাল লাগত।

নোংরা রাস্তা ডিঙিয়ে ওরা ব্যারাকটার কাছে চলে আসতেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একসঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক মেয়ে চিৎকার করছে হাত নেড়ে। সেই চিৎকারের অর্থ বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। ওরা চাইছে আগন্তুকরা ফিরে যাক। অফিসার হেসে বললেন, 'দেখুন, আমি আপনাদের বলেছিলাম এইভাবে দেখতে চাওয়া ওদের কাছে অপমানজনক। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করেননি। এখন ওরাই প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এরপরে আপনাদের ওখানে যেতে দিতে পারিনা, আপনারা আহত হলে অনেক জবাবদিহি দিতে হবে।'

অভিভাবক দুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। সুধারানী দাসী দেখছিল অবাক হয়ে। বেশীর ভাগ মেয়েকে দেখলেই মনে হয় ভাল করে খেতে পায় না। পোশাকে খারাপ অবস্থা বেশ স্পষ্ট। ওরা যেভাবে একতলা দোতলায় জড় হয়ে চিৎকার করছে সেটা ওর চোখেও দৃষ্টিকটু ঠেকল। সে জানে এদের অবস্থা যাতে ভাল হয় তাই তাদের এখানে আনা হয়েছে। এই কথাটুকু কি ওরা জানে না? ওরা যদি জানতো তাহলে কি চিৎকার করত! সে কোন শব্দের অর্থ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মুখের ভঙ্গী পৃথিবীর সব মানুষেরই তো এক! সুধারানী নাকে রুমাল চেপে দেখল তার সঙ্গীনীদেরও ওই এক অবস্থা। গা গোলানো গন্ধ ভেসে আসছে। গলির মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে কিছু লোক। এদের বেশীর ভাগই সামের মত দেখতে, বরং আরও মোটা। দেখে মনে হয় এই অসময়েও ওরা নেশা করে আছে। সুধারানী তাকাতেই একজন কালো লোক চোখ ছোট করে তাকে ইশারা করল কাছে যেতে।

সুধারানী ডোরার পাশে সরে দাঁড়াল। অফিসারের সঙ্গে কথা বলার পর অভিভাবক দুজন ওদেব সামনে এসে কিছু ঘোষণা করলেন। শেষ পর্যন্ত দুটো আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন। অফিসার গার্ড অফ অনাব দেবার মত ভঙ্গীতে দশজনকে দেখে প্রথমে ডোরাকে ইংরেজিতে কিছু বললেন। ডোরা দল ছেড়ে একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে হাসল। এবার অফিসার সুধারানীর দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন। সুধারানী তার বিন্দু-বিসর্গ বুঝল না। তৎক্ষণাৎ অভিভাবকদের একজন ছুটে এসে সুধাবানীর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে ডোরার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার সুধারানী বুঝল, দশজন নয়, ওরা মাত্র দুজনকে ভেতরে যেতে দেবে। অভিভাবকরা বাকি মেয়েদের বাস-এর কাছে নিয়ে গেলে অফিসার ওদের দুজনকে ব্যারাকের দিকে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক ব্যাটম তুলে ধরতেই চিৎকার থেমে গেল। চার পাঁচজন নিগ্রো ছুটে এসে অফিসারকে সেলাম করতেই তিনি নির্দেশ দিলেন কিছু। সেইটে নিগ্রোরা হুকুমের ভঙ্গীতে জানিয়ে দিতেই মেয়েরা পিল পিল করে ভেতরে ঢুকে গেল।

অফিসার ওদেব দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর আচমকা দুজনের কোমরে দুটো হাত গলিয়ে অফিসাব ব্যারাকের সিঁড়িতে উপস্থিত হলেন। সুধারানীর এই ব্যাপারটায় খুব অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু যেহেতু ডোরা কিছু বলছে না তাই সে চুপ করে রইল। হঠাৎ অফিসাব তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নো ইংলিশ ? পাকিস্তানি ?' ডোরা জবাব দিল, 'ইন্ডিয়ান।'

'আঁ। ইন্ডিয়ান। এ্যান্ড ইউ আমেরিকান ?'

'ইয়া।' ডোবা অকারণে হাসল।

সুধারানী বুঝল লোকটা ভাল নয়। কারণ ইতিমধ্যেই ওর আঙ্গুল তার কোমরে খেলা করতে করতে খামচে ধরছে। সে ব্যথা সহ্য করল। ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে ওরা একটি ঘরের সামনে চলে এসেছে। অফিসার দাঁড়াতেই ঘরের ভেতরটা দেখা গেল। কোন জানলা নেই। চারটে মেয়ে যেন ভয়ে জবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে বলবে ওরা একটু আগে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। ঘরে দুটি তক্তাপোষ। প্রতিটিতে আবার মাঝখানে কাপড়ের দেওয়াল টাঙানো। মেয়েগুলোর বয়স পনের পার হয়েছে বলে মনে হল না। মুখ ভাঙ্গা, স্কার্টের অবস্থা ভাল নয়। ডোরা ইংরেজিতে প্রশ্ন করল কিছু। মেয়েগুলো উত্তর দিল না। কিন্তু অফিসার হেসে উঠল।

পরের ঘরগুলোর একই অবস্থা। সুধারানী লক্ষ্য করছিল সেই নিগ্রোগুলো যাদের দালাল বলে মনে হয় তারা পেছন পেছন আসছে। দোতলায় উঠতেই একটা চাপা কান্না কানে এল। অফিসাব মুখ ফিরিয়ে নিগ্রোদের কিছু নির্দেশ দিতেই তাদের একজন ঝটপট কান্নাটা যে ঘর থেকে আসছিল সেই দিকে চলে গেল। অফিসার এখনও কোমর ছাড়েননি। সুধারানী দেখল লোকটার দুই কোমরে দুটো বিভলভার ঝুলছে। দোতলার যে ঘরটায় ওরা ঢুকল সেটা একটা বড় হল। সার সার বিছানা পাতা রয়েছে। বিছানাগুলো এমন নোংরা যে মোক্ষদা পর্যন্ত ওটায় বসবে না। মেঝেতে লেপ্টে রয়েছে ওগুলো। আর প্রতিটি বিছানার প্রান্তে একটি করে মেয়ে বসে আছে। মেয়েগুলোর পরনে ছোট সেমিজ গোছের কিছু। এদের মুখে প্রচণ্ড রঙ বোলানো। ওরা একবার মুখ তুলে দেখেই

চোখ নামিয়ে নিল। ডোরা অফিসারকে প্রশ্ন করতেই লোকটা হেসে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল। সুধারানী বুঝল এই হলঘরে পনেরটা মেয়ে পাশাপাশি কোনরকম আব্রু না রেখে খদ্দেরের সঙ্গে শোয়। প্রতিটি বিছানার মাথার ওপর ইংরেজি অক্ষরে কিছু লেখা। সুধারানী পরিচিত অক্ষরগুলো পড়ল, বিশ, পঁচিশ। হঠাৎ ওর শরীর গুলিয়ে উঠল। এইভাবে সবার সামনে মানুষ শুতে পারে? অফিসারের হাত ছাড়িয়ে ডোরা প্রথম মেয়েটিকে প্রশ্ন করল। মেয়েটি মাথা নিচু করে রইল, একটাও কথা বলল না। অফিসারের ডান হাত তখন সুধারানীর কোমর জড়িয়ে। ওরা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন বিগতা যৌবনা মেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল। ডোরা তাকে প্রশ্ন করতেই মেয়েটি গলায় হাত বোলালো ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে। অফিসার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলেন এবং এর মাথায় হাত ঠুকে বোঝাল গোলমাল আছে। পরের দরজাটি বন্ধ। অফিসারের চোখ ছোট হল। সে পেছন দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে নিগ্রোগুলোর দুটো দরজায় শব্দ করে কিছু বলতে লাগল। মিনিট খানেক গেল না, তিনটে লোক ঝটপট বেরিয়ে এল দরজা খুলে। অফিসার হাত তুলে তাদেব থামতে বলতেই ওরা যেন পাথর হয়ে গেল। লোকগুলোর জামার বোতাম খোলা, প্যান্ট কোনমতে কোমর থেকে ঝুলছে। তিনটে লোককে দেখলেই বোঝা যায় এরা পুলিশ কিংবা মিলিটারির লোক। সুধারানীকে ছেড়ে দিয়ে অফিসার তিনজনের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে লাগল। কথা শেষ হলে লোক তিনটে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এই ঘরটিও নিচের মত প্রায় অন্ধকার। একটি বিশাল চেহারার স্ত্রীলোক প্রায় নগ্ন অবস্থায় খাটে বসে হাসছে। এত বড় শরীর কোন স্ত্রীলোকের হতে পারে তা আন্দাজেও ছিল না সুধারানীর। আর আশ্চর্য, ঘরটিতে মাত্র একটি খাট এবং আর কোন স্ত্রীলোক নেই। অফিসার ধমক দিতে স্ত্রীলোকটি সক্রিয় হবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সুধারানী চোখ বন্ধ করল, ডোরা প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করে সরে এল। শেয়ালের মত হেসে উঠে ইশারা করতেই দরজটা বন্ধ হয়ে গেল। এইসময় আচমকা পাশের দরজা খুলে গেল। তীরের মত একটি মেয়ে ছুটে এল বাইরে। তারপর কিছু বোঝার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসারের ওপরে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে। আর মেয়েটা পাগলের মত অফিসারের মুখে বুকে ঘুঁষি মারছে চিৎকারের সঙ্গে। সুধারানী খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল অফিসারের একটা হাত কোমরের কাছে নেমে রিভলভারের খাপ খুলছে। মেয়েটিকে সরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে লোকটা ধীরে ধীরে রিভলভার বের করল। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় নল মেয়েটির কোমরে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। শব্দ বাজল। মেয়েটি হঠাৎই কুঁকড়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক পাশে। অফিসার ইঙ্গিত করতেই নিগ্রোগুলো দৌড়ে একটা স্ট্রেচার নিয়ে এসে মেয়েটিকে তুলল। যে ঘরটি থেকে ও বেরিয়ে এসেছিল সেখান থেকে একটা কাপড় এনে মেয়েটিকে ঢেকে স্ট্রেচারে তুলে ছুটল নিচের দিকে। রিভলভারের নল থেকে ধোঁয়া বের করে অফিসার সুধারানীর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর আবার হাঁটতে লাগল কোমরে হাত রেখে। সুধারানীর গলা শুকিয়ে আসছিল। তার শরীর যেন আচমকা শক্তিশূন্য

হয়ে পড়েছিল। এই প্রথম সে চোখের সামনে একটি মানুষকে মরতে এবং মেরে ফেলতে দেখল। ডোরা চুপচাপ হাঁটছে ওপাশের কোথাও সেই কান্নাটাও আর নেই। চারপাশ থমথমে।

বাসে উঠে কোন কথা বলতে পারল না সে। ডোরা তার পাশে বসেছিল। অবশ্য কথা বললে কি বা বোঝাতে পারত। অফিসার অভিভাবকদের হাত পা নেড়ে অনেক কিছু বোঝাচ্ছে। চলন্ত বাস থেকে সমুদ্র দেখতে পেল সুধারানী। হঠাৎ তার নজরে পড়ল স্ট্রেচার নিয়ে লোকগুলো সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে। বাসটা বাঁক ঘুরতেই আর কিছু দেখা গেল না।

এখন বিকেল। অভিভাবকদ্বয় একটু আগে ডোরার কাছ থেকে সব জেনে গেছেন। ঝিম মেরে বসেছিল ডোরা। সুধারানীর কাছে একটি হিন্দী ভাষাভাষী মানুষকে ধরে আনা হয়েছিল। যতটা সম্ভব চেষ্টা করে সে ওদের জানিয়েছে তার মনের কথা। সোনাগাছির সবচেয়ে গরীব মেয়েও এদের তুলনায় অনেক বেশী সম্ভ্রম নিয়ে থাকে। সেখানে কেউ তাদের অমন গুলি করে মেরে ফেলতে পারে না সবার সামনে। সেখানে দশজনের চোখের সামনে মেয়েদের শুতে হয় না। লোকটি অভিভাবকদের কি বলেছে সুধারানী জানে না এখন দুজনে যখন একা তখন মনে হচ্ছিল তার কাছে যদি কোন অস্ত্র থাকত তাহলে অফিসারটিকে খুন করতে দ্বিধা করত না।

হঠাৎ ডোরা উঠল। উঠে নিজের স্কার্টের পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করে সুধারানীকে দেখাল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল না সুধারানী। ডোরা হাসল। তারপর অভিনয় করে দেখাল সে মানিব্যাগটা পকেট মেরে পেয়েছে ডোরা দরজা বন্ধ করে সুধারানীর খাটে বসল। অনেকগুলো নোট রয়েছে, কিছু খুচরো পয়সাও।

ডোরা কার পকেট মেরেছে বুঝতে অসুবিধে হল না। সে আঁতকে উঠলে, হাত চলে গেল মুখে। ডোরা ততক্ষণে ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করেছে। য়ুনিফর্ম পরা অফিসার। ছবিটার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে ছুঁড়ে দিল ডোরা। তারপর টাকা পয়সাগুলো সমান দুটো ভাগ করে একটি ভাগ সুধারানীর দিকে এগিয়ে দিল। মাথা নাড়ল সুধারানী, এই টাকা সে নিতে পারে না। ডোরা হাসল। তারপর ইংরেজিতে অনর্গল কিছু বলে গেল। বলা শেষ হলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের কোমর ইঙ্গিতে দেখিয়ে অফিসারের হাত যে ভূমিকা নিয়েছিল সেটি অভিনয় করে দেখাল। সে বুঝিয়ে দিল যেহেতু শরীর বিক্রী করা তার জীবিকা এবং ওই অফিসার বিনিপয়সায় সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল তাই এই মানিব্যাগটি সরিয়ে সে বিন্দুমাত্র অন্যায় করেনি। আর অফিসার যখন সুধারানীর কোমর নিয়ে খেলা করেছিল তখন ওর অর্দ্ধেকটা তারও প্রাপ্য। এক্ষেত্রে না বলা বোকামি।

নিজের অংশটা সরিয়ে নিয়ে গেল ডোরা। মানিব্যাগটা পড়ে রইল সুধারানীর খাটে। সুধারানী ছবিটা তুলে নিল। ঘেন্না ক্রোধ আচমকা ছিটকে এল। এইসময় ডোরাকে সিগারেট জ্বালাতে দেখে সে লাইটার চেয়ে নিয়ে ছবির কোণে আগুন ধরাল। দ্রুত গুটিয়ে গিয়ে কালো ছাই হয়ে ছবিটা মেঝেতে পড়ে যেতে সুধারানী

টাকাগুলো তুলল। এগুলো কি ধরনের টাকা তা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু সে নিশ্চিত সোনাগাছিতে এই টাকা চলবে না। আগামীকাল এরা এখান থেকে চলে যাবে পরের জায়গাটার উদ্দেশ্যে। তখন টাকাগুলো নিয়ে কোন লাভ হবে? হঠাৎ সুধারানীর মনে হল ফিরে গিয়ে তাকে যে করেই হোক ইংরেজি শিখতে হবে। নইলে মনের কথা বলার কোন উপায় থাকে না। ডোরা যে ইংরেজি বলছে এখানকার অফিসারও সেই ইংরেজি বলছে। অথচ ডোরার দেশ এখান থেকে অনেক দূরে। এইসময় টেলিফোন বাজল। ডোরা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল। হেসে দুই একটা কথা বলল। তারপর যন্ত্রটাকে নামিয়ে রেখে হাসল, 'উই হ্যাভ টু এ্যাটেন্ড এ বিগ পার্টি হেয়ার অল দি স্টার হোরস অফ দিস সিটি আর কামিং।' মানে বুঝতে পারল না সুধারানী। তার কান্না পাচ্ছিল। সে ইশারায় ডোরাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি?

মিনিট দশেক পরে সুধারানী বুঝল তাদের আজ সন্ধ্যের সময় খুব সেজেগুজে যেতে হবে এক জায়গায়। এবং সে-কারণে ডোরা বেশ আনন্দিত। অথচ মোটেই খুশী হচ্ছে না সুধারানী। তার চোখের সামনে কেবলই অফিসারের রিভলভার যা মেয়েটির কোমরে ঠেকে আছে। হয়তো মেয়েটি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল। ওরা ওকে যা হোক শাস্তি দিকে পারত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে কিন্তু তা না করে দুম করে মেরে ফেলল। আর মরে যাওয়ার পর অন্য কোন মেয়ে একটাও প্রতিবাদ করল না। সোনাগাছিতে কোন মেয়ের ওপর অন্যায় অবিচার হলে পিল পিল করে অন্য মেয়েরা চেঁচিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য তারা খুব নীচু শ্রেণীর এবং এই মেয়েগুলোও তো পরস্পরের বন্ধু। দালালগুলো কি ঝটপট মৃতদেহ সরিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে গেল। যেন এই ব্যাপারটা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল সুধারানী। তার কেবলই মনে হচ্ছিল অফিসার যখন রিভলভারের খাপ খুলছিল তখনই যদি সে ছুটে গিয়ে বাধা দিত তাহলে হয়তো ওই মেয়েটি মারা যেত না।

বিকেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ডোরা যখন সাজগোজ করছে তখনও সুধারানী শুয়ে। সে কাছে গিয়ে ওকে ডাকতেই সুধারানী চোখ মেলল। দৃষ্টি দেখে ঝুঁকে কপালে হাত ছোঁয়াল ডোরা। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। সুধারানীর চোখ লাল এবং গায়ের উত্তাপ বেশ বেড়েছে। এই অবস্থায় ওর পক্ষে পার্টিতে যাওয়া উচিত নয়। সে সুধারানীকে আবার ঘুমাতে ইঙ্গিত করে টেলিফোনে অভিভাবকদের ঘটনাটা জানাল। অভিভাবক ইতস্তত করছিলেন, 'কিন্তু এখানকার কর্তারা চাইছেন তোমরা দশজনই পার্টিতে উপস্থিত থাকো।' 'ওরা অনেক কিছু চাইতে পারেন, কিন্তু দেব আমরা। নিজেদের সাধ্যমত। সুধারানীর জ্বর হয়েছে এবং সেটা মনে হয় মানসিক আঘাত থেকে। ওর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি নিজে এসে দেখে যেতে পারেন।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ডোরা আবার সাজগোজে মন দিল। মিনিট পনের পরে স্থানীয় এক ডাক্তার নিয়ে অভিভাবক এলেন। ডাক্তার সুধারানীকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। সুধারানীর কেবলই ঘুম পাচ্ছিল।

ডোরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। হোটেলের ঘরে সুধারানী একা। ডোরা চলে যাওয়ার পর থেকেই বিছানায় উঠে বসেছিল সুধারানী। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অনেক হয়েছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনাগাছিতে ফিরে যাওয়ার জন্যে সে ছটফট করছিল। সোনাগাছিতে গিয়ে যদি সে একটা মাইক পায় আর সেইরকম মানুষের জমায়েত তাহলে আজকের ঘটনাটা সবাইকে জানাবে। কি ভাবে ওরা মানুষকে কুকুর বেড়ালের মত মেরে ফেলে! সোনাগাছির প্রতিটি মেয়েকে বলবে ফ্রি-টাউনের মেয়েরা নরকের চেয়ে খারাপ জায়গায় আছে। মোক্ষদা বলত, নরকেও নাকি বিচার হয়। এখানে সেটা কেউ ভাবেই না।

ওষুধ শরীরে কাজ করতে শুরু করেছে। কারণ অবসাদটা সামান্য কমেছে। এইসময় দরজায় শব্দ হল। কে এল ? ডোরার কাছে তো চাবি রয়েছে। তাছাড়া সে এত তাড়াতাড়ি ফিরবে না। এখানে প্রায় লোকে দরজা ভুল করে। তেমন নয় তো। প্রথমে উপেক্ষা করল সুধারানী, কিন্তু দরজায় শব্দ হয়েই যাচ্ছে।

শেষপর্যন্ত সুধারানী উঠল। বিছানা ছাড়তেই মাথাটা সামান্য টলল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজার ফুটোয় চোখ রেখে দেখল একটা নিগ্রো দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে সে কি আজ ব্যারাকে দেখেছে ? এই লোকটি কি তাকে ইশারা করেছিল। তার কাছে লোকটার কি দরকার থাকতে পারে ? সুধারানী ঠিক করল সে দরজা খুলবে না। আরও কয়েকবার শব্দ করে সম্ভবত লোকটা চলে গেল। সুধারানী আবার বিছানায় এসে বসতেই টেলিফোন বাজল। ধরবে না ধরবে না করেও রিসিভার তুলল সে। ওপাশ থেকে হেঁড়ে গলায় শব্দ ফুটল, হেলো-হেলো-হেলো।

সুধারানী কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিনিট পাঁচেক বাদে আবার দরজায় শব্দ। এবার আর চোরের মত নয়। সেইসঙ্গে গলা ভেসে আসছে, 'ম্যাডাম, ওপেন দ্য ডোর। ইউ নিড এ ডক্টর।' ডক্টর ? ডাক্তার শব্দটি বুঝতে পারল সে। তবে কি ডাক্তার এসেছে আবার ? কিন্তু সে তো ওষুধ খেয়েছে। সুধারানী আবার এগিয়ে গিয়ে দরজার ফুটোয় চোখ রাখল। এবং তখন সেই বৃদ্ধ ডাক্তারটিকে দেখতে পেল। আর দ্বিধা না করে সুধারানী দরজা খুলে দিতেই চমকে উঠল। ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই অফিসারটি। ওকে দেখে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে হেসে ডাক্তারকে ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে। সুধারানী সরে দাঁড়িয়েছিল। ওই অবস্থায় ডাক্তার স্টেথো বের করে তার বুক পিঠ পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে কিছু বলতেই অফিসারের মুখে হাসি ফুটল আবার। সে তখন সুধারানীর খাটের পাশে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। আর ভয়ের কিছু নেই এমন একটা কথা নিরীহ ভঙ্গীতে জানিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে দরজাটা টেনে দিতে ওটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

সুধারানী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ছোট করে চুক চুক শব্দ করল। তারপর নিজের সার্টটা খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। ওর বিশাল শরীর বিছানায় শব্দ তুলল। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরতেই সুধারানী স্থির করল সে কিছুতেই লোকটার সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।

দরজাটা খুলে যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ তার আছে। শরীরের অবসাদ ঝটপট সরে যেতে লাগল। শুধু দুটো কান গরম হয়ে উঠছিল সুধারানীর।

অফিসার তখন আমেজ করছে। হঠাৎ লোকটার শরীর স্থির হল। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল লোকটা। এবার একটা হাত বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগটাকে টেনে বের করে নিয়ে এল। বিস্ময়ে লোকটা উঠে বসেছে ততক্ষণে। ঝটপট ভেতরটা দেখে নিয়ে চিৎকার করে উঠল সুধারানীর দিকে ফিরে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধারাণীর দুটো পা যেন কার্পেটে জমে গেল। শরীরের সমস্ত শক্তি মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল তার। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। মানিব্যাগটাকে মুঠোয় নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই ওর মুখ ঘরের কোণে প্রায় ছাই হয়ে আসা ছবিটার দিকে ঘুরল। চকিতে কাছে পৌঁছে বাঁ হাতে ছবিটা তুলে নিয়ে নিজের দগ্ধ মুখ আবিষ্কার করে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল সে। সুধারানী বুঝল এইসময় তার পালানো উচিত। কিন্তু নিজের শরীরটাকে নাড়াতেও পারল না সে। ততক্ষণে অফিসার ওর হাত ধরেছে। এক ঝটকায় ওকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল লোকটা। তারপর উন্মাদের মত শাড়ি সায়া ছিঁড়তে লাগল দুই হাতে। বাধা দিতে পারছিল না সুধারানী। প্রায় নগ্ন হবার পর সে উঠে বসার চেষ্টা করতেই লোকটা হো হো করে হাসল। এবার নিজের পোশাক খোলার দিকে মন দিল লোকটা। সুধারানী দেখল ডোরার বিছানার ওপর লোকটার গেঞ্জি পড়ল। বেল্ট এবং রিভলভারদুটো রাখল। এবার প্যান্টে হাত দিয়েছে লোকটা। এবং সম্ভবত অভ্যাসবশতই সে পেছন ফিরে প্যান্টের বোতাম খুলছিল। সুধারানীর মাথায় বিদ্যুৎ চলকে উঠল। রিভলভারটা চোখের সামনে। সে ঝট করে একটানে খাপ খুলে বের করে নিল। শব্দ শুনে লোকটা পিছু ফিরে তাকিয়েছে। ওর প্যান্ট তখন হাঁটুর নিচে। কিন্তু সুধারানীর হাতে রিভলভার দেখার পর লোকটা যেভাবে মুখ হাঁ করেছিল তা আর বন্ধ করতে পারছে না। সকালে সুধারানী দেখেছিল গুলি ছোঁড়ার আগে লোকটা রিভলভারের ওপরের চাকতিটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। এবার সেইটে অনুকরণ করা মাত্র অফিসার লাফিয়ে খানিকটা সরে গিয়ে গোঁ গোঁ স্বর বের করল গলা থেকে। সুধারানীর মুখ পাথরের মত। তার চোখ বেরিয়ে আসছে। হাত কাঁপছে। সামনে প্যান্টে পা জড়ানো অফিসার দুহাত তুলে কাকুতি মিনতি করছে। একটুও দ্বিধা এল না সুধারানীর। সে দ্রুত আঙুল টানতেই একটা গুলি ছিটকে গেল সারসিতে। শব্দ করে কাচ ভেঙ্গে পড়ল বাইরে। অফিসার সেদিকে তাকিয়ে হতবাক। এক লাফে প্যান্ট-মুক্ত হয়ে সে দরজার দিকে যেতেই দ্বিতীয় গুলি বেরুল। এবার সেটা লাগল দেওয়ালে। ওর হাত থর থর করে কাঁপছিল। সুধারানী বিছানা থেকে উঠে তৃতীয় গুলিটা করতেই অফিসার দরজা খুলে বাইরের করিডোরে লাফিয়ে পড়েছে। গুলিটা দরজায় লেগে ফুটো হল। বন্ধ ঘরে একা সুধারানী কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার শরীরের সব শক্তি যেন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। সে কোন কিছুই ভাবতে পারছিল না। রক্তহীন অসাড় শরীরটা হঠাৎ টলে পড়ল কার্পেটের ওপর। রিভলভারটা ছিটকে গেল খাটের নিচে। সুধারানী জ্ঞান হারাল।

ইংরেজি মোটামুটি শিখেছে সুধারানী। সেইসঙ্গে কিছু সেনেগালি শব্দ। ফ্রি টাউনের জেলখানায় ইংরেজিটা মোটামুটি বেশীর ভাগ মানুষই বলে থাকে। সেনেগাল, গিয়েনা, নাইজেরিয়া, আইভরি কোস্ট থেকে যেসব লোক পেটের দায়ে সিয়েরা লিয়নে এসে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল তারা কথা চালানোর জন্যে দুটো ভাষা শিখে রাখে। সুধারানীর মনে হল ইংরেজি ভাষাটা অনেক সহজ। ওকে যে ঘরে রাত্রে আটকে রাখা হয়েছে গত তিনবছর সেখানে সেনেগালি মেয়ের সংখ্যা বেশী। সকালে প্রহরী এসে লাইন করিয়ে নিয়ে যায় জেলখানার কাজে। দিনের কাজ শুরু হবার আগে একবার পাঁউরুটি আর তিনটে আলুসেদ্ধ হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঢোকানোর সময় আবার একই খাবার বরাদ্দ। তিনবছরে স্নান করেনি সুধারানী। কারণ প্রহরীদের অনুমতি না পেলে স্নানের কল ব্যবহার করা যায় না। প্রাকৃতিক কাজ মেটানোর জন্যে একটা বড় ড্রাম আছে ঘরের পেছনে। সপ্তাহে দুদিন ওটাকে পাল্টানো হয়। প্রথম প্রথম কটু গন্ধে শরীর গুলিয়ে উঠত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

না, কোন বিচার হয়নি সুধারানীর। তার জ্ঞান ফিরেছিল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। দুটো দানব তার নগ্ন শরীরটাকে ভোগ করেছিল যতক্ষণ সে রক্তাক্ত হয়নি। তার গাল, বুক এবং উরুসন্ধির মাংস ক্ষতবিক্ষত করার পর ওরা তাকে ঢেকে ঢুকে এখানে এনে ফেলেছিল। যে মেয়ে প্রায় প্রতিরাতেই সোনাগাছির খদ্দেরের মন এবং শরীর রঞ্জিত করেছে অবহেলায় তার কাছে মনে হয়েছিল ঈশ্বরের হাতে নারীরূপ পাওয়ার মত অভিশাপ আর কিছুতেই নেই। সেই অফিসারকে সে কখনও দ্যাখেনি। যখন ক্ষত শুকিয়ে গেল তখন মনে হত অতগুলো গুলি ছুঁড়েও যখন লোকটাকে স্পর্শ করতে পারল না তখন কেন রিভলভারের নলটা নিজের বুকে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানেনি!

কিন্তু এসব ভাবনা জেলখানা আসার প্রথম কয়েক সপ্তাহের। যখন প্রতিটি দিন তার কাছে নানান রঙিন প্রস্তাব আসছে। চোখের সামনে দেখছে স্বাস্থ্যবতী বন্দিনীরা জেলের মধ্যেই রানীর মত বাস করছে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবু তাকে জেলখানায় দুদিন বাধ্য করা হল শরীর দিতে। তারপর বিদ্রোহী বন্দী হিসেবে চিহ্নিত করে ছুঁড়ে ফেলা হল তাদের মধ্যে যারা নিজেদের অতীত ভুলে গেছে, যাদের কোন ভবিষ্যত নেই। এদের কিছু অংশ একটুকরো অতিরিক্ত রুটির জন্যে প্রহরীর লালসা মেটায় সবার সামনে, এক প্যাকেট দেশী সিগারেট অথবা কড়া মদের শিশি পেতে কুকুরের মত ব্যবহার করে। আবার এদের মধ্যে যারা সমকামী তাদের লীলাখেলায় নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। এখানে প্রায় প্রতিটি বন্দীর নিয়মিত সন্তান আসে শরীরে কিন্তু কেউ পৃথিবীর আলো দ্যাখে না। যেহেতু জেলখানার নিয়মে সংখ্যা বাড়াবার কোন সুযোগ নেই তাই অভিজ্ঞ হাতে হত্যাকাণ্ড হয় নিয়মিত।

এদের কেউ কেউ স্বৈরিণী ছিল এক সময়। বেশীরভাগই এসেছে অন্য জীবিকা থেকে। কিন্তু এখানে আসার পর কেউ আর নিজস্ব চরিত্র ধরে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। সোনাগাছির দোতলার জানলা থেকে বারোয়ারি কালিপুজোর মণ্ডপে দাঁড়িয়ে থাকা ডাকিনী যোগিনীদের চেহারা দেখত সুধারানী একসময়। এখানে জীবন্ত দেখল।

ভাষা শেখার বড় সুবিধে। সুধারানী এখন সহজেই চার অক্ষরের ইংরেজি শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে। এখানকার মেয়েরা যখন প্রতি তিনটি শব্দের পর একটি অশ্লীল শব্দ স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করে তখন সে-ই বা পারবে না কেন ? তিনবছরে তার অনেক পরিবর্তন, স্বভাবে অনেক ব্যক্তিত্ব এসেছে। সে এখন হুকুম করতে পারে। জেলখানায় একটিও শ্বেতাঙ্গিনী নেই, নেই তার মত শ্যামলাঙ্গীও। খর্ব থেকে লম্বা কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের ওপর সে এখন কতৃত্ব করছে। এই ঘরের সেনেগালি মেয়েরা অসুস্থতার সময় তার সাহায্য পায়। সে ঠিক করে দেয় কোন কোন মেয়েরা স্বামীস্ত্রীর মত থাকতে পারে।

এই জেলখানায প্রায়ই মৃত্যুর ছায়া নামে। প্রায় প্রতিটি মেয়েই কোন না কোন রোগে ভুগছে। যৌনরোগ তো আকছারই। প্রহরীদের মাধ্যমে সেটা এক শরীর থেকে আব এক শরীরে সংক্রামিত হয়। অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার না হয়ে কোন উপায় নেই। সুধারানী এই নরকে বাস করে ভুলে যায় সোনাগাছির কথা! এমন কি ডোরা মারিয়া অথবা পিনটো তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় না। আজ একটু আগে পনের বছরের সেনেগালি মেয়েটির শরীরে বেড়ে ওঠা ভ্রূণ উৎপাটিন করাব সময় মারা গেল সে। মেয়েটি বোকার মত দীর্ঘ-সাড়ে চারমাস ওটির অস্তিত্ব কাউকে জানায়নি। প্রতিমাসে একগাদা কালো শরীর থেকে লালরক্ত না বেরুলে রক্ষে নেই। কিন্তু শুধু গর্ভধারণই নয় রোগে ভুগেও প্রকৃতি ও ব্যাপারে বিরূপ হয়ে থাকতে পারে। এই মেয়েটিকে কেউ লক্ষ্য করেনি এবং সে নিজেও জানান দেয়নি। ওর শরীরটা যখন স্ট্রেচারে মুড়ে নিয়ে যাওয়া হল তখন সুধারানীর চোখ জ্বলছিল। মেয়েটিকে সে আজই জিজ্ঞাসা করেছিল তার বাচ্চার বাবা কে ? যে তিনজন প্রহবী তাকে অতিরিক্ত রুটি দিয়েছিল তাদের দুজন এসেছিল স্ট্রেচার বইতে। ওকে নিয়ে যাওয়ার পর পাথরের মত বসেছিল সুধারানী। ভগবান কেন পৃথিবীর খারাপ পুরুষগুলোকে নির্বীর্য করেননি ! পায়ে লেগে থাকা ধুলো অথবা থুতুর চেয়ে ওই বস্তুটি পুরুষের কাছে মূল্যহীন।

সুধারানীর মাথায় জট পড়েছে। সেখানে উকুনের আধিক্য দেখা গেছে। সেনেগালি মেয়েরা সেই উকুন বাছতে ভালবাসে। তার চুল লালচে হয়ে এসেছে। শরীরের বাঁকগুলো সোজা এবং শীর্ণ হতে হতে এখন মিলিয়ে এসেছে। স্তন কিংবা নিতম্ব দেখলে বয়স গোনা মুশকিল হয়ে যায়। কিন্তু ইদানীং সে আরামে আছে। যেসব প্রহরী শরীরের কারণে বিরক্ত করত তাদের কর্তৃপক্ষ সরিয়ে দিয়েছে। এখন যারা এসেছে তাদের মেজাজ সবসময় রুক্ষ। হুকুম করা ছাড়া অন্য কোনদিকে তাদের লক্ষ্য নেই।

এইসময় জেলখানায় আলোড়ন সৃষ্টি হল। যে মেয়েটিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে সে শ্বেতাঙ্গিনী। তার শরীরে যৌবন অটুট। সৈন্যদের অত্যাচারে রক্তাক্ত হলেও তার ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। মেয়েটি, যার নাম মার্গারেট এসেই জানালো দিন পাল্টে যাবে শিগগির। অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে সিয়েরা লিওনের ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। যেকোন মুহূর্তে বিপ্লবের দামামা বেজে উঠবে। চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার নিপীড়িত মানুষ যদি হাতে হাত মেলায় তাহলে কয়েক হাজার বন্দুকের সাধ্য নেই তাদের পরাস্ত

করবে। মেয়েটিকে সেই কারণেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মার্গারেট আরও বলল, বিপ্লবের পর প্রতিটি নারী যাতে সম্মানের সঙ্গে বাস করে সেটাই হবে কাম্য। তাই বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এসব কথা মেয়েদের কাছে অবিশ্বাস্য। তারা অবাক হয়ে শুনছিল। কেউ কেউ ব্যাপারটা পাগলের কাণ্ড বলে ভাবছিল। আবার ঘটনা সত্যি হলে মুক্ত আকাশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল কেউ কেউ। মার্গারেট প্রথমেই সুধারানীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'তোমাকে তো আফ্রিকান বলে মনে হচ্ছে না। তুমি কে ?'

সুধারানী মাথা নেড়েছিল, 'আমি জানি না আমি কে ?'

'তোমার দেশের নাম বল।'

'একসময় আমি থাকতাম সোনাগাছিতে। সেখানে বেশ্যারা থাকে। কিন্তু তাদের এত কষ্ট সহ্য করতে হয় না। জায়গাটা কলকাতা শহরে।'

'ওঃ।' মার্গারেট চমকে উঠল, 'তুমি ইন্ডিয়ান ! তোমাকে একজন অফিসার রেপ করতে চেয়েছিল বলে তুমি তাকে মারতে গুলি ছুঁড়েছিলে ?' হাত জড়িয়ে ধরল সে।

সুধারানী অবাক। তার কথা এই মেমসাহেব জানল কি করে ? তবে কি তাকে জেলে নিয়ে আসা নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। মার্গারেট মাথা নাড়ল, সেসব কিছুই হয়নি। এদেশে সরকারবিরোধী কোন ঘটনা ঘটলে তা প্রকাশ করা হয় না। হোটেলের যেসব কর্মী ব্যাপারটা জানতো তাদেরই কেউ মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয় অফিসারের নগ্ন অবস্থায় পালানোর গল্পটা। যেহেতু ওই অফিসারটির কুখ্যাতি বিপ্লবীদের জানা ছিল তাই ঘটনাটি সেই মুহূর্তে গুরুত্ব পেয়েছিল। মোটামুটি সরকারী তাঁবেদারে প্রকাশিত কাগজগুলো লিখেছিল ভারতীয় বারবনিতা হোটেল থেকে উধাও হয়ে গেছে। যে সংস্থা তাদের ফ্রি-টাউনে এনেছিল তারাও দায়িত্ব নামিয়েছিল কাঁধ থেকে। ফিরে যাওয়ার আগে সেই প্রতিনিধিদলের নেতা বিবৃতি দিয়েছিল ফ্রি-টাউনের সরকার বারবনিতাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখার জন্যে অতিশয় উদ্‌গ্রীব। সম্ভবত যে দিন সুধারানীকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিনই একটি পার্টিতে ওই বিবৃতি দেবার চুক্তি হয়েছিল। বিপ্লবীরা জানতে পেরেছিল অফিসারকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে সুধারানীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ওরা এই ঘটনা জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করেছিল। কিন্তু তিনবছর আগে বিপ্লবভাবনা কোন শক্ত ভিতে দাঁড়িয়ে ছিল না। তাছাড়া সিয়েরা লিওনের মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা বাদ দিয়ে অন্যদিকে তাকাবার সময় ছিল না তাদের। ফলে ব্যাপারটা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই চাপা পড়ে যায়। ওইরকম ঘটনা ওদেশে রোজ এত ঘটে যে আলাদা গুরুত্ব পাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু মার্গারেটের স্মৃতিতে থেকে গিয়েছিল ঘটনাটি, কারণ মেয়েটি ভারতীয়।

সুধারানীর কাছে এই তথ্য নতুন কোন প্রতিক্রিয়া আনল না। এখন তার জন্যে সোনাগাছিতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। মোক্ষদা এতদিনে অন্যঘরে কাজে লেগে গেছে। সুরবালা সল্টলেকের বাড়িতে মিত্তিরদাকে নিয়ে দিনযাপন করছে। সুরবালা বলেছিল একবার সোনাগাছির নরক থেকে বেরিয়ে গেলে ভুলেও আর ওমুখো হবে না। সুধারানী জানে সুরবালা নরকের আসল চেহারা

দ্যাখেনি। এই নরক থেকে মরণ ছাড়া বেরিয়ে যাওয়া যায় না। অতএব সোনাগাছি ছেড়ে যদি সুধারানী সল্টলেকে গিয়ে ওঠে তাহলেই সুরবালা তাকে জায়গা দিতে পারে। কিন্তু তার যৌবনের শুরুতেই সুরবালা বলেছিল, 'আমাদের জীবনে বিয়ে থা করে সংসার করার নিয়ম নেই। করতেও দেবে না কেউ। যদ্দিন যৌবন থাকবে শরীর ভাঙ্গিয়ে পকেট ভরাও। ছিবড়ে হবার পর তাই গড়িয়ে বেঁচে থাক। অতএব আমি না ডাকলে তুই কখনও আমার ওপর ভর করবি না। নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিতে হবে তোকে।'

অতএব তার জন্যে পৃথিবীতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তার। কিন্তু মার্গারেটের কথাগুলো সুধারানীকে খুব টানছিল। এদেশের মানুষেরা একত্রিত হচ্ছে অত্যাচারী সৈন্যদের হটিয়ে দেবার জন্যে? ওরা এতদিন এই কাজটা করেনি কেন? যারা ঠাণ্ডা মাথায় একটি মেয়েকে খুন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারে তাদের শাস্তি দিতে এত দেরী হয় কেন? প্রশ্নগুলো শুনে মার্গারেট বলেছিল পরাধীনতা যেকোন মাদকের চেয়ে তীব্র নেশা। যা ধরলে মুক্ত হওয়া খুব মুশকিল। তাছাড়া ভয় এবং নির্ভরতা মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়। তাকে বোঝানো কষ্টকর হয়ে পড়ে যে স্বাধীনতা অনেক বেশী মূল্যবান। তার জন্যে যোগ্য হতে প্রস্তুতির দরকার হয়। এই কালোমানুষের দেশে এতদিন ভয় দেখিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যে ক্ষমতা দখল করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে সময় লাগবেই।

সুধারানী মার্গারেটকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমিও তো সাদা চামড়ার মেয়ে। তোমাকে ওরা কেন গ্রেপ্তার করে এই নবকে পাঠাল?

মার্গারেট বলেছিল, 'ওরা রঙ দেখে না, কাজ দ্যাখে। যেহেতু আমি ওদের স্বার্থের পক্ষে বিপদজনক কাজ করছি তাই আমাকে গ্রেপ্তার না করে ওদের উপায় নেই।'

মার্গারেট আসার পর থেকেই গরম গরম খবর ঠিক চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছিল জেলের সেলে সেলে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে ফ্রি-টাউনের আশেপাশে। মাঝে মাঝে শহরের রাস্তায় চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলছে। প্রহরীদের মুখে আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এক বিকেলে কালো প্রহরী মার্গারেটকে ডেকে নিয়ে গেল সেল থেকে। ওকে এমন জায়গায় দাঁড় করাল যাতে সবাই দেখতে পায়। ওরা মার্গারেটের পোশাক ছিঁড়ে খুলে ফেলল। তারপর ওদের নেতা চিৎকার করে বলল, 'তোরা তাকিয়ে দ্যাখ, এই ডাইনিটা একদম সাদা। এ তোদের বন্ধু নয়। তোরা হাড্ডিসার আর এর শরীরে দ্যাখ কত মাংস। তোদের আবার বেশ্যাগিরি করারার জন্যে ও আর ওর বন্ধুরা পরিকল্পনা করেছে। আমরা আর যাই হোক তোদের দুবেলা খাবার দিই। এর কথা শুনলে তোরা তাও পাবি না।'

তারপর মার্গারেটকে রাইফেলের বাঁটে ঠেলে সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে সেনাগালি মেয়েদের উত্তেজিত করতে লাগল মার্গারেটের বিরুদ্ধে। সেলের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়েছিল মার্গারেট। সৈন্যরা চলে যাওয়ামাত্র সেনেগালি মেয়েদের চোখে আগুন জ্বলতে দেখল সুধারানী। নিজেদের শুকিয়ে যাওয়া শরীরের সামনে স্বাস্থ্যবতী মার্গারেটকে ওরা ঈর্ষা করতে লাগল। সুধারানী লাফিয়ে চলে এল মার্গারেটের পাশে। তারপর রাগী গলায় উচ্চারণ করল, 'ওদের কথায় কান দিও

না তোমরা। যদি কেউ এর ক্ষতি করতে চাও তাহলে আগে আমাকে মারতে হবে।'

একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ও সাদা চামড়ার ডাইনি?'

'ডাইনি? মোটেই নয়। ওর কথা তোমরা শোননি। আর ওই প্রহরীটা, যে আমাদের ওপর দিনরাত অত্যাচার করছে তার চামড়ার রঙ কি? কালো না?' মেয়েগুলো থিতিয়ে গিয়েছিল। দুহাতে নগ্নতা ঢেকে বসেছিল মার্গারেট। সুধারানী অসহায় চোখে তাকিয়েছিল। এই জেলখানায় ঢোকার সময় যে স্কার্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল তার অবস্থা তেল চিটচিটে, জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে। অথচ সেলের বাইরে মার্গারেটের ছেঁড়া জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে।

দুদিনের মধ্যে জেলখানার চেহারা পাল্টে গেল। প্রহরীদের চোখে মুখে ভয়। ওদেরই একজন মার্গারেটকে একটা নোংরা স্কার্ট দিয়ে গিয়েছিল। কে বলে গেল শহরে কার্ফু জারী হয়েছে। রাস্তায় কাউকে হাঁটতে দেখলেই গুলি করা হচ্ছে। কিন্তু জেলে বসেই ওরা বোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। গতকাল সন্ধ্যে থেকে কেউ খাবার দেয়নি তাদের। কোন প্রহরী এদিকে আসছে না। প্রতিপক্ষ ভয় পেয়েছে বুঝতে পারলে সাহস বাড়ে। মেয়েরা সেলে সেলে একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে। তারা খাবার চাইছে। প্রহরীদের ডাকছে।

তৃতীয় দিনের ভোরে মনে হল কানে তালা লাগবে। যেন যুদ্ধক্ষেত্রটা সোজা উঠে এসেছে জেলের ভেতরে। সামনের রাস্তাতেই বোমাটা ফাটার পর সব চুপচাপ। আর তারপরেই প্রহরীদের নেতা ছুটে এল ভেতরে। মেয়েরা অবাক হয়ে দেখল তাকে ভূতগ্রস্ত দেখাচ্ছে। ওর সঙ্গে বন্দুক নেই। কি করবে বুঝে উঠছিল না লোকটা। কালো মুখ রক্তশূন্য। হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায় সেলের সামনে ছুটে এসে পাগলের মত তালা খুলতে লাগল। সুধাবানী মার্গারেটের হাত চেপে ধরল। দরজা খুলে লোকটা সুধারানীদের সামনে আছাড় খেয়ে শুয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল শব্দ করে। মেয়েরা এতটা অবাক হয়েছিল কেউ নড়ল না। যে লোকটা দিনের পর দিন তাদের ওপর অত্যাচার করে গেছে সে এইভাবে কাঁদতে পারে তা ভাবতে পারছিল না ওরা। এইসময় খুব কাছেই গুলির শব্দ হল। লোকটা কঁক্ করে কান্না থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল। আর তখনই স্টেনগান হাতে ছুটে এল চারটে লোক। এদের পরনে সাধারণ মানুষের পোশাক। সেলগুলোর দিকে তাকিয়ে লোকগুলো হতবাক হয়ে গেল। যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা। শেষপর্যন্ত একজন চিৎকার করে উঠল, 'মেয়েরা আমরা জিতছি। আজ থেকে তোমরা মুক্ত। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার জন্যে তোমরা আমাদের হাতে হাত মেলাও। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত চিৎকার উঠল। চাবির তোয়াক্কা না করে ওরা অন্য সেলের তালাগুলো গুলি করে উড়িয়ে দিতেই মেয়েরা পিল পিল করে বেরিয়ে পড়ল। বিপ্লবীরা সুধারানীদের সেলের সামনে এসে দরজা খোলা দেখে বিস্মিত হয়ে নিচে তাকাতেই প্রহরীদের নেতাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন চিৎকার করল, 'এই কালো কুত্তাটা এখানে এসে লুকিয়েছে।' বলামাত্র গুলি ছিটকে এল। লোকটা কুঁকড়ে গিয়ে প্রাণহীন হল। বিপ্লবীরা আর অপেক্ষা করেনি। মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে মুক্তির আনন্দে। সুধারানী দেখল কয়েকজন মেয়ে যাওয়ার আগে

প্রহরীনেতার মৃত শরীরে লাথি মারল। কেউ কেউ থুতু ফেলল। মুহূর্তেই জেলখানা ফাঁকা।

সমস্ত শরীরে শিহরণ, সুধারানী ধীরে ধীরে একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে জেলের সদর দরজায় উপস্থিত হল। আসবার পথ ইউনিফর্ম পরা মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে অন্তত গোটা দশেক। এই দেশ তার নয়। কিন্তু তবু মনে এত তৃপ্তি আসছে কেন? ওই বিপ্লবীদের এত আপন বলে মনে হচ্ছে কেন? তার কেবলই মনে হচ্ছিল বিপ্লবীরা নিশ্চয়ই সেই ব্যারাকবাড়িটা ভেঙ্গে ফেলবে। একঘরে দশজন মেয়েকে পাশাপাশি শুয়ে ব্যবসা করতে বাধ্য করবে না। নির্মম হাতে খুন করে কাউকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে না।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সুধারানী। মাঝে মাঝেই গুলি বোমার শব্দ কানে আসছে। হুস হাস করে ছুটে যাচ্ছে সাদা পতাকা লাগানো গাড়ি। ফ্রি-টাউনে শাসকদলের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়লেও লড়াই চলছে। হঠাৎ সুধারানীর মনে পড়ল সে যখন এই জেলে এসেছিল তখন তার স্যুটকেশ, হাত ব্যাগও ওরা এনেছিল। সে জেনেছিল মুক্তির সময় ওগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জামাকাপড়, ডলার ছাড়া পাশপোর্ট রয়েছে ব্যাগে। সুধারানী ফিরল।

জেলখানায় ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল সুধারানী। দলে দলে অভুক্ত শীর্ণ মানুষেরা ভিড় করেছে জেলখানায়। তারা ইতিমধ্যে মৃত প্রহরীদের পোশাক খুলে নিয়েছে। খাবারের ঘর লুঠ হয়েছে। এবার মালখানার তালা ভাঙ্গছে ওরা। হাড়জিরজিরে মানুষগুলো এতকাল কোথায় ছিল জানে না সুধারানী কিন্তু ওদের কোটরে বসা চোখ শেয়ালের মত লোভী হয়ে উঠছিল। সুধারানীকে দেখে ওরা সামান্য থমকে গেলেও পাত্তা দিল না। মালখানার দরজা ভেঙ্গে ওরা লুঠতরাজ শুরু করল। সেই দঙ্গলে মিশে গেল সুধারানী।

না। কোথাও তার স্যুটকেশ নেই। ডলার কিংবা ট্রাভেলার্স চেক নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভিখিরীদের ছুঁড়ে দেওয়া কাগজপত্রের মধ্যে নিজের পাশপোর্টটাকে খুঁজে পেল সে। সুধারানী ওটাকে খুলতেই বুকের ভেতরটা টলে উঠল। শাড়ি পরা লাজুক মুখ। এই মুখ কি তার? এরই নাম সুধারানী দাসী?

পাশপোর্ট বুকে রেখে হাঁটছিল সুধারানী। মার্গারেট তাকে বারংবার ভারতীয় বলত। ইন্ডিয়ান। সে ইন্ডিয়ার মানুষ। অনেকদিন পরে হেসে ফেলল সুধারানী। ইন্ডিয়া কি তা সে জানেই না। সে সোনাগাছির মেয়ে। শিগাল, টাইম স্কোয়ার অথবা এখানকার ব্যারাকবাড়িতেও সে দিব্যি মানিয়ে যেত। কিংবা এই জায়গাগুলো যদি সোনাগাছি নাম নিয়ে নিত তাহলে কোন অসুবিধে হত না তার।

হঠাৎ মাথার ওপর গোঁ গোঁ শব্দ হতে চোখ তুলল সে। একটা এরোপ্লেন নেমে আসছে খুব কাছে। এসে যেটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সামনের রাস্তায় সেটি ফাটা মাত্রই পৃথিবী কেঁপে উঠল যেন। চোখের সামনে রাস্তা বাড়িঘর ছিটকে আকাশে উঠল যেন। সুধারানী দৌড়াতে লাগল। সামনের একটা বাড়ি থেকে অবিরাম গুলি বেরুচ্ছে। রাস্তার এপার থেকে বিপ্লবীরা তার জবাব দিচ্ছে। উদভ্রান্ত সুধারানী ফ্রি-টাউনের পথে ছুটে চলেছিল। সে জানত না কোথায় যাওয়া যায়।

হঠাৎ তার নজরে এল একটা বড় গেটের সামনে গাড়ি থামছে। আর গাড়ি থেকে আহতদের নামিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুধারানী যখন গেটের সামনে চলে এল তখন তাকে কেউ কিছু বলল না। সে দেখল একটা মন্দির মত বাড়ির সামনে বিরাট মাঠে আহতরা শুয়ে আছে লাইন করে। চার পাঁচজন সাদা পোশাকের প্রৌঢ় আর মাথা ঢাকা পা অবধি আলখাল্লা পরা মেয়ে সেই আহতদের চিকিৎসা করছে। সুধারানীকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন বৃদ্ধ চিকিৎসক এগিয়ে এলেন। 'তুমি কি আহত ?'

সুধারানী কথা না বলে মাথা নাড়ল। না।

'তোমার সঙ্গে কেউ নেই ?'

'না।' সুধারানী এবার জবাব দিল। ওপাশে যা মন্দির বলে মনে হচ্ছিল সেখানে ঘণ্টা বাজছে। সুধারানী মাথা নিচু করল।

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে ? ভয় পেয়ো না, এই চার্চে তুমি নিরাপদ। যিশু তোমার মঙ্গল করবেন।'

মানুষ মরছে আবার মৃতপ্রায় মানুষ বেঁচে উঠছে ওষুধ এবং সেবা পেয়ে। বিপ্লবীরা শহরের সমস্ত ওষুধ এখানে এসে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছিল। তা থেকে বাছাই করে আহতদের চিকিৎসা চলছে। সুধারানীকে ফাদার শিখিয়ে দিয়েছেন কি করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়। কতটা যত্নে মুখে জল ঢালতে হয়। একটু একটু করে খাইয়ে দেবার কায়দাটা কি ! নেশা ধরে গেল সুধারানীর। এখানে যারা এসেছে তারা সবাই বিপ্লবে অংশ নিয়ে আহত হয়েছে।

বিকেল বেলায় ফাদার তাকে ডাকলেন, 'তোমার জামা এবং শরীর এই দুরবস্থায় কেন ?'

সুধারানী বলল, 'আমি তিনবছর জেলে ছিলাম।'

'ও।' ফাদার বললেন, 'তুমি তো এদেশের মানুষ নও। কি অপরাধ করেছিলে ?'

'আমি একটা পুলিশ অফিসারকে বাধা দিয়েছিলাম বলে জেলে যেতে হয়েছিল। আমি এসেছিলাম ইণ্ডিয়া থেকে।' সুধারানী বলল।

'তুমি কেন এসেছিলে এখানে ?'

'আমাকে আনা হয়েছিল এখানকার বারবনিতাদের অবস্থা দেখবার জন্যে।'

'তুমি কি করতে ?'

'আমি পুরুষদের আনন্দিত করতাম গান শুনিয়ে এবং শরীর দান করে।'

ফাদার সুধারানীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর হাত বাড়িয়ে চার্চের সামনের মাঠটা দেখালেন, 'তোমার পুরুষদের সম্পর্কে এতদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই কাজের কোন মিল নেই। কিন্তু যে পুরুষেরা ক্ষণিকের আনন্দের জন্যে তোমার কাছে যেত তাদের কথা ভুলে যাও। এখানে যারা এসেছে তারা তোমার সেবা চায় জীবন ফিরে পাওয়ার জন্যে। যেহেতু তোমার কোন আশ্রয় নেই তাই তুমি এখানেই থাকবে।'

সুধারানী তিনবছর পরে স্নান করল। তার শরীরের যাবতীয় চর্মরোগে ওষুধ পড়ল তিন বছর পরে পরিষ্কার ম্যাক্সিজাতীয় পোশাক শরীরে দিয়ে সে আরাম

বোধ করল। তার মাথার জট কেটে ফেলে দেওয়ার পর সে একেবারে হালকা হয়ে গিয়েছিল। পরিচ্ছন্ন সুধারানী নানদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল তাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। বিকেলের আলো মরে যাওয়ার আগেই সে আবার মাঠে নেমে পড়ল। ছোট ছোট আলো জ্বলছে, সমস্ত মাঠে আহতদের কাতর চিৎকার চারদিকে। নান, ফাদার এবং স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তাররা কাজ করে যাচ্ছেন চুপচাপ। এখন কোথাও গোলাবারুদের শব্দ নেই। মাথার ওপর বোমারু বিমান উড়ছে না। বিপ্লব সফল। সমস্ত প্রতিরোধব্যূহ ভেদ করে বিপ্লবী বাহিনী রেডিও স্টেশন এবং সরকারি অফিসগুলো দখল করেছে। কিন্তু অর্দ্ধমৃত ও আহত মানুষের আসার বিরাম নেই।

সুধারানী নতুন উদ্যমে কাজ করছিল। নতুনদের ব্যাণ্ডেজ পরিয়ে পুরোনদের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দিচ্ছিল সে। পনের থেকে পঁচাত্তর বয়সের মানুষগুলো বিপ্লবের জন্যে আহত হয়েছে। এরা পুরুষ। যারা সোনাগাছি অথবা ব্যারাকে যায় তারাও পুরুষ। কিন্তু এখন পুরুষের অসহায় চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছিল এদের সে আগে কখনই চিনতো না। এই পা, উরু, পেট, বুককে সে এতদিন অন্য ভূমিকায় দেখে এসেছিল। সুধারানী একটা পা টেনে নিল। রাইফেলের গুলি বের করা হয়েছিল সম্ভবত আগেই। ব্যাণ্ডেজে পুঁজ জমেছে। শরীরে উত্তাপ। লোকটি শুয়ে আছে উপুড় হয়ে আর গোঙানি বের হচ্ছে থেকে থেকে। ক্ষতস্থান মুক্ত করে ভয় পেল সে। আনাড়ি চোখেও বুঝতে পারল পায়ের অনেকটা জায়গাজুড়ে পচন শুরু হয়েছে। সে কি করবে বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়াল। খানিক দূরে একজন ডাক্তার যাচ্ছিলেন, সুধারানী দৌড়ে তাঁকে ডেকে আনল। ডাক্তার ক্ষতস্থান দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন। গুলি লেগেছিল পেছন থেকে। তাই লোকটা শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। ডাক্তার তাকে ধীরে ধীরে চিৎ করে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতেই লোকটা ককিয়ে উঠল। এবং তখনই সুধারানীর মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। বুকের ভেতর লোহার বলটা আচমকা লাফিয়ে উঠল। এখন পরনে ইউনিফর্ম নেই কিন্তু এই মুখ সে ভুলবে না কোনদিন। সুধারানী এক পা এগিয়ে গেল। সে নিশ্চিত। তার মুখ থেকে শব্দ ছিটকে উঠল।

ডাক্তার বললেন, 'ওর পাশে থাকো। তুমি আপসেট হলে সেবা করবে কি করে ? আমি সিনিয়ারকে ডেকে আনছি। এর অবস্থা ভাল নয়।' ডাক্তার চলে গেলেন দ্রুত।

লোকটির জ্ঞান স্বচ্ছ নয়। সে চোখ মেলে একবার তাকাল। সুধারানীর মনে হল ওই চোখ উপড়ে নিলে তার শান্তি হত। কিন্তু এ এখানে কেন ? এখানে তো আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসা হচ্ছে। ওরা কি ওকে ভুল করে এনেছে। সেই লালসা এখন লুপ্ত, সেই নিষ্ঠুরতা অন্তর্হিত। এর জন্যে তাকে তিনবছর জেলে পচতে হয়েছে। হঠাৎই প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল সুধারানীর মনে। ওই ক্ষত যদি আরও ছিন্নভিন্ন করা যায় তাহলে— ! কিন্তু সঙ্গে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ এবং ওষুধ। সামান্য একটা তারও তার সঙ্গে নেই। এইসময় ডাক্তার ফিরে এলেন কয়েকজনকে নিয়ে। তারা যখন লোকটিকে পরীক্ষা করছে তখন সুধারানী দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তাররা পরীক্ষার পর ঘোষণা করলেন এখনই অপারেশন করে পা বাদ দিতে হবে। এই সাময়িক ব্যবস্থায় বড় অপারেশন সম্ভব নয় কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতেই হবে নইলে লোকটির প্রাণ বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ঘিরে ফেলা হল। সুধারানী সরে এল সামনে থেকে। আর তখনই একটা জিপ এসে দাঁড়াল গেট পেরিয়ে। দুজন নেতার সঙ্গে রাইফেল হাতে আরও তিনজন। নেতারা এগিয়ে এসে ফাদারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। ফাদারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর আহতদের পরিদর্শন শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই বিপ্লবীবাহিনীর সদস্য তো?'

ফাদার বললেন, 'সেটা আপনাদের চিন্তা। আমার কাছে সবাই আহত মানুষ।'

নেতারা ইতস্তত করলেন। একজন বললেন, 'আপনার দিক থেকে ঠিক বলেছেন। কিন্তু যারা আমাদের দেশের মানুষের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছে তারা সুস্থ হোক আমরা চাই না।'

সুধারানী কথাগুলো শুনতে পেল। হঠাৎ সে এগিয়ে গেল নেতাদের সামনে, 'আমি আপনাদের দেশের মানুষ নই। আপনাদের তবু আমার কথা শুনতে হবে।'

খুব অবাক হয়ে নেতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?'

'আমি একজন, একজন বারবনিতা।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র নেতা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে ফাদারের দিকে তাকালেন। ফাদার খুব সংক্ষেপে সুধারানীর কাছে শোনা ঘটনা শোনালেন। নেতা মাথা নিচু করে বললেন, 'সত্যি যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে জানবেন এদেশের অনেক মেয়েই আপনার মত শিকার হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এমন ঘটনা আর ঘটবে না।'

সুধারানী চট করে ঘেরা জায়গাটা দেখল। ওখানে অপারেশন শুরু হতে চলেছে। সে মাথা নাড়ল, 'এখানে একজন আশ্রয় নিয়েছে যে পুলিশ অফিসার হিসেবে ঠাণ্ডা মাথায় অকারণে মানুষ খুন করেছে।'

চকিতে দ্বিতীয় নেতা সচকিত হলেন, 'এখানে? এই আহতদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'লোকটা কোথায় আগে দেখিয়ে দিন।'

'লোকটা আহত। কিন্তু ওকে হত্যা করার অনুমতি আমাকে দিতে হবে।'

'হত্যার অনুমতি আমি বা আমরা দিতে পারিনা। অত্যাচারীর বিচার হবে। বিচারক যা রায় দেবেন তাই কার্যকর করা হবে। কিন্তু আপনি—।'

'আমি যার কথা বলছি তার জন্যেই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। ওই অফিসার আমাকে হোটেলে জোর করে আটকে রেখে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। সেদিন গুলি ছুঁড়ে আমি ওকে হত্যা করতে পারিনি। কিন্তু আমি আজ—।' হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেলল সুধারানী। সেদিন যাকে কম্পিত হাতের জন্যে হত্যা করতে পারেনি আজ তাকে খালি হাতে কি করে শেষ করবে।

'কোথায় লোকটা?'

সুধারানী আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল ঘেরা জায়গাটা। নেতাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কি হচ্ছে? জায়গাটা ঘেরা কেন?'

ফাদার বললেন, 'অপারেশন।'

কিন্তু যেই ডাক্তাররা বেরিয়ে এল অমনি নেতারা এগোলেন। ঘেরা সরিয়ে নেওয়া হল। অজ্ঞান লোকটা শুয়ে রয়েছে হাঁ করে। তার একটা পা সোজা ছড়ানো, অন্যটি হাঁটুর অনেকটা ওপর থেকেই নেই। সেদিকে লক্ষ্য না করে নেতারা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। এই কুখ্যাত অফিসার এখানে কি করে এল ভেবে পাচ্ছিলেন না তাঁরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন বললেন, 'এই লোকটাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে ডক্টর। অন্তত একশ-টা খুন করেছে এ। যেমন করে হোক বাঁচান, আমরা ওর বিচার করব।'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'সরি। আই কান্ট হেলপ ইউ। ও মারা গেছে।'

'মারা গেছে?' চিৎকার করে উঠল সুধারানী।

'হ্যাঁ। অপারেশনের ধকল সহ্য করতে পারেনি।' ডাক্তার চলে গেলেন অন্য আহতের পাশে।

সিয়েরা লিওনে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত। মাসখানেক ধরে সুধারানীদের সেবার কাজ চলেছিল। তারপর হাসপাতালগুলো চালু হলে চার্চের মাঠ আবার স্বাভাবিক হল। শহরে এখন মোটামুটি আইনশৃঙ্খলা চালু হয়েছে।

সুধারানীর ডাক পড়ল ফাদারের ঘরে। তিনি বসেছিলেন আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। ফাদার তাকে বসতে বলে আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক নবগঠিত সরকারের জনসংযোগ দপ্তরে আছেন। ফাদার বললেন, 'সুধারানী, তোমার দেশ ইণ্ডিয়া, ভাগ্যচক্রে এখানে এতদিন থাকতে হয়েছে। এরা জানতে চাইছিলেন তোমার পাশপোর্ট আছে কিনা। সেটা আছে জানানোয় এরা তোমাকে দুটো প্রস্তাব দিয়েছেন। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার দেশে ফিরে যেতে পার। অথবা এখানে এই দেশে থাকতে পার।'

'এই দেশে?' সুধারানী অবাক।

'হ্যাঁ। এরা তোমাকে এদেশের মানুষ বলে ভাবতে পারেন যদি তুমি চাও।'

'ফাদার! পৃথিবীর যেকোন দেশে গিয়ে থাকতে আপনার কি অসুবিধে হবে যখন সেবাই আপনার ধর্ম?' সুধারানী জানতে চাইল।

'না। হবে না।' ফাদার স্বীকার করলেন।

'আমারও না। কিন্তু এখানে পাকাপাকি থাকার সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমি একটা জায়গায় যেতে চাই আপনাদের অনুমতি থাকলে।' সুধারানী অনুরোধ জানাল।

সরকারি কর্মচারী বললেন, ' কোথায়? এই শহরের বাইরে?"

'না। শহরের ভেতরেই।'

'বেশ তো। সঙ্গে আমার গাড়ি আছে। আপনি আসতে পারেন এখনই।' সুধারানী আর দেরি করল না। ফাদারের অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোকের জিপে গিয়ে উঠল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক কোথায় যেতে চাইছেন বলুন তো?'

'বন্দরের দিকে।'

রাস্তায় এখন শান্তিপ্রিয় মানুষের ভিড়। বন্দুকের আওয়াজ স্মৃতিতে। তবে

কিছু কিছু ঘরবাড়ির দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় ঘটনাটা বেশীদিনের নয়। শহর ছাড়িয়ে ওরা বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছিল। সুধারানীব কাছে সব রাস্তা সমান লাগছিল। একেবারে সমুদ্রের ধারে চলে এসে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই হল বন্দর। বলুন কোথায় যাবেন।'

সমুদ্রের এত কাছে কখনও আসেনি সুধারানী। সে ওই অনন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ভদ্রলোক আবার তাড়া দিলে সে ঘুরে দাঁড়ালো। সামুদ্রিক বাতাসে তার চুল উড়ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'যেখানে এই শহরের বারবণিতারা থাকে সেই জায়গায় যেতে চাই।'

'বারবণিতা?' ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল, 'ওরা তো শহরের অনেক জায়গায় থাকে। আর সত্যি কথা বলতে কি বিপ্লবের পরে এই শহরে ওদের সংখ্যা কিছু বেড়েছে। আগের সৈন্যবাহিনীর মৃতদের বিধবারা এরই মধ্যে ওই জীবিকা গ্রহণ কবেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আমরা জরুরী সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকায় ওদিকে নজব দিতে পারিনি এখনও।'

সুধারানী মাথা নাড়ল, 'কিন্তু এখানেই ছিল। সমুদ্রের কাছাকাছি।'

কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা কবে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক হদিশ পেয়ে জিপটাকে হাজিব করলেন ব্যারাক বাড়ির সামনে। সুধারানী দেখল সেই নিগ্রো মোটা লোকগুলো খদ্দের এসেছে ভেবে এগিয়ে আসছে। তিন বছরেও লোকগুলোক যেন একটুও পাল্টায়নি। জিপে মহিলাকে দেখে ওরা অবাক হল।

সুধারানী সেনেগালি ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি দালাল?'

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ভদ্রলোক বললেন, 'উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দাও। আমরা সরকারি কাজে এসেছি।'

এবার একজন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সুধাবানী জিজ্ঞাসা করল, 'এখনও কি ওপরে একঘরে দশজন শুয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ, জায়গায় বড় অভাব এখানে।'

'এখনও কি কেউ মরে গেলে সমুদ্রে ফেলে দাও তোমরা?'

লোকগুলো চুপ করে থাকল। দূরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি শীর্ণ মেয়ে এদিকে তাকিয়েছিল।

দমদম এয়ারপোর্টে যখন প্লেনটা ধীরে ধীরে নেমে এল তখন আকাশে মেঘ ঝুলছে, বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। সুধারানী চুপচাপ বসেছিল আসনে। যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর তার খেয়াল হল সে কলকাতায় এসে গিয়েছে।

চার্চ থেকে দেওয়া ছোট্ট ব্যাগে একপ্রস্ত জামাকাপড় এবং একটি চিরুনি ছাড়া তার সঙ্গে কিছু নেই। তাই আঁকড়ে সে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। সুধারানী চারপাশে তাকাল। সিয়েরা লিওনের আকাশে মাঝে মাঝেই এমন মেঘ জমত। যে জায়গায় প্লেন নামে সেখানে দাঁড়ান আলাদা করে জায়গাটাকে চিনতে পারে না কেন সে?

দলের পিছু পিছু এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এ ঢুকে তাকে লাইনে দাঁড়াতে হল। এবং তখন অনেক অনেকদিন পরে বাংলা শব্দ কানে এল তার। দুজন এয়ারপোর্ট

কর্মচারী নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আর শব্দগুলো কানে আসামাত্র সুধারানীর বুকের ভেতরটা টলমলে হল। এখান থেকে সোনাগাছি কতদূর ?

ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসার ওর পাশপোর্ট নাড়াচাড়া করলেন অনেকক্ষণ। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তিন বছরের ওপর বিদেশে ছিলেন। গিয়েছিলেন দশ দিনের ভিসা নিয়ে প্যারিসে, আসছেন সিয়েরা লিওন থেকে। আপনি কেন গিয়েছিলেন ?'

'আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।' বাংলায় কথা বলল সে।

'কেন ?'

'বক্তৃতা করতে।'

'আপনি তো বাঙালি ? ক্রিশ্চান ?'

'না।'

লোকটা হাসলো, 'কিসের ওপর বক্তৃতা করেছিলেন ?'

'পুরুষরা আমাদের কাছে এসে কিরকম ব্যবহার করে তা বলতে।'

'আপনাদের মানে ? আপনি কি করেন ?' এখানে ব্যবসা লেখা আছে!'

'ঠিকই তো। সোনাগাছিতে আমার ঘর আছে।'

'মাই গড।' লোকটা চমকে উঠল। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে গেল সুধারানীকে ঘিরে। কোন আন্তর্জাতিক স্পাই অথবা উগ্রপন্থীদের এজেন্ট কিনা এই নিয়ে তর্ক উঠল। তাকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় কিনা তা নিয়েও মতান্তর হল। এবং সেই সময় একজন আবিষ্কার করল সুধারানীকে। সাড়ে তিন বছরের ব্যবধান ডিঙ্গিয়েও সংবাদপত্রের স্মৃতি তার মাথায় চলে এল। এবং এই কারণেই সুধারানী ভারতবর্ষে প্রবেশের অনুমতি পেল। অবশ্য সুধারানী বুঝতে পারছিল না তার দোষটা কোথায়।

কাস্টমসের লোকরাও তার মালপত্র দেখে অবাক হল। বাইরের লাউঞ্জে পা দিতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হল সে। ভেতর থেকে খবর আহরণের যে কায়দা ওদের আছে তা থেকেই একটা বড় খবরের গন্ধ পেল ওরা। কিন্তু সুধারানীর শীর্ণ শরীর, যৌবনের দুর্দশা দেখে ওরা হতাশ হল। যারা ওকে যাওয়ার সময় দেখেছিল তারা এখন চিনতেই পারছিল না।

'আপনি প্যারিসে গিয়ে কি করলেন ?' 'প্যারিসে আপনি বক্তৃতার বদলে গান গেয়েছিলেন বলে শুনেছি।' 'আপনাকে সিয়েরা লিওনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে গিয়ে কি দেখলেন ?' 'পৃথিবীর ওই দুটো দেশের বারবণিতারা কেমন আছে ?' 'সিয়েরা লিয়ন থেকে আপনি কোথায় উধাও হয়েছিলেন ? এখন আপনি কি করবেন ?'

যা পেরেছিল তাই জবাব দিয়েছিল সুধারানী। এই শেষ প্রশ্নটায় সে থমকে গেল।

একথা কেন ? সে যা করত তাই করবে। তখন সে বাংলা ছাড়া কিছু জানতো না, এখন ইংরেজি ও সেনেগাল জানে। পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে চলার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। অতএব সে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করতে পারবে। তাহলে এই প্রশ্ন কেন ?

সুধারানী উত্তর দিল, 'আমি তো অন্যকাজ জানিনা।'

সাংবাদিকটি খোঁচা দিল, 'কিন্তু এই যে আপনি বিদেশ ঘুরে এলেন, তারপরেও ?'

সুধারানী জবাব দিল না। তার পোশাক, চেহারা এবং ব্যাগ দেখে ওরা গল্পের গন্ধ পাচ্ছিল।

প্রত্যেকেই ভাবছিল কি করে সবার আগে সুধারানীর সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়।

'আপনি গত তিন বছর কোথায় ছিলেন ?'

'জেলে। আমাকে জেলে রাখা হয়েছিল।'

'জেল ?' সাংবাদিকরা আরও রহস্য পেল, 'কি করেছিলেন আপনি ?'

'কেন বলব ?'

'মানে ?'

'এসব কথা আপনাদের কেন বলতে যাব ?' সুধারানীর মনে হল এবার তাকে নিয়ে ওরা অনর্থক মজা করতে যাচ্ছে।

'আপনি বললে আমরা তা কাগজে ছাপিয়ে দেব, পাবলিক জানতে পারবে।'

'তাতে আমার কি লাভ ? আমি অনেক সেনেগালি গালাগাল জানি, সেগুলো শুনলে আপনাদের কিছু হবে ? আমাকে যেতে দিন।' প্রায় জোর করেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েকজন তখনও তার পিছু ছাড়েনি। এয়ারপোর্টের বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা দৃশ্যটি দেখল ! সুধারানী লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে আর তার পেছনে জনা তিনেক লোক ছুটছে। ট্যাক্সিওয়ালারা পর্যন্ত খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

আজ তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে কেউ নেই। অথচ যেদিন সে আর পিনটো বিদেশে গিয়েছিল সেদিন— । সুধারানী হাঁটতে হাঁটতে একটা বড় রাস্তায় চলে এল। সে দেখল লোক তিনটে আর পেছনে নেই। মেঘ নেমে এসেছে আরও নিচে। পৃথিবীতে রোদ নেই। এখান থেকে সোনাগাছি কত দূর ? কোন গাড়ি সেখানে যাবে ? হঠাৎ সুধারানীর খেয়াল হল তার কাছে একটাও পয়সা নেই। ফ্রি-টাউন থেকে কলকাতায় আসতে কোন পয়সার প্রয়োজন পড়েনি। বিপ্লবী সরকার তাকে যে টিকিট দিয়েছেন তাতেই প্লেনে চেপে সে চলে আসতে পেরেছে। কিন্তু এখানে তো পয়সা লাগবে।

চোখের সামনে দিয়ে বাস এবং ট্যাক্সি বেরিয়ে যাচ্ছে। সুধারানী অসহায়ের মত দাঁড়িয়েছিল। কতদূর হবে ? সে যদি রাস্তা জেনে নেয় তাহলে হেঁটে যেতে পারবে না ? সুধারানী ইতস্তত হাঁটতে আরম্ভ করতেই একটা প্রাইভেট কার পাশে এসে দাঁড়াল, 'একি ? এখনও যাননি ?' সুধারানী লোকটাকে চিনতে পারল না। লোকটা আবার বলল, 'কোনদিকে যাবেন ?'

'সোনাগাছি।' সুধারানী জবাব দিল।

'ও। আসুন আমি সেন্ট্রাল এভিন্যু দিয়ে যাব। আমাকে চিনতে পারছেন না ? একটু আগে এয়ারপোর্ট—তাড়াতাড়ি উঠে আসুন, বৃষ্টি আসছে।' সামনের দরজা খুলে দিয়ে লোকটা ডাকল। লোকটা যদি তাকে সেন্ট্রাল এভিন্যুতে নামিয়ে দেয় তাহলে আর পয়সার চিন্তা করতে হবে না। সুধারানী উঠে পড়লেই টপ টপ ফোঁটা আকাশ থেকে ঝরতে আরম্ভ করল। লোকটা পেছন দিকে তাকিয়ে নিল।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'আপনার ছবি দেখেছিলাম যাওয়ার আগে। শরীরের এই দশা কেন ? অসুখ হয়েছিল ?'

'না। জেলখানায় ছিলাম। দুবেলা শুধু একটু রুটি খেতে দিত। বিপ্লব না হলে আর বেশীদিন বাঁচতুম না।' সত্যি কথা বলে ফেলল সুধারানী। গাড়িতে ওঠার পর তার ভাল লাগছিল। ভি আই পি রোডে বৃষ্টি নেমেছে এখন।

সারাটা পথ লোকটা গল্প করে করে তার সমস্ত খবর জেনে নিচ্ছে বুঝেও আপত্তি করল না সুধারানী। হঠাৎ তার নিজের কথা বলতে ভাল লাগছে। হাতিবাগান ছাড়িয়ে এসে লোকটি বলল, 'আপনি এই তিন বছর গান গেয়েছেন ?'

'গান ?' সুধারানী মাথা নাড়ল. 'না. গান গাইনি। গান গাইবার কথা মনেও আসেনি'।

'কিন্তু এখন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি দিয়ে খদ্দেরদের সন্তুষ্ট করবেন ?'

'কেন ?' সুধারানী চমকে উঠল।'

মাথা নাড়ল লোকটি, 'তার চেয়ে অন্য কিছু করলে হয় না ? এই ধরুন কোন হাতের কাজ, অথবা পরিশ্রম করে কিছু অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা। মানে ওই জীবিকায় ফিরে যেতেই হবে তার কি মানে আছে ?'

'আমি যে অন্য কোন কাজ জানি না। তাছাড়া আমি দেখলাম সোনাগাছি বলুন আর পিগাল বলুন, এই ব্যবসায় রীতিনীতি এক। অভিজ্ঞতা বাড়লে সেটা আরও বেশী কাজ দেয়। আপনি যে কাজ করেন তা প্যারিসে গিয়ে করতে পারবেন ? পারবেন না। কিন্তু আমি পারবো। সাম আমাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চেয়েছিল।' অত্যন্ত গর্বিত হাসি হাসল সুধারানী।

সেন্ট্রাল এভিন্যুর ওপর নামিয়ে দিয়ে লোকটি একশ টাকা এগিয়ে দিল, 'খুবই কম। তবু রাখুন। আপনি যে গল্প বললেন সেটা আমরা কাগজে ছাপব। আপনার আগের ছবি আমাদের কাছে আছে এখনকারটাও আজ ক্যামেরাম্যান তুলে নিয়েছে। নমস্কার।'

টাকাটা হাতে নিয়ে বিস্মিত সুধারানী গাড়িটার চলে যাওয়া দেখল। তার এই সাড়ে তিন বছরের জীবনটা একশ টাকায় বিক্রী হয়ে গেল ? আর তারপরেই মনে হল, না, লোকটা নিশ্চয়ই দেবদূত। নইলে একটা পয়সাও যার ছিল না তাকে একশ টাকা দিয়ে যায় ? সুধারানী সোনাগাছির দিকে তাকাল। আঃ। চেনা চেনা ঘর বাড়ি, চেনা আকাশ, যতই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামুক।

গলিতে ঢুকে কয়েক পা হাঁটতেই সিটি শুনল সে। রকে বসে থাকা দুটো ছোঁড়া ওর পোশাক দেখে সিটি মেরেছে। পাত্তা দিল না সুধারানী। বাঁ দিকের চায়ের দোকান মিত্তিরদার ছিল। সাইনবোর্ডে 'নেশা' নামটা এখনও রয়েছে। বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত সেখানে ভিড় উপচে পড়ছে। ভিজতে ভিজতে দ্রুত পা চালিয়ে সে জায়গাটা পেরিয়ে এল। ঠাকুরের দোকান, ভজার মায়ের পানের দোকান, ডিঙিয়ে সে তিন নম্বর বাড়ির সামনে এসে হাঁফ ছাড়ল। যেন নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছে সে।

নিচের তলার চেনা মেয়েগুলো অবাক চোখে তাকাল। না, সবাই ঠিক চেনা

নয়, কিছু নতুন মুখ দেখছে সে। ওদের পাশ কাটিয়ে দোতলায় উঠতেই একটা সিড়িঙ্গে মত লোক সামনে দাঁড়াল, 'কে ? কাকে চাই ?'

সুধারানী তাকে চিনতে পারল না, 'তুমি কে ?'

'আমি কে ? বাপস ! আমাদের বাড়িতে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করছে আমি কে ?'

'তোমাদের বাড়ি ?' সুধারানী স্মরণ করতে পারল না, 'ও, এপাশটা তোমরা ভাড়া নিয়েছ ?'

'কি হয়েছে বঙ্কিম ?' বলতে বলতে একজন সুন্দরী ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'এ আবার কে গো ? কি চাই এখানে ?'

সুধারানী বলল, 'মোক্ষদা আছে ?'

'কে মোক্ষদা ?'

'ও পাশের ঘরে কে থাকে ?'

'কে থাকবে আবার ? ললিতা থাকে। তুমি কে বলতো ?'

'আমি, আমি ওখানে থাকতাম। ওই ঘরটা আমার। আমি তালা দিয়ে গিয়েছিলাম। ওই তালা খুলল কে ?' চিৎকার করে উঠল সুধারানী।

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে সিঁড়িতে। নিচের মেয়েরা উঠে এসেছে। এতক্ষণে তাদের কেউ কেউ তাকে চিনতে পেরেছে, 'ওমা ! একি চেহারা হয়েছে গো ! চুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে সাহেবরা। দ্যাখো সেই মরণ রোগ বাধিয়ে এল কিনা ! এই শুনলাম মরে গেছে আবার জ্যান্ত হয়ে এল কোত্থেকে ?'

সুন্দরী বলল, 'অ। তোমার নাম সুধারানী। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে প্যারিস না কোথায় গিয়েছিলে। তা তোমার ঘর ললিতাকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বাড়িওয়ালা। তিন বছর কেউ বিনা ভাড়ায় ফেলে রাখে ? তাছাড়া সবাই জানে তুমি মরে গেছ। সেই মত একটা চিঠিও এসেছিল বলে শুনেছি। তা তিন নম্বরে তো আর ঘর নেই, অন্য কোথাও দ্যাখো বাপু। যাও, ভিড় হঠাও।'

সুধারানী বিড় বিড় করল, 'আমার ঘর ভাড়া হয়ে গেছে ?' তার মাথার ভিতর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। সুন্দরী বলল, 'বঙ্কিম, বাবুদের আসবার সময় হয়ে এল। সাজগোজ হয়নি এখনও। ভিড়টা রাস্তায় বের করে দে।'

প্রায় তাড়িয়ে নিচে নামিয়ে দিল বঙ্কিম। দিয়ে বলল, 'চোখের জল না ফেলে অন্য কোথাও ঘর খুঁজে নাও না। যত্ত ঝামেলা !'

সুধারানীকে নিয়ে তখন নিচেয় মেয়েদের খুব হাসাহাসি। কেউ কেউ সুরবালার দম্ভের কথা শোনাচ্ছিল গল্প করে। 'অতি বাড় বেড়ে গেলে ঝড়ে পড়ে যেতে হয়। খাচ্ছিলি বাপু শরীর বেঁচে তোর প্যারিসে যাওয়ার সাধ হল কেন ? বুক পাছা নেই তবু গর্ব যায়নি মন থেকে, তাকাচ্ছে দ্যাখো।'

ভজার মা এল দোকান ছেড়ে, 'আহা গো ! কি হয়েছে চেহারার ! কি অসুখ ?'

'অসুখ হয়নি তো।' সুধারানীর সাদা চোখে লালচে ছাপ।

'তাহলে এই দশা কেন ? শাড়িও সঙ্গে নেই দেখছি। যাও, ঘরে ঘরে ঘুরে দ্যাখো ঘর পাও কিনা। টাকা কড়ি সঙ্গে এনেছ ?'

সুধারানী মাথা নেড়ে বলল না। ভজার মা শিউরে উঠল, 'সেকি কথা? এ্যাদ্দিন বিদেশে কাটিয়ে এলে রোজগার পাতি হয়নি?

'আমি ওখানে ব্যবসা করিনি।'

'অ। এক গলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বলছ আমি তো ন্যাংটো হয়ে জন্মাইনি। মরে যাই আর কি! টাকা থাকলে বল, চেষ্টা করতে পারি।'

'সত্যি আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

'যাওয়ার আগে কিছু রেখে যাওনি?'

সুধারাণীর মনে পড়ল। সুরবালা তার নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করেছিল। কিন্তু কোন ব্যাঙ্ক তা সে জানে না। কোথায় তার কাগজপত্র তাও তো জানা নেই। এখন সল্ট লেকে গেলে কেমন হয়?

সে উঠল। ভজার মা বলল, 'তোমার মায়ের খবর জানো?'

'না।' সুধারানী মাথা নাড়ল।

ভজার মা বলল, 'চায়ের দোকানে খোঁজ নাও।'

মাথার চুল ছেলেদের মত ছাঁটা, ছিটের স্কার্ট পরা সুধারানী হাতে ব্যাগ নিয়ে 'নেশা'র সামনে দাঁড়াতেই মিত্তিরদাকে দেখতে পেল। সেই এক ভঙ্গীতে দোকান চালাচ্ছেন মিত্তিরদা। প্রথম তিনি চিনতেই পারেননি। তারপর কাউন্টারে বসেই হাঁ হলেন, 'একি চেহারা। অ্যাঁ? তুমি না মরে গেছ?'

'মরে গেছি?' সুধারানী বিড় বিড় করল।

'হ্যাঁ। পিন্‌টো লণ্ডন থেকে চিঠি লিখেছে বছর দুয়েক আগে। আফ্রিকা না কোথায় গিয়ে মরে গেছ।' মিত্তিরদা বললেন।

'না। আমি বেঁচে আছি। মা কোথায়?'

'মা? ও, তোমার তো নিজের মা ছিল না। সুরবালা দেহ রেখেছে। মাঝরাতে ব্যথা উঠল বুকে। আর সামলানো গেল না। সে চলে যাওয়ার পর আমি আবার এখানে। ভাগ্যিস্ দোকানটা বেচিনি। চুল কেটে খ্যাংড়াকাঠি মেমসাহেব হয়েছ কেন?'

সুধারানী জবাব দিল না, 'মায়ের বাড়িঘর?'

মিত্তিরদা চারপাশে তাকালেন। খদ্দেররা সবাই জড়ো হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'সেসবসে জীবিত থাকতেই উইল করে গিয়েছিল। তা এই শরীর নিয়ে কি করবে? তোমার নিজের ঘর তো বাড়িওয়ালা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।'

'দেখি।' সুধারানী দোকান ছেড়ে বের হল। সমস্ত সোনাগাছিতে নতুন খবর ছড়িয়ে পড়ল। সুধারানী ফিরে এসেছে। কিন্তু তাকে দেখার পর আর কারও উৎসাহ থাকল না। পুরুষরা বলতে লাগল, দ্যাখো আবার এইড্‌সের আমদানী হল কিনা। মেয়েরা বলল, আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে শুয়েছে তাই এই অবস্থা।

সুধারানী ঘর খুঁজছিল। সোনাগাছির প্রতিটি বাড়িতে সে ঘুরছিল একটি ঘরের আশায়। একটি খালি ঘর। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ির প্রতিটি ঘরেই ভাড়াটে রয়েছে। তাদের ব্যবসার দিন শেষ না হলে কেউ ঘর ছাড়বে না।

গৌরনিতাই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল পথে। গৌরনিতাই বলল, 'আহা রে, কি দশা। ঘর খুঁজছ। খোঁজ। এ বড় সমস্যা। এখানে একবার ঘর ছেড়ে গেলে আর পাওয়া মুশকিল। কম্পিটিশনের মার্কেট তো। তবে আশার কথা সোনাগাছি

তো বাড়ছে। কোথাও না কোথাও পেয়ে যেতেও পার। যদ্দিন না পাও, অনেকদিনের চেনাশোনা তো, তাই বলি, যদ্দিন না পাও তদ্দিন আমার চেম্বারের রকে রাতে শুতে পার।' তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'সুরবালার সম্পত্তি তো মিত্তির হাতিয়ে নিয়েছে। কিছু দেবে বলল?'

সুধারানী নির্বাক। গৌরনিতাই ডাক্তার নিজের মনে বলল, 'আর দেয়! দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও ঘর খোঁজ।'

সুধারানী দাসী সোনাগাছির বাড়িতে বাড়িতে ঘুরছে একটা ঘরের আশায়। সে ঘর খুঁজছে। নিজের।

নবীন সন্ন্যাসী

তিন দিন তিন রাত্রি সে নিদ্রাহীন। এমন কি এই স্থান ত্যাগ করতেও সাহসী হচ্ছে না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নির্বাপণের জন্যে যে পানীয় এবং খাদ্য-দ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল তাও শেষ। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যে কয়েক মুহূর্ত চোখের আড়ালে যেতে হয়েছে তাতেই শঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনেই প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সজাগ থাকতে হচ্ছে। কারণ এই অরণ্যে হিংস্র জীবের অভাব নেই। সেই মাংসাশীরা পিতৃদেবের চৈতন্যরহিত দেহটির প্রতি নিরাসক্ত হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

আসনে চক্ষু বন্ধ এবং মেরুদণ্ড ঋজু রেখে আরাধনার নাম যদি সাধনা হয় তাহলে পিতৃদেব তাতে সিদ্ধ। প্রতিটি প্রত্যুষে এবং সায়াহ্নে হোমযজ্ঞ এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পিতৃদেব নিজেকে নির্মল করেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁকে সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক ত্যাগ করে এইভাবে স্থির হতে হয়। অস্থিসাব ওই শরীর এই সময় তৃষ্ণা এবং ক্ষুধামুক্ত থাকে। এবং সাধনার অন্তে পিতৃদেব অসহায়ের মত কিছুক্ষণ ক্রন্দন করেন। এই ক্রন্দন কি কারণে তা শুধাবার সাহস তার হয়নি। অবশ্য সে জেনে নিয়েছে যাঁর সন্ধানে এই সাধনা তাঁর দর্শন না পাওয়ার হতাশা পিতৃদেবকে ব্যাকুল করছে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তিনি কখনও চৈতন্যরহিত থাকেননি।

অস্থিসার স্থির শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ সে শঙ্কিত হয়ে পড়ছিল। কোথাও সামান্য কম্পন নেই। কোটরাগত চক্ষু বন্ধ, অধর স্থির। ওই দেহ যদি বল্কলের মত মাটিতে ঝরে পড়ে তাহলে ? তৎক্ষণাৎ সে শিহরিত হল। পিতৃদেব তার সখা, সঙ্গী, একমাত্র আশ্রয়স্থল। বিশ্বচরাচরে সে অন্য কোন মানুষের অস্তিত্ব জানে না। আতঙ্কিত স্বরে সে উচ্চারণ করল, 'পিতা!' কিন্তু ওই নিঃসাড় দেহে কোনরকম প্রতিক্রিয়া ঘটল না। আসনে উপবিষ্ট হবার সময় পিতৃদেবের আদেশ ছিল যেন কোন অবস্থায় তাঁকে বিব্রত না করা হয়। তাঁর আদেশ পালনই যখন জীবনের একমাত্র ব্রত তখন তার এই সময় স্থির হয়ে থাকাই উচিত। কিন্তু শঙ্কা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেবতাদের সঙ্গে পিতৃদেবের যদি সাক্ষাৎ হয়ে যায় এবং তাঁরা যদি তাঁকে অমরাবতীর দ্বার খুলে দেন তাহলে সে একা এই গভীর অরণ্যে কিভাবে থাকবে ?

সে উঠল। এখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু এই অরণ্যে সূর্যদেব ক্রুদ্ধ হবার সুযোগ পান না। নানারকম গাছ সুফলা হওয়ায় খাদ্যের অভাব ঘটে না। যখন ফল স্বাদ হারায় তখন মাটি খুঁড়ে মূল বের করে নিতে হয়। এই দীর্ঘ অরণ্যের একপাশে অভ্রংলিহ পর্বত, অন্যদিকে সুগভীর আদিগন্ত জলধারা। ওই ধারায় হাঙরের বিচরণ স্বচ্ছন্দ। পর্বত-সানুদেশে হিংস্র জন্তুদের অবাধ আনাগোনা। যদিও কোন অলৌকিক কারণে তারা পিতৃদেবের আশ্রম পরিহার করে চলে। বোধ জাগ্রত হওয়ার পর থেকেই সে এই পরিবেশে মানুষ হচ্ছে। মানুষ শব্দটি তার কাছে

বিচিত্র বলে মনে হয়। পিতৃদেবের দিকে তাকালে যে মানুষের চেহারা চোখে আসে তার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য বড় কম। হ্যাঁ, তাদের শরীরের আকৃতি এবং গঠন এক। কিন্তু নিজের দেহে হাত দিলে যে চাঞ্চল্য আসে, ভরাট ফলের মত মোলায়েম অথচ শালবৃক্ষেব মত বলিষ্ঠ অনুভূতি জাগে, পিতৃদেবের শরীরস্পর্শে তার বিপরীত বোধ আসে। স্থির জলে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে। পেশিবহুল, দীর্ঘদেহ, কালবৈশাখীর মেঘের রঙ ছিনিয়ে নেওয়া কেশ লুটিয়ে থাকে কাঁধের ওপর। কাকভোরের আঁধার মাখা শ্মশ্রু জড়িয়ে আছে তার সুবিন্যস্ত মুখমণ্ডলে। সুপক্ক শ্রীফলের রঙের সঙ্গে তার চামড়ার কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পিতৃদেবের কুঞ্চিত চামড়ায় এখন গাঢ় ছায়া। তাঁর শ্বেত কেশ জটায় আবদ্ধ। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর পিতৃদেব তাকে কখনও দেননি তা হল যদি দু'জনেই মানুষ তবে কেন তার ললাটের উপরিভাগে ক্ষুদ্র শৃঙ্গ এবং পিতৃদেবের ললাটে তার চিহ্ন নেই ? শরীর বৃদ্ধি পায় কিন্তু তার শৃঙ্গটি একই থেকে গেছে দীর্ঘকাল। কেশরাজি সম্মুখে চলে এলে ওই শৃঙ্গ আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইদানীং তার একটি অভ্যেস তৈরি হয়েছে। কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হলেই বাম হাত ওই শৃঙ্গের ওপর ন্যস্ত হয়। সম্ভবত সেই ঘর্ষণেই শৃঙ্গটি এখন অত্যন্ত মসৃণ।

দুটি বৃক্ষের শরীর এক নয়, ফলও বিভিন্ন। কারণ বৃক্ষ দুটি আলাদা জাতের। দুটি পাখির চেহারা আলাদা হতে পারে যদি তারা ভিন্ন শ্রেণীর হয়। দুটি মানুষের চেহারা কি সেই কারণেই দুরকম ? কিন্তু শার্দুলের সন্তান তো শার্দুলের মতই দেখতে হয়। তাহলে পিতৃদেব এবং তার মধ্যে এই পার্থক্য কেন ? প্রশ্নটি সে করেছিল পিতৃদেবকে। তিনি বলেছিলেন, 'জীবন বড় রহস্যময়। সেই রহস্য-সন্ধানে উত্তেজনা আছে কিন্তু পরিণতি যে সর্বদা আনন্দজনক হবে এমন কথা বলা যায় না। অতএব বৎস, নির্মোহ হও। যা তোমাকে উত্তেজিত করবে তা সযত্নে পরিহার কর। চিত্ত শান্ত না কবলে তা শুদ্ধ হয় না।'

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের পর সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে যে সব সময়ের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে তার জীবনধারা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হতে বাধ্য। তার গ্রহণ করার ক্ষমতা পিতৃদেবকেও মুগ্ধ করেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ এখন তার আয়ত্তে। প্রত্যুষ এবং সায়াহ্নে প্রতিদিন তাকে পিতৃদেবের সঙ্গী হিসেবে আরাধনায় নিয়োজিত হতে হয়। দেহ স্থির রেখে চিন্তা একমুখী করে জাগতিক সুখ-দুঃখের বাইরে শরীবকে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় তার পটুত্ব এসেছে। কিন্তু তা সাধনার প্রথম স্তর, কয়েক লক্ষ যোজন অনন্ত শূন্যে পরিভ্রমণ করার ক্ষমতা তার এখনও আসেনি। সেই অনন্তে অজস্র স্তর রয়েছে। সেই স্তর অতিক্রম করতে গেলে দীর্ঘ দিনের সাধনা প্রয়োজন। তার শিক্ষা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। প্রথম স্তর অতিক্রম করতেই এক ধরনের অসহায়তা বোধের শিকার হয় সে। কিন্তু পিতৃদেব তাকে উৎসাহিত করেন। জলধারায় সন্তরণে পটুত্বের জন্যে যেমন নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজন তেমনি এই সব স্তর অতিক্রম করতে গেলে চিত্তশুদ্ধির দরকার। সে জেনেছে ওই পথেই দেবতার সান্নিধ্য। পিতৃদেব সম্ভবত এখন তাঁদের কাছাকাছি।

কাছাকাছি যাওয়া মন্দ নয় কিন্তু যদি এই মুহূর্তে অমরাবতীর দ্বার পিতৃদেবের জন্যে মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ? সে ঠিক স্থির হতে পারছিল না কি করা যায় ?

সে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পিতৃদেবকে অবলোকন করল। এই সময় পদশব্দে সচকিত হতেই কুরঙ্গীটি এগিয়ে এল। বয়োতীতা এই কুরঙ্গীটি সচরাচর আশ্রমের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। সম্ভবত জরার কারণেই সে যূথচারিণী নয়। এই অরণ্যের অন্যান্য কুরঙ্গ-কুরঙ্গীদের সঙ্গে একে কখনও বিচরণ করতে দেখা যায় না। কুরঙ্গী একবার তার দিকে তাকাল অন্যবার পিতৃদেবের দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একেবারে আসনের সামনে পা-মুড়ে বসে পড়ল। সে দূরে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারছিল কুরঙ্গী একদৃষ্টে পিতৃদেবের মুখদর্শন করছে। দৃশ্যটি বড় অদ্ভুত। এবং তখনই তার মনে হল দেবতাকাঙ্ক্ষা মানুষকে অবশ্যই স্বার্থপর করে তোলে।

এই নির্জন অরণ্যে পিতৃদেব একাকী শুধু দেবতার সান্নিধ্য পাওয়ার অনুশীলন করে চলেছেন। এবং এই পথে তিনি এত স্থির যে অন্য কোন দিকে মনোনিবেশের প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ পিতৃদেব তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন জীবেব ধর্ম হল সেবা করা। আতুরকে রক্ষা করা, দুর্বলকে সাহায্য করা। যতদিন না চিত্ত স্বার্থহীন হয় ততদিন তার সঙ্গে পশুর কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু এই যে একাকী দেবতাকে প্রার্থনা কবা, তাঁর কাছে পৌঁছাবার জন্যে জগৎসংসার এমন কি পুত্রকে বিস্মবিত হওয়া, এ কি স্বার্থপবতাব নিদর্শন নয়? পিতৃদেব কি নিজের অজান্তেই দিবাবাত্র শুধু স্ব-প্রযোজনে ঈশ্বরারাধনা করে স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছেন না! পরিণামে তিনি যখন দেবতার দর্শন পাবেন তখন তো দেবতা তাঁকে এই অপরাধের জন্যে ত্যাগ করতে পারেন! হঠাৎ তার মনে হল উপযুক্ত পুত্র হিসেবে তাব উচিত পিতৃদেবকে সাহায্য কবা। উপদেশের সময় পিতৃদেব বলে থাকেন যৌবনে উপনীত হলে পুত্র পিতার মিত্র হয়ে যায়। এবং সেই হল প্রকৃত মিত্র যে সর্বদা সৎ পথে চালিত কবে। সে ব্যগ্র কণ্ঠে উচ্চাবণ করল, 'পিতা!' কুরঙ্গী মুখ ফেরাল, তার দৃষ্টিতে বিস্ময়, পিতৃদেব একই ভঙ্গিতে উপবিষ্ট থাকলেন।

সে দ্রুত নিকটে এল। তার মনে হচ্ছিল, পিতৃদেবের এত পরিশ্রম সব বিফলে যাবে যদি সে সাহায্য না করে। দেবতাবা নিশ্চযই অবিবেচক নন। এই নির্জন অরণ্যে তাকে একা রেখে স্ব-প্রয়োজনে পিতৃদেবেব এই সাধনাকে তাঁবা নিশ্চয়ই স্বার্থান্বেষণ বলে মনে করবেন। অতএব ফল বিপরীত ঘটতে পাবে। সে নতজানু হয়ে বসে আবার প্রার্থনার ভঙ্গিতে উচ্চারণ কবল, 'পিতৃদেব, আপনি ক্ষান্তি দিন। দয়া করে আর স্বার্থপর হবেন না। ভগবান দয়াময় কিন্তু স্বার্থপরদের সঙ্গ দেন না, এ কথা তো আপনারই। পিতা-পিতা!'

কিন্তু প্রস্তরবৎ শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া এল না। সে অসহায়েব মত কুরঙ্গীর দিকে তাকাল। কুরঙ্গীব দৃষ্টিতে কি সমর্থন ছিল? এই প্রাণী তাদের সাধারণ কথাবার্তা বুঝতে পারে। কিন্তু তার উদ্বেগের সঙ্গী হবে এমন আশা করতে পারে না। কিঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ হয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত কবল। সমস্ত চৈতন্য একত্রিত করে ললাটের মধ্যদেশে নিয়োগ করতেই ধীরে ধীরে এক অনন্ত অসীম তার সামনে প্রতিভাত হল। সেই মুহূর্তে নিজেকে অসহায় বালকের মত মনে হচ্ছিল তার। কারণ ইন্দ্রিয়াতীত আলোকিত স্তরে সে অনেক ঋষির দর্শন পাচ্ছিল। ওই সব ঋষিরা সবাই ঊর্ধ্বগামী হওযার জন্যে ব্যাকুল। স্তরাতিক্রমের সাধনায় তাঁদেব

অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করার অবকাশ নেই। প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে কাতর স্বরে আবেদন করতে লাগল, 'হে পিতা, হে কশ্যপতনয়, আপনি প্রত্যাগমন করুন।'

অকস্মাৎ একটি আলোকসূত্র তার স্বরের বিকল্প হয়ে উর্ধ্বগামী হয়ে গেল। দৃশ্যটি দর্শনমাত্র সে ভীত হল। এবং যেহেতু ওই শূন্যস্তরে বিচরণের দক্ষতা তার সীমিত, তাই দ্রুত স্বদেহে প্রত্যাগমন করল। এক ধরনের ক্লান্তি এবং তৃপ্তি নিয়ে তার জাগতিক চোখ মেলতেই সে কুরঙ্গীটিকে অনুভব করল। অতি স্নেহে ওই অবলা তার মস্তকে মুখ ঘষছে। এতদিনে সে জেনেছে আবেগ প্রকাশে এই অভিব্যক্তিটিই ওর একমাত্র সম্বল। অর্থাৎ সে যে জ্ঞানরহিত হয়েছিল এবং পুনরায় ফিরে এসেছে তাতে কুরঙ্গী খুশি হয়েছে।

এই সময় পিতৃদেবের শরীরে কম্পন এল। তাঁর জীর্ণ হাতের শীর্ণ শিরাগুলিতে যেন রক্ত চলাচল শুরু হল। হয়তো বহুদূরের স্তরে গমনের কারণেই তাঁর দেহে প্রাণের পূর্ণ প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছিল। কিন্তু পিতৃদেব ফিরে আসছেন জেনে সে পুলকিত হল। অবশ্য সে বুঝতে পারছিল না ওই আলোকসূত্র কি জিনিস এবং কেন তার শরীর থেকে নির্গত হয়ে উর্ধ্বগামী হয়েছিল। তার শুধু বোধ হচ্ছিল এই বিশাল অরণ্যে তাকে এই মুহূর্তে আর একাকী থাকতে হবে না।

ক্রমশ শরীর স্থির হল। এই কয়েক মুহূর্ত যেন কয়েক লক্ষ বৎসরের ভার বহন করছে। পিতৃদেব শেষ পর্যন্ত মুখ ফেরালেন। তাঁর ললাটের রেখাগুলো আরও গভীর হল। পুত্রের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'তুমি আমাকে ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ পিতা।' সে মাথা নত করল।

সঙ্গে সঙ্গে কুপিত হলেন পিতৃদেব। তাঁর কণ্ঠে যেন অগ্নি ঠিকরে উঠল, 'তুমি আমাকে ডেকেছ? তুমি? আমার সন্তান হয়ে সাধনায় বিঘ্ন ঘটালে?'

সে দ্রুত মুখ তুলল, 'না, পিতৃদেব, বিঘ্ন আমি স্বেচ্ছায় ঘটাতে চাইনি।' পিতৃদেব চিৎকার করলেন, 'কি সেই কারণ? যখন আমি প্রায় পারিজাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি সেই সময় তোমার আর্তি আমাকে রজ্জুর মত বন্ধন করে টেনে নিয়ে এল। যখন আমি দেবতার দর্শনের জন্যে উন্মুখ, যার জন্যে এতকাল আমি সাধনা করে এসেছি সেই পরমলগ্ন যখন উপস্থিত তখন তুমি আমাকে বাধ্য করলে প্রত্যাগমন করতে। উঃ! আমি কি মূর্খ! তোমার মত একটি মহামূর্খকে এতকাল সাধনার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি রক্ষা পাবে না। বল, কি কারণে তুমি আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটালে?'

সে বিচলিত হল। পিতৃদেবকে এমন ক্রুদ্ধ হতে কখনও দেখা যায়নি। এক সময় ওই পর্বতের রাক্ষসরা এই আশ্রমের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পিতৃদেব তখনও এমন ক্রুদ্ধ হননি। রাক্ষসদের নেতার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে নিক্ষেপ করাতেই সে ভস্মীভূত হয়েছিল। পিতৃদেব তা সত্ত্বেও অন্য রাক্ষসদের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'তোমাদের সকলের এই দশা হবে যদি আবার এখানে পদার্পণ কর।' সেই কণ্ঠে যেন আরও ভীত হয়েছিল রাক্ষসরা। তারা সেই যে ফিরে গিয়েছে পর্বতের বিপরীত দিকে আর এদিকে আসেনি।

কিন্তু এই ক্রোধ যেন তার থেকেও মারাত্মক। সে করজোড়ে নিবেদন করল, 'পিতৃদেব, আপনি শান্ত হন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'সাহায্য ? আমাকে ? হে মূঢ়, তুমি কি সাহায্য করতে পার ? কি ক্ষমতা আছে তোমার ? দর্শনের মহালগ্ন যখন উপস্থিত তখন আমার পদস্খলন ঘটিয়ে তুমি কোন সাহায্য করলে ? এই মুহূর্তেই তা ব্যক্ত কর নইলে আমার অভিশাপের জন্যে প্রস্তুত হও।'

'আমার মনে হল ভগবান আপনাকে দর্শন দিতেন না। আর দিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হতেন।'

'ঈশ্বর আমার ওপর ক্রুদ্ধ হতেন ? হায়, এ আমি কার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি কি জানো তোমার জন্মের অনেক আগে থেকে আমি জগৎপিতার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করে যাচ্ছি। অনেককাল আগে যখন আমার সাধনা প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছেছে তখন একবার বিপত্তি ঘটেছিল। তারপর বহুকাল গিয়েছে নিজেকে প্রস্তুত করতে। আজ আবার সেই একই বিঘ্ন ঘটালে তুমি। ব্যাখ্যা কর কোন কারণে তুমি এ কাজ করেছ ?'

সে সহজ স্বরে বলল, 'আমি আপনার উপদেশ পালন করেছি পিতা। আপনি বলেছেন যতদিন স্বার্থ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন দেবতা তাকে কৃপা করবেন না। আপনি তো স্বার্থহীন ছিলেন না। তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি যদি এই কারণে কুপিত হতেন তাহলে আপনার এই জীবনের সব সংকল্প বৃথা যেত।'

'কি ? আমি স্বার্থপর ? এত বড় কথা বললে তুমি ?' বিস্ময়ের আবরণ ক্রোধকে আবৃত করল। সে স্থির চিত্তে নিবেদন করল, 'হ্যাঁ, পিতা। আমার তো তাই মনে হয়। জন্মাবধি আমি আপনার স্নেহে মানুষ। আপনি আমাকে শিখিয়েছেন কি উপায়ে অরণ্য থেকে খাদ্য-সংগ্রহ করতে হয়। কি উপায়ে বৃক্ষের বল্কল আহরণ করে আচ্ছাদন তৈরি করতে হয়। হিংস্র পশুদের আপনিই চিনিয়ে দিয়েছেন। আপনিই সেই মানুষ, যিনি অবিরত উপদেশ দানে আমাকে সৎ এবং শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। এমন কি ধর্মানুষ্ঠান এবং আরাধনার পথে আপনিই আমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই বিপুল বিশ্বচরাচরে আপনি ভিন্ন অন্য কোন মানুষের রূপ আমি দর্শন করিনি এবং সেই প্রবৃত্তিও নেই।'

পিতৃদেব বিরক্ত কণ্ঠে বাধা দিলেন, 'এসব প্রশংসা পরিহার করে তথ্যে এস।'

'হ্যাঁ, পিতৃদেব, আমি সে কথাই বলছি। আমার জীবনে যেমন আপনি তেমনি আপনার আত্মীয় বলতে কেবল আমি।'

পিতৃদেব হাত তুললেন, 'কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না। তোমার স্বভাব অকারণে সময় নষ্ট করা।'

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইল। তারপর ম্লান হেসে বলল, 'বেশ। এই পুত্রের সঙ্গেই আপনি অনেক শীত-বসন্ত বর্ষা অতিক্রম করেছেন। আপনার রক্ত আমার ধমনীতে। এ কথাও জানেন যে পুত্রের জীবনে একমাত্র আশ্রয় আপনি। অথচ ব্যক্তিগত সুখের জন্যে আপনি এখন পুত্রকে ত্যাগ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন। এই কাজ কি স্বার্থপরতার নিদর্শন নয় ?'

পিতৃদেবের মুখমণ্ডলে বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তা না ক্রোধ, না বিস্ময়, না স্নেহ। তিনি কঠোর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'হে মূর্খ ! শ্রবণ কর।

জীবের জন্ম দেবতার অনুগ্রহে। তিনি তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ কবেন মুক্ত আত্মা দিয়ে। পৃথিবীতে বসবাসকালে জীব তার চতুষ্পার্শ্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেই প্রাণই সৎ, যে প্রতি মুহূর্তে সাধনার দ্বারা তাঁর কাছে পৌঁছানোর পাথেয় সংগ্রহ করে। জৈবিক নিয়মের দ্বারা পুত্র পরিবার জীবনে আসে। কিন্তু তারা সামান্য ছায়া মাত্র। তাদের ত্যাগ করায় কোন স্বার্থপরতা নেই। বরং তাঁকে ত্যাগ করে এদের আঁকড়ে ধরাই চরম স্বার্থপরতা।'

পিতৃদেবের এই সব বাক্য সে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারল না। প্রতিবাদের স্বর ফুটল তার কণ্ঠে, 'কিন্তু, আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন শুধু নিজে দেবতাব স্বাদ গ্রহণ করবেন বলে। এই আরাধনা মানেই আত্ম-সুখের কামনা। পৃথিবীর সাধকরা শুধু তাঁদের নিজের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করতেই আসনে বসেন ? তাঁদের সাধনায় অন্য কাউকে সঙ্গী করেন না ? যদি তাঁরা পরমপিতা ঈশ্বরের দর্শনও পান সেখানেও নিজের প্রাপ্তি মিটিয়ে নেওয়াই উদ্দেশ্য ? না পিতা, যদি এই উপায়ই প্রাপ্তির একমাত্র পথ হয় তাহলে তা আমার কাছে অবশ্যই স্বার্থপরতা। পিতা, আপনি আমার গুরুদেব, এ কথা উচ্চারণে স্পর্ধা নেবেন না। কারণ আপনি আমাকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'

পিতৃদেবেব অধরে সামান্য কৌতুক, 'পুত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তুমি এখনও বিচরণ করছ। সাধনার প্রকৃত অর্থ তোমাব বোধে আসেনি। সাধাবণ মানুষ, যাদের তুমি এখনও দর্শন করোনি তারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্যতে অন্ধ হয়ে থাকে। সমস্ত প্রাণ যদি তাদের অনুসরণ করে তাহলে বিশ্ব এক সময় অন্ধকারে ঢেকে যাবে, সৃষ্টি রসাতলে প্রবেশ কববে। সূর্যদেব এখনও প্রকাশিত হন, পবনদেব এখনও বিহার করেন, বরুণদেব করুণা বিতরণ কবেন কারণ কিছু মানুষ, যাদের সাধক বলা হয়, ওই চক্র থেকে নিজেদের আলাদা কবে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সাধনায় নিজেদের নিয়োগ কবেছেন। আমার এই সাধনা শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, আমার আত্মা থেকে প্রকাশিত আনন্দ সমস্ত জগতের ওপর ছড়িয়ে পডবে। সেই আনন্দের শরিক হতে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ উদ্বুদ্ধ হবে। সুন্দর উদাহরণ দেখলে অনেকেই তা অনুসরণ কবে একমাত্র তোমাব মত যুক্তিহীন মূর্খ কেবল তর্ক করে যায়। যদি তুমি আমার সান্নিধ্যে না থাকতে তাহলে যে শিক্ষা এখন অর্জন কবেছ তা থেকে বঞ্চিত হতে। আমার সাধনা-সিদ্ধির চরম মুহূর্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছ। এবং সে কারণে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।'

সে অত্যন্ত ভীত কণ্ঠে বলল, 'শাস্তি।'

'হ্যাঁ। অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেবার শিক্ষা আমার নেই। তুমি আমার কাছে এস।' পিতৃদেব হাত বাড়ালেন। সে বুঝতে পারছিল না উদ্দেশ্য। কিন্তু শরীরে একটি শীতল প্রবাহ প্রবাহিত হল। তারপরেই মনে হল শঙ্কার কিছু কাবণ নেই। পিতৃদেব যে শাস্তিই তাকে দান করুন সেটা তো তাঁরই দান। নতমস্তকে যদি সে পিতৃদেবের কাছাকাছি থাকতে পারে তাহলে আর বেশি কি কাম্য থাকতে পারে! সে এগিয়ে এল। কুরঙ্গী তার পথ ছেড়ে দিল।

পিতৃদেব বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাকে অবলম্বন করে আসন ত্যাগ করলেন। অনাহার, তৃষ্ণায় তাঁর জরাগ্রস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছিল। তিনি যেন পদযুগলে

শক্তি পাচ্ছিলেন না। সে পরম যত্নে পিতৃদেবের শীর্ণ শরীর জড়িয়ে ধরল। স্পর্শমাত্র পিতৃদেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি বক্রনেত্রে পুত্রের পেশিবহুল শরীরের দিকে তাকালেন। যৌবনের মদমত্ত দম্ভতার পাশে জরাকে যেন আরও কদর্য ঠেকল তাঁর কাছে। তিনি বললেন, 'তোমার ওই দেহকে কাল এক সময় আমার অবস্থায় নিয়ে আসবে। মূর্খ, তখন তোমার কি অবশিষ্ট থাকবে?'

সে কোন উত্তর দিল না। পিতৃদেবের শরীরে যেন কোন আঘাত না লাগে এমন যত্নে সে তাঁকে গ্রহণ করেছিল। পিতৃদেব বললেন, 'আমাকে সূর্যদেবের পদতলে নিয়ে চল।'

আশ্রমের বাইরে এই গ্রীষ্মেও কোন সময়-বিভ্রান্ত পিক একটানা ডেকে যাচ্ছে। অবশ্য যতই সূর্যদেব প্রখর হন, গ্রীষ্ম যতই উত্তাপ ছড়াক এই অরণ্যের শ্যামল চেহারার কোন পবির্তন ঘটে না। অরণ্যের যৌবন নিটোল থাকে সব ঋতুতেই। ধীরে ধীরে সে পিতৃদেবকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে নিয়ে এল। কি শাস্তি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে তা বোধগম্য হচ্ছিল না কিছুতেই।

পিতৃদেব সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সূর্যদেবের দিকে মুখ তুলেই নামিয়ে নিলেন। সম্ভবত জ্যোতি তাঁর সহ্যের বাইরে ছিল। অনেক কষ্টে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি সংগ্রহ করলেন। তারপর বললেন, 'কিঞ্চিত মধুপর্ক আনো।'

সে ত্বরিৎ গতিতে আশ্রমে প্রবেশ করল। কাঠের তৈরি পাত্রে মধুপর্ক সামান্য ঢেলে নিয়ে সে পিতৃদেবের কাছে ফিরে এল। ঘৃত মধু দধি শর্করা মেশানো ওই তরল পদার্থ প্রকৃত অর্থে বল-বর্ধক। পিতৃদেব তাকে কি উপায়ে গাভীর দুগ্ধ থেকে ঘৃত উৎপাদন করতে হয় শিখিয়েছেন। ওই একই দুগ্ধ দধিতে রূপান্তর করার কৌশল তার জানা। মধু তো সমস্ত অরণ্যে ছড়ানো। শুকনো জিভের ওপরে পাঁচফোঁটা মধুপর্ক গ্রহণ করলেন পিতৃদেব। তারপর চক্ষু বন্ধ করে সমস্ত শরীরে তার স্বাদ এবং শক্তি ছড়িয়ে দিলেন। সে অবাক চোখে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পিতৃদেব বললেন, 'পুত্র। এইবার তুমি অভিশাপ প্রার্থনা কর।'

সে চমকে উঠল। এতদিন পিতৃদেবের মুখে যেসব কাহিনী সে শুনেছে তাতে দেবতা কিংবা ঋষিরা সব সময় বর প্রার্থনা করতে বলেছেন। অভিশাপ দেবার সময় কেউ কোন সুযোগ দেননি। অভিশাপ কি প্রার্থনার বিষয়? কিন্তু সে তর্কে প্রবেশ করল না। বরং স্মিত কণ্ঠে নিবেদন করল, 'আপনি তো আমার অন্তর জানেন। আমার প্রার্থনার পরিধিও আপনার অজানা নয়। দায়িত্ব আপনিই গ্রহণ করুন।'

'কথায় প্রহেলিকা সৃষ্টি করো না। আবার বলছি, অভিশাপ প্রার্থনা কর।'

'বেশ।' সে এক মুহূর্ত চিন্তা করল, 'আপনি বলতেন পৃথিবীর জাগতিক দুঃখ জানতে চেও না। তা জানা বেদনাদায়ক। কিন্তু আমি সেই দুঃখের সম্যক রূপ জানতে চাই। পিতা, আপনার কাছে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা আপনি সেই পথে আমাকে পরিচালিত করুন।'

পিতৃদেব যেন বজ্রাহত। তাঁর মুখে বাক্য স্ফুরিত হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পুত্রের দিকে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে নিজেকে সংবরণ করলেন, 'এই প্রার্থনা প্রত্যাহার কর। তুমি নির্বোধ। কোনদিন মনুষ্য সমাজের সান্নিধ্যে যাওনি। দুঃখ কি জিনিস

তা জানা থাকলে এই প্রার্থনা করতে না। নরকবাসও অধিকতর সুখ-দায়ক। আমি তোমাকে শেষবার সুযোগ দিচ্ছি।'

সে হাসল, 'পিতা, দুঃখ কি সত্যি আমি জানতাম না। এতকাল আপনার স্নেহ তা আমাকে জানতে দেয়নি। কিন্তু আজ আপনার সাধনাকালে আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলাম আমার কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে হচ্ছিল। এই বোধ আমার হৃদয় ব্যথিত করে তুলেছে। আমি এখনও মনে করি একাকী দেবারাধনা স্বার্থপরতারই নামান্তর। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নিষ্ঠুর হয়েছেন আপনি। এই নিষ্ঠুরতা আমাকে ব্যথিত করেছে। আমি জানি না জাগতিক দুঃখ এর থেকে কত পীড়াদায়ক। যদি এই বেদনা আমাকে সহ্য করতে হয় তাহলে আর কিছুতেই আমি ভীত নই। আপনি শান্তিতে অভিশাপ দান করুন।'

পিতৃদেবের অধর কম্পিত হল। এখনও মধুপর্কের চিহ্ন সেখানে লিপ্ত। তিনি গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তথাস্তু।'

অভিশাপ বর্ষিত হল অথচ অরণ্যে স্তব্ধতা এল না। পাখির কাকলি, বাতাস এবং পাতার সখ্য একই ছন্দে ছন্দিত হচ্ছিল। এমন কি একটি জীর্ণ পাতাও ঝরে পড়ল না মাটিতে। এ কেমন অভিশাপ, যেখানে প্রকৃতি স্থির থাকে? পিতৃদেবের বিশ্রামের আয়োজন করে দিয়ে সে অরণ্যে পা ফেলে এই সব ভাবছিল। দুঃখ কি? তার প্রকৃষ্ট রূপ কি? কতটা গভীর? পিতৃদেবের আশীর্বাদধন্য সে দুঃখের স্বরূপ জ্ঞাত হবার পর প্রকৃত সাধনা শুরু করবে। সেই সাধন-পথের প্রান্তে যদি ঈশ্বর অধিষ্ঠান করেন তখন মুখোমুখি তাঁকে সে কিছু প্রশ্ন করতে পারে। ঈশ্বর দয়াময়, বিশ্বের সর্ব বিষয় তাঁর নখাগ্রে। তিনি তার প্রশ্নের কি উত্তর দেন সেইটেই কৌতূহলের বিষয় হবে।

পশ্চাতে পদশব্দ শুনে সে মুখ ফেরাতে কুরঙ্গীটিকে দেখতে পেল। স্থবির চরণে কুরঙ্গী তাকে অনুসরণ করছে। তার মনে হল প্রাণীটির মুখে বিষাদের ছায়া নেমেছে। চোখে বাষ্প। সে নতজানু হয়ে ওর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলেই কুরঙ্গী স্থির হল। সে নিজের মনে উচ্চারণ করল, 'দুঃখ কি তুই জানিস? জানিস না। জানবি কি করে? সারা জীবন তো এই আশ্রমের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ঘাস খাস! সুখ জানিস খুব, এই যে আমি জড়িয়ে ধরেছি তোকে, বেশ সুখ হচ্ছে না? কিন্তু পিতৃদেব থাকছেন আমাদের সঙ্গে। এই যে সাধনায় বিঘ্ন ঘটল, আমাকে অভিশাপ দিলেন সেই কারণে বেশ কিছুকাল লাগবে তাঁর মনঃসংযোগ করতে। ততদিন আমরা সবাই আগের মত থাকব। কিন্তু তুই কি বল তো? সব সময় আমার পিছু নিস কেন?'

কুরঙ্গী তখনও স্থির। সে উঠল। তারপর ঝরনা থেকে জল সংগ্রহ করে ফিরে আসার পথে সেই গাছের নিচে এল যেখানে পিক ডেকে চলেছে সমানে। সে মুখ তুলে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাখির উদ্দেশে ধমক দিল, 'আঃ, এখন বসন্ত নয়। গ্রীষ্মে তোমার কণ্ঠ হতে এই সুখ কেন?' পিক কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হল, তারপর আবার নিজের মনে ডেকে চলল।

সারাদিন পিতৃদেব বিশ্রাম নিলেন। আশ্রমের সমস্ত কাজ সে একাই সম্পন্ন করল। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে পিতৃদেব যখন তাকে আহ্বান করলেন তখন অরণ্যের অন্ধকারে নিশ্চিত দুধ-রঙ মিশছে। সে উপবেশন করলে পিতৃদেব

বললেন, 'বৎস, তোমাকে আমার কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এতকাল আমি সঙ্গী থাকায় এসব বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু তোমার অভিশাপের কাল শুরু হওয়ায় পিতা হিসেবে আমার কর্তব্য করা উচিত। এই বিশ্বচরাচরে তুমি এবং আমি ছাড়া অন্য মানুষ বিবাজ কবছে তা তুমি জানো।'

'হ্যাঁ জানি। আপনিই বলেছেন ঋষি এবং পাতক এই পৃথিবীতে রয়েছে।'

'তুমি জ্ঞানচক্ষু উন্মেষের পর তাদের দর্শন করনি কেন?'

'তারা কেউ এই অরণ্যে প্রবেশ করেননি। যেহেতু অরণ্যের এক প্রান্তে গগনচুম্বী পর্বত এবং অন্য প্রান্তে বিশাল জলধারা, যা অধিকার করে আছে হিংস্র জলচরেরা, তাই বহির্জগতে প্রবেশে আমাদের কখনও আগ্রহ হয়নি। কিন্তু পিতা, আজ আপনার অভিশাপের পরে কেন জানি না সেই আগ্রহ আমার হৃদয়ে বর্ধিত হচ্ছে।'

পিতৃদেব নীরবে মস্তক আন্দোলন করলেন, 'স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত প্রকৃতি যতই নির্মম হোক, যত অলঙ্ঘনীয় হোক, মানুষ তা চেষ্টার দ্বারা অতিক্রমে সক্ষম। আমি চাইনি তুমি তৃতীয় মানুষের মুখ দর্শন কর। কারণ মানুষের সান্নিধ্য সব সময় অমঙ্গল আহ্বান করে। অভিশাপের ভার বহন সহজ হবে যদি তুমি, সেই আদেশ পালন কর। কখনই এই অরণ্যের বাইরে পা দিও না। কখনই কোন মানুষের সান্নিধ্যে এস না।'

সে চিন্তিত হল, 'কিন্তু পিতা, আপনিও তো মানুষ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমার পিতা। তাছাড়া তোমার ললাটের ওপরে যে শৃঙ্গ রয়েছে, তা সাধারণ মানুষের কৌতূহলের বিষয় হবে। অনাবশ্যক কৌতূহল মানুষের উপকারে আসে না।' পিতৃদেবের কণ্ঠস্বরে এবার ক্লান্তির লক্ষণ ফুটল।

'কিন্তু পিতা, সমস্ত মানুষের, এমন কি আপনার ললাটের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নেই কেন? কেন এই ক্ষুদ্র শৃঙ্গ আমাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে?'

'ওই শৃঙ্গ কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে?'

'না। বরং যখন দ্বিধাগ্রস্ত হই তখন ওই শৃঙ্গে হাত রাখলে চিন্তা সুস্থির হয়।

'তাহলে আর এ নিয়ে প্রশ্ন কর না। দেবতারা তোমাকে বিশেষ কৃপা করেছেন জন্মকালে বলেই ধরে নাও। রাত্রি-জাগরণের আর প্রয়োজন নেই। যাও, শয়ন কর।'

সে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। তার হাত শৃঙ্গের ওপব ন্যস্ত হল। পিতৃদেব প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'হ্যাঁ। বৃক্ষ থেকে বৃক্ষ জন্ম গ্রহণ করে। পুষ্পরেণু ভ্রমর অন্য পুষ্পে প্রদান করলে নতুন প্রাণ আসে। কুরঙ্গ শিশু নির্গত হয় তার মায়ের শরীর থেকে। পাখিরা সযত্নে ডিমে উত্তাপ দিয়ে শাবকদের বাইরে নিয়ে আসে। একদা আপনি বলেছিলেন যে লোকালয়ে বাস করতে না চেয়ে এই অরণ্যে চলে এসেছিলেন। কিন্তু আমি জন্মেছি এই অরণ্যে। আমার জন্ম কি কারণে ও উপায়ে ঘটল তা আমাকে ব্যক্ত করুন।' তার চোখ পিতৃদেবের মুখে স্থির হল। সে দেখল পিতৃদেব বিচলিত হচ্ছেন। তারপর তিনি বললেন, 'বৎস, অভিশাপের প্রতিক্রিয়া তোমার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে তুমি অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করতে লালায়িত হচ্ছ। জেনে রেখ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

তাঁবই আনন্দদাযিকা এক নর্তকী তোমার জন্মেব কারণ।'

'নর্তকী ? তিনি কিবকম দেখতে ? তিনি কি মানুষ ?'

'না। তিনি মানুষ নন, দেবতাও নন। এই পর্যন্ত জেনে রাখাই ভাল। মানুষেব জন্ম তাব অস্তিত্বেব প্রকাশে কোন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ কবে না। কর্মই তার জীবনেব প্রতীক। কর্মই তার জীবনেব ফলাফল নির্ধারণ করে। তোমাব প্রতি শেষ নির্দেশ, অনাবশ্যক কৌতূহলী হযো না। এই অবণ্য ত্যাগ কবো না। মানুষেব নানারকম চেহারা আছে। আমি ভিন্ন অন্য কোন চেহাবার মানুষের সান্নিধ্য এড়িযে যেও। আব নয, আমি ক্লান্ত। আমাকে আগামী প্রত্যূষ থেকে আবার সাধনায মগ্ন হতে হবে। যাও, শয়ন কব।'

এখন নিশুতি বাত। অথচ তার চোখে নিদ্রা নেই। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে তার কোনকালে শত্রুতা ছিল না। বস্তুত শযনমাত্র নিদ্রিত হওযাই তাব স্বভাবও ছিল। কিন্তু আজ যেন শবীরে অত্যন্ত অস্বস্তি এবং সেটা কোন শারীরিক কারণে নয। কিছুতেই চিন্তামুক্ত হতে পাবছে না সে। এবং এই সব ভাবনার কোন বিশেষ খাত নেই, নির্দিষ্ট চেহারা নেই। বিশেষ তৃণে নির্মিত শয্যা ত্যাগ করে সে উঠে বসল। মধ্যরাতে চন্দ্রদেব উদিত হয়েছেন। অরণ্যে হালকা সরের মত জ্যোছনা বিছানো। কি মায়াময়, কি অদ্ভুত ! সে মুগ্ধ নেত্রে দেখছিল চারপাশ। সেই সঙ্গে বুকের ভেতরে একটা চাপ অনুভব করল। এই চাপ কি কারণে তা তার জানা নেই।

দূরে শৃগালেবা সমস্বরে কোলাহল কবে উঠল। একটি রাত জাগা পাখি কর্কশ স্বরে ডেকে কাছেব গাছ থেকে ডানায শব্দ কবে উড়ে গেল। রাতে অবণ্যে বিচিত্র শব্দ হয। পিতৃদেব তাকে বাল্যকালে উপদেশ দিযেছিলেন সূর্যাস্তেব পব অপ্রযোজনে অবণ্যে যেন ভ্রমণ না করে। এমন কি পূর্ণিমা বাত্রেও নয়। সূর্যালোক হৃদয় সবল কবে, অন্ধকাব কুটিলতা আনে, জ্যোৎস্না প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। কিন্তু আজ তাব খুব ইচ্ছে করছিল জ্যোৎস্নায় পদচারণা কবতে। দিনের পরিচিত দৃশ্যাবলী জ্যোৎস্নায কেমন অচেনা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন নতুন জগতে প্রবেশ করতে হবে। সে ধীবে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল।

তিনদিন তিনরাত পিতৃদেবের জন্যে তাকে জেগে থাকতে হয়েছে। সারাদিন শরীরে ক্লান্তি ছিল সঙ্গত কাবণেই। কিন্তু এখন সেসব উধাও। সে তার ক্ষুদ্র শৃঙ্গে হাত বোলাল। তার কেশবাজি ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। শৃঙ্গটিকে স্বচ্ছন্দে কেশের আড়ালে রাখা যায। শৃঙ্গে হাত বোলানো মাত্র চিত্ত কিছুটা স্থির হল। এবং তখনই তার মনে পড়ল পিতৃদেবের বাক্যানুযায়ী মানুষের শৃঙ্গ নেই, তার আছে। কেন ? এই শৃঙ্গ তো কুরঙ্গের মত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এই অপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র বস্তুটি ঈশ্বর তাকে কেন দিলেন ? পিতৃদেবকে প্রশ্ন করলে তিনি সুকৌশলে তা এড়িয়ে যান। প্রতিদিন তাকে আরাধনায় বসতে হয়। যদি কখনও সে ঈশ্বরের দর্শন পায় তা হলে সরাসরি তাঁকেই প্রশ্নটি করবে।

পদচারণা করতে করতে সে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিল। এইসময় চাপা এবং গম্ভীব হুঙ্কার তার কানে এল। সে চমকে একটি পিপুল গাছের নিচে তাকাতে বিশাল শার্দুলটিকে দেখতে পেল। আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় ওই রকম

শব্দ শার্দুলেরা করে থাকে। সে আশঙ্কার কারণ দেখতে পেল। দুটি ক্ষুদ্র শাবক পরমানন্দে শার্দুলটির দুগ্ধ পান করছে। শার্দুলটি তাকে পর্যবেক্ষণ করছে, কিন্তু শাবকদের বাধাও দিচ্ছে না। শাবকগুলোব দুগ্ধপানের উল্লাস, শার্দুলটির স্নেহের ভঙ্গি দেখে তার স্মৃতিতে এরকম অনেক দৃশ্য মনে পড়ল। যে কোন সন্তান শৈশবে পিতার চেয়ে মাতার কাছে থাকাই পছন্দ করে। কারণ মাতা তাকে স্নেহ দেয়। কোন শার্দুলকে সে দুগ্ধবান হতে দেখেনি। কোন কুরঙ্গকে সে কুরঙ্গীর ভূমিকা নিতে লক্ষ করেনি। অর্থাৎ প্রাণীদের প্রতিটি শ্রেণীতে যে দুই ভাগ আছে আকাবগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এক ভাগই সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে যে তাকে গর্ভে বহন করে। তা হলে কে তাকে জন্ম দিয়েছে। কে তাকে দুগ্ধপান করিয়েছে?

ঈশ্বরের আনন্দদায়িকা কোন নর্তকী যদি তার জন্মের কারণ হন তা হলে তিনি কে? কি নাম? কেন তিনি তাকে ত্যাগ করেছেন? তিনি কি তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন? তিনি দেখতে কি রকম? এই সব প্রশ্ন তার হৃদয় আলোড়িত করতে লাগল। এবং সেই সঙ্গে অদেখাকে দেখার জন্যে হৃদয় আকুল হয়ে উঠল। সে উন্মাদের মত আশ্রমে ফিরে এল।

তখন চন্দ্রদেব অরণ্যের আড়ালে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। পিতৃদেবের কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করল। তার হৃদয়ের যে হাহাকার ক্রমশ প্রবল হচ্ছে এর নাম কি দুঃখ? জন্মাবধি তো কখনও এমন হয়নি। পিতৃদেবের অভিশাপ যে সক্রিয় হয়েছে তা বুঝতে বিলম্ব হল না। হোক কষ্ট, কিন্তু তাকে উত্তর জানতেই হবে। এবং উত্তর জানার পরে যদি নতুন কোন কষ্টের উদয় হয় তার স্বাদ সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সে ধীরে ধীরে কক্ষের দ্বারে আঘাত করল। স্থানকালপাত্র এখন সে বিস্মরিত।

পিতৃদেবের নিদ্রা এত গভীর নয় যে শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। সে দ্বিতীয়বার শব্দ করার পর আর অপেক্ষা করল না। দ্বারে চাপ দিতেই তা উন্মুক্ত হল। সে প্রায়-অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে যতটা সম্ভব বিনীত স্বরে বলল, 'পিতা! পিতা, এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত না করে পারছি না। আমার হৃদয় কেবলই উত্তোলিত হচ্ছে একটি প্রশ্ন জানবার জন্যে, আমি কিভাবে জন্মগ্রহণ করেছি? যিনি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন তিনি কোন অপরাধে চলে গিয়েছেন? একমাত্র আপনিই এই সব তথ্য জানেন। পিতা, আমাকে শান্তি দিন।'

দৃষ্টি তখনও স্বচ্ছ হয়নি। কিন্তু পিতৃদেবের কোন সাড়া পেল না সে। আরও কয়েক পা এগিয়ে সে বাস্তবের মুখোমুখি হল। পিতৃদেব কক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এল সে। এই রাতে পিতৃদেব কোথায় যেতে পাবেন? প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যদি কক্ষ ত্যাগ করেন তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। সে কিছুক্ষণ অধীর অপেক্ষা করল। কিন্তু কোথাও পিতৃদেবের অস্তিত্ব নেই। তার নজরে পড়ল কুরঙ্গীটি আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। সে দ্রুত পায়ে কুরঙ্গীর কাছে পৌঁছে প্রশ্ন করল, 'পিতৃদেব কোথায় গিয়েছেন?'

একবার শরীর বাঁকাল প্রাণীটি তার পর মুখ ফিরিয়ে উত্তরে তাকাল। উত্তরের অরণ্য বেশি গভীর নয়, কারণ তার শেষেই পর্বতের শুরু। তার মনে হল

কুরঙ্গীটি তাকে ওই দিকই নির্দেশ করছে। সে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'পিতা ! পিতা আপনি কোথায় ?' সেই আর্ত কণ্ঠস্বর পর্বতে আঘাত পেয়ে প্রতিধ্বনিত হল। এবং সেই শব্দে সমস্ত অরণ্য যেন জেগে উঠল। পাখিরা চমকে ডাকাডাকি করতে লাগল নীড়ে নীড়ে, শৃগালেরা থমকে গিয়ে আরো জোরে ডাকতে লাগল। অরণ্যের অনেক প্রাণী বিরক্ত হয়ে বিচিত্র ধ্বনি তুলতে লাগল। উন্মাদের মত সে উত্তর দিকে ছুটল। তার সঙ্গ নিয়েছে সেই বৃদ্ধা কুরঙ্গী। যেতে যেতে সে কেবলই পিতৃদেবকে আহ্বান করে যাচ্ছিল।

প্রতিটি ডাকের সঙ্গে তার হৃদয়ে মেঘ জমছিল। অভিমান ক্রমশ আতঙ্কের চেহারা নিচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে সে পর্বতের সানুদেশে পৌঁছে স্থির হয়ে গেল। পিতৃদেবের পাদুকা এখানে পড়ে আছে। তিনি অবশ্যই এই স্থান থেকেই পর্বতে আরোহণ করেছেন। সে মুখ তুলে গগনচুম্বী পর্বতের দিকে তাকাল। পর্বতের শরীরে অজস্র গুহা, ঝরনা, অরণ্য এবং রাক্ষস বিচরণ করে। ওই দুর্গম এবং বিপদজনক পর্বতের কোনখানে পিতৃদেব যদি গোপনে অবস্থান করেন তবে কারো ক্ষমতা নেই যে তাঁকে খুঁজে বের করবে। সে অসহায় কণ্ঠে চিৎকার করে পিতৃদেবকে ডাকতে ডাকতে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পিতৃদেব তাকে ত্যাগ করেছেন। সে অন্যায় করেছিল যদি তবে তার জন্যে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এই চরম শাস্তি কেন ? তার মনে দ্বিতীয় চিন্তার উদয় হল। পিতৃদেব হয়তো তাকে পরীক্ষা করছেন। হয়তো তার নিষেধ অমান্য করে অরণ্যে রাত্রে ভ্রমণ করার জন্যে তিনি রুষ্ট হয়ে নিজে আড়ালে থেকে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। সে নতুন উদ্যমে সমস্ত অরণ্যে পিতৃদেবের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু এই বিশাল বনরাজি কোন মানুষের পক্ষে পরিভ্রমণ অসম্ভব। সন্ধান বিফল হতে শুরু করায় তার দেহ কম্পিত হতে লাগল। শরীরের সমস্ত রোমকূপ স্ফীত হল। বুকের ভেতর চৈত্রের আকাশ কিন্তু অকস্মাৎ দু চোখ থেকে আষাঢ়ের ধারা নামল। সে স্তব্ধ হয়ে মুখে হাত রাখল। এই উষ্ণ অশ্রুধারার সঙ্গে সে এতকাল অপরিচিত ছিল। বিস্ময়ে তা আঙুলে গ্রহণ করে চোখের সামনে আনল। সেই বেদনাই কি গভীর যা শরীর এবং হৃদয় মথিত করে বারিধারায় প্রকাশিত হয় ? সে জানে না। কিন্তু এই অশ্রু অভিশাপের ফলস্বরূপ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অরণ্যে রাতের শেষ অন্ধকার নেমেছে। চন্দ্রদেব অস্তমিত বৃক্ষের আড়ালে। পরিচিত সমস্ত বৃক্ষের কাছে, অকালে জেগে ওঠা পাখিদের কাছে সে প্রার্থনা করতে লাগল যদি তারা জানে পিতৃদেব কোথায় তবে তা বলে দিতে। শেষ পর্যন্ত যখন সে প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে আশ্রমে ফিরে এল তখন সূর্যদেব উদিত হতে চলেছেন। সে দীর্ঘ সময় আশ্রমের চাতালে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল। একমাত্র সেই বৃদ্ধা কুরঙ্গী যে কিনা নিজেও অনুসরণে ক্লান্ত, সে অতন্দ্র প্রহরীর মত সেই মূর্ছিত শরীর পাহারা দিতে লাগল।

ব্রহ্মের তপস্যা থেকেই সৃষ্টির বিকাশ। সেই তপস্যায় প্রথমে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর সত্য মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হলে রাত কিংবা তম অথবা বাষ্পরূপে জলের প্রথম অবস্থা সৃষ্টি হল। সেই বাষ্পের ঘনীভূত প্রকাশই জল

এবং তার পরিণতিতে দুধের সরের মত পৃথিবীর জন্ম। ঈশ্বর নিজের সৃষ্ট এই পৃথিবীতে প্রথমে মীনরূপে অবস্থান করলেন। তারপর স্থল উৎপন্ন হলে, প্রথমে স্বেদজ, অন্ডজ এবং পরে জরায়ুজ প্রাণীরূপে বিকশিত হয়ে মানুষে এসে থামলেন। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবেই মানুষের জন্ম হয়। মীন থেকে মানব, এই স্তরাতিক্রমের সময় প্রাণ নিয়ত নিজেকে শুদ্ধ করে চলে। এই প্রাণ এবং আত্মা এক নয়। আত্মার সমস্ত বিবর্তনরূপ কাজ শেষ হলে নিদ্রাবস্থা বা নিষ্কর্ম অবস্থায় পৌঁছে যায়। সেই স্তর হল সুষুপ্তিই। সুষুপ্তিই হল আত্মার আরাম। কর্মে ব্যাপৃত অবস্থাকেই আত্মা বলে। আত্মা মানুষের শরীরে তিন অবস্থায় থাকে ; জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, স্বপ্নাবস্থায় মনের সাহায্যে এবং সুষুপ্তিতে বৃত্তিশূন্য শূন্যাকারে। একেই সমাধি বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম মানেই সমাধির ছাড়পত্র। কিন্তু আত্মার উন্নতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জয়ে। পিতৃদেব সেই সেই কামনায় যদি তাকে ত্যাগ করতেন তা হলে তার অভিমান অবশ্যই হত কিন্তু অভিযোগ আসতো না। অভিমান ওই কামনা শব্দটির জন্যে। কামনা মানেই আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা মানেই নিজের কথা ভাবা। এক্ষেত্রে দেবতার প্রসাদ এবং ঈশ্বরপ্রাপ্তি পিতৃদেবের কাছে একাকার হয়ে গেছে। পিতৃদেবের কাছে দেবতা মানেই পূজ্য। কিন্তু দেবতাদের কি স্তরাতিক্রমের অভিজ্ঞতা আছে। তাদের পরিচয় শুধু ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে। দেবাদিদেব তাঁদের স্রষ্টা। মীন থেকে প্রতিটি স্তরে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষের পূর্ণতা, যে পূর্ণ মানুষ দীর্ঘকাল অনুশীলনের দ্বারা নিজেকে শাসন করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দেবতাদের সেই অভিজ্ঞতা কোথায় ? আত্মদর্শন ব্যতিরেকে তাঁরা জ্যোতির আলোকে আলোকিত। না হলে বারংবার তাঁরা রাক্ষস কিংবা দৈত্যকুলের ভয়ে ভীত হতেন না। তাঁদের আচরণে সামঞ্জস্য থাকে না বলেই তাঁরা মুনি ঋষিদের অভিশাপগ্রস্ত হন। আত্মজ্ঞান হলে তাঁরা ভীত হতেন না। আত্মজ্ঞানী অমৃত। সমস্ত বিশ্বরূপ সৃষ্টি হরণ করে যিনি একা বিদ্যমান থাকেন বা সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞান হরণ করে যিনি পরমাত্মারূপে থাকেন তিনিই ঈশ্বর। দেবতাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। এই দেবতাদের স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। পিতৃদেব তাকে দেবরাত বলেছেন। দেবতাকে উপাসনা না করে যে দেবেরও দেবকে প্রার্থনা করে সে-ই দেবরাত। আত্মজ্ঞান না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আর তা থেকে দূরে থাকলে ঈশ্বরের দর্শন মেলে না। পিতৃদেব কি কখনও তাঁর দর্শন পাবেন ? ব্রহ্মজ্ঞানী কি স্বার্থপর ?

প্রভাতের নবীন সূর্যালোকে একাকী সে এই সব চিন্তা করছিল। এই জ্ঞান সে আহরণ করেছে পিতৃদেবের কাছে। কিন্তু জ্ঞানের দ্যুতি সর্বত্র সমানভাবে পড়ে না। দৃষ্টিভঙ্গি তার নিজস্ব রূপ দেয়। আজ প্রভাতে যখন নিজেকে ছিন্নমূল বলে মনে হচ্ছে তখন পিতৃদেবের সমস্ত কথাই তার কাছে অন্য একটি অর্থ নিয়ে উঠে আসছে। এখন এই বিশ্বচরাচরে সে একা। সৃষ্টির নিয়মানুসারে সে অবশ্যই জরায়ুজ। কিন্তু যিনি তাকে প্রসব করেছেন তিনি জন্মমাত্র তাকে ত্যাগ করেছেন। আজ পিতৃদেব তাকে একা করে গেলেন। বুকের ভেতরে এখনও নিঃশ্বাস মোচড় দিয়ে চলেছে। সৃষ্টিরহস্য যখন পিতৃদেব ব্যক্ত করেছিলেন তখন নিজের সম্পর্কে কোন চিন্তা তার মনে উদিত হয়নি। তখন তার চারপাশে

পিতৃমোহের সারল্য কুয়াশার মত ছেয়েছিল। হয়তো এই অভিশাপ এখন সব কিছু নগ্ন করছে। নিজেকে অত্যন্ত প্রবঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি একান্তই কাম্য। জীবেব দুঃখ না জানলে সুখের মর্ম বোধগম্য হবে না। অতএব প্রার্থনায় কোন অন্যায় ছিল না। সাধনাব যে স্তরে পৌঁছালে অভিশাপ কার্যকর হয পিতৃদেব অবশ্যই সেই স্তরে পৌঁছেছেন। কিন্তু বুকের ভেতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা এবং চোখের জলই যদি দুঃখের স্বরূপ হয় তা হলে তার উৎস পিতৃদেবের অদর্শন। তিনি তাকে ত্যাগ কবেছেন, নিজেকে যে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে তাই তাব হৃদয়ে দুঃখবোধ সৃষ্টি করছে। অনেকক্ষণ পরে সে নিজের অজান্তে হাসল। এরই নাম দুঃখ ? একে জানতে চেযেই সে পিতৃদেবের কাছে অভিশাপ প্রার্থনা কবেছিল ? পিতৃদেবে অদর্শনজনোচিত শোক যদি সে অতিক্রম কবতে পাবে তা হলে দুঃখেব ধার কমে যেতে বাধ্য। এই দুঃখকে অতিক্রম তাকে কবতেই হবে। ব্যাপারটা নিয়ে সে স্থিরসঙ্কল্প হতে গিয়ে আবিষ্কাব করল তাব বুকেব ভাব অনেকটা লাঘব হয়েছে। পিতৃদেবের প্রতি অভিমান তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে মাত্র।

সে পুনরায় আশ্রমের প্রতি মনোনিবেশ কবল। দেবরাত। দেব এবং রাতিব সমাহার। রাতি ভোজন করা অর্থে। দেবতাকে যে স্বীকার করে না সেই দেবরাত। দেবতাকে উপাসনা না করে যে দেবতাদেব স্রষ্টা অথবা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে তাকেই দেবরাত বলে। তাকে দেবরাত হতে হবে। পিতৃদেব শব্দটি তার সম্পর্কে ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক স্বরে উচ্চারণ করতেন। কিন্তু এখন তাকে তাই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অব্রহ্মজ্ঞানী দেবতাদের তার কোন প্রয়োজন নেই। দেবতাবা সবসময গর্বিত। তাঁরা দম্ভ প্রকাশ কবতে দ্বিধা কবেন না। তাঁরা স্মরণে রাখেন না যে ঈশ্বব তাঁদের সৃষ্টি কবেছেন জীবেব কাছে স্বমহিমা প্রতিষ্ঠাব জন্যে। সেই ঘটনার কথা তো সে পিতৃদেবের মুখেই শুনেছে। যদিও ঘটনা এক কিন্তু ব্যাখ্যা বিভিন্ন। 'দেবতাবা অসুর বিজয় করে নিজেদের গর্বে উন্নাসিক হয়েছিলেন। তখন ব্রহ্ম যক্ষরূপে শূন্যে উপস্থিত হলেন। দেবতারা সেই যক্ষকে জানবাব জন্যে অগ্নিদেবকে তাঁর কাছে পাঠালে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেছিলেন. 'তুমি কে ? তোমাব ক্ষমতা কি ?'

অগ্নি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি সর্বদহ অগ্নি। নিমেষে এই বিশ্ব দগ্ধ কবতে পাবি।' তখন ব্রহ্ম একটি ক্ষুদ্র তৃণ তাঁকে দিলেন, 'এই সামান্য তৃণটিকে দগ্ধ কর।' অগ্নিদেব অক্ষম হয়ে লজ্জায় ফিবে গেলে সদম্ভে পবনদেব ব্রহ্মের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্ম তাঁকে তাঁর পরিচয় এবং ক্ষমতা জানাতে বললে পবনদেব বললেন, 'আমি মাতরিশ্বা, এই বিশ্বের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ আমার জন্যেই সম্ভব হয় এবং ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে এই বিশ্বকে উড়িয়ে দিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁকে তৃণটিকে উড়িয়ে দিতে অনুরোধ করলে পবনদেব সেটাকে সামান্য নড়াতেও পারলেন না। পবনদেব লজ্জায় ফিরে এলে ইন্দ্র এগিয়ে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে ব্রহ্ম অদৃশ্য হলেন। তখন আকাশে হৈমবতী নারী উমার উদয় হল। তিনি দেবতাদের বললেন, 'তোমার শক্তির পরিচয় নিশ্চয় পেয়েছ। অসুরদের দমন কবা তোমাদেব পক্ষে সম্ভব হতো না যদি ব্রহ্ম তোমাদের শক্তিদান না করতেন।' তখন দেবতাদের সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান হল দর্শন হল না কারণ তিনি আগেই অদৃশ্য

হয়েছিলেন। অর্থাৎ এ কথা পরিষ্কার যে ঈশ্বর অথবা জগৎস্রষ্টা মানুষ, রাক্ষস, দৈত্য সৃষ্টি করেছেন তিনিই দেবতাদের নির্মাতা। তবে তাঁর দেবতাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল কারণ পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থা সঠিক রাখতে তাঁর নিজস্ব বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। দেবতারাই তাঁর সেই বাহিনী। দেবতারা কখনও তপস্যা করেন না। আত্ম উন্নয়নের কোন চেষ্টা তাঁদের নেই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভোগী ছাড়া তাঁদের আর কিছু মনে হয় না। পিতৃদেব এই দেবতাদের ব্রহ্মজ্ঞানহীন মনে করতেন না ! ব্রহ্মের অংশ যে তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম থাকবেনই—এই রকম ধারণা তাঁর ছিল। তাঁর আবাধনায় দেবতারা তাই প্রাধান্য পেত। শিষ্য হিসেবে গুরুর আদেশ পালন করাই যখন ধর্ম তখন সে বিনা প্রতিবাদে এতকাল তাঁকেই অনুসরণ করে এসেছে। এখন তিনি তাকে ত্যাগ করেছেন। মানবজন্ম সার্থক করতে যে সাধনা তাই এখন তার একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অথবা ঈশ্বর দর্শনই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এখন। পিতৃদেব-প্রদত্ত অভিশাপ যদি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে কার্যকর হয় তবে তা মাথা পেতে নেবে।

চিত্ত শান্ত করে সে যখন স্নান সেরে সিক্ত বল্কলেই আশ্রমে ফিরে আসছে তখন দূর থেকে একটি মানুষের আকৃতি নজরে এল। মানুষটি আশ্রমের সামনে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন। এই অরণ্যে যেহেতু পিতৃদেব ভিন্ন অন্য কোন মানুষের অস্তিত্ব কখনও ছিল না, কোনদিন কাউকে দর্শনের সৌভাগ্য তার হয়নি, তাই সে চমকে উঠল। দূর থেকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে ইনি পিতৃদেব নন। কারণ এঁর স্বাস্থ্য বেশ নধব। মাথার কেশ সুবিন্যস্ত। পরিধান বল্কল নয়। কে ইনি। কোথা থেকে এঁর আগমন ? যে অরণ্যে বহির্বিশ্বের কেউ আসতে পারে না সেখানে এঁর পক্ষে আসা কি উপায়ে সম্ভব হল। একই সঙ্গে বিস্ময় এবং আগ্রহ তাকে ত্বরান্বিত করল। সে লক্ষ করল আগন্তুকের ললাটে কোন শৃঙ্গ নেই। বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সময় আগন্তুক তাকে দেখতে পেলেন। স্পষ্টতই তাঁর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিভাণ্ডক কোথায় ?'

'পিতৃদেব আমাকে ত্যাগ করেছেন। তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিলাম বলে তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।' এই কথাগুলো বলার সময় তার বুকে আবার বেদনা ফিরে এল। কথাগুলো শোনামাত্র আগন্তুকের মুখে হাসি ফুটল। 'চমৎকার। তুমি কি আমাকে দেখে খুব অবাক হচ্ছ তরুণ ?'

'হাঁ। পিতৃদেব ভিন্ন অন্য কোন মানুষের চেহারা আমি দেখিনি। আপনি কে ?'

'আমি সামান্য মানুষ নই।' আগন্তুক যেন রুষ্ট হলেন। 'আমাকে সবাই নারদ বলে জানে।'

'নারদ। ও।' সে দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল।

'মনে হচ্ছে তুমি আমার নাম শুনেছ ?'

'হ্যাঁ পিতৃদেব আপনার কাহিনী ব্যক্ত করেছেন।' সে বিনীত স্বরে জানাল।

'বিভাণ্ডক তোমাকে কি বলেছে আমার সম্পর্কে ?'

'কন্যাকুব্জ নামে একটি দেশ আছে। সেই দেশের এক গোপের পতিব্রতা পত্নী নাকি সন্তানহীনা ছিলেন। স্বামীর আজ্ঞায় সন্তানোৎপাদনের কামনায় গভীর অরণ্যে কশ্যপ মুনির কাছে তিনি উপস্থিত হন। মুনি ক্রুদ্ধ হয়েও সম্মত হন।

সেই সন্তানের নাম নারদ। গোপকুলে প্রতিপালিত হয়ে পরাশরের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও যেমন ব্যাস ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন ইনি সেইরকম হতে পারেননি। তাঁকে অম্বষ্ঠ গোপই বলা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে দেবর্ষি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নারদ শব্দটির অর্থ যে পরামাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। আমি জানি না আপনি সেই দেবর্ষি নারদ কি না যিনি নরসমূহের মধ্যে কলহ সংঘটান। অর্থাৎ আর্পান যদি সেই নারদ হন তা হলে একাধারে দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ, শূদ্রাণী গর্ভজাত অম্বষ্ঠ, ভগবৎ সম্পর্কে জ্ঞানদাতা আত্মজ্ঞানী।'

নারদেব মুখে এবার হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'চমৎকার! এই তরুণকালে তুমি পিতার কাছে শোনা সমস্ত কাহিনী স্মরণে সজীব রেখেছ বলে খুশি হলাম। কিন্তু তুমি বিভাণ্ডকেব তপস্যায় বাধা দিলে কেন? সংযতেন্দ্রিয় বিভাণ্ডক মহাত্মা কাশ্যপের এই পুণ্যাখ্য আশ্রমে দ্বিতীয়বার তপস্যাভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন। তোমার বক্তব্য কি?'

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হে ব্রাহ্মণোত্তম, পিতৃদেব কি কারণে প্রথমবার তপস্যাভঙ্গ করেছিলেন তা আমার জানা নেই। যদি তা আমাকে ব্যক্ত করেন তো কৃতার্থ হই।'

নারদকে কিঞ্চিৎ বিচলিত দেখা গেল, 'পিতার দুর্বল মুহূর্তগুলো পুত্রের না জানাই শ্রেয়। তবু তুমি যখন আগ্রহী তখন এইটুকু জানো, দেবকল্প স্থবিরাভিমত কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক যৌবনে মহাহ্রদের পাশে কঠোর তপস্যা করতেন। ওই মহাহ্রদ হতেই কৌশকী নদী নির্গত হয়েছে। একদিন, দ্বিপ্রহরে ঋষি যখন সাধনায় মগ্ন তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভার প্রধান নর্তকী উর্বশী আকাশপথে ভ্রমণকালে বিশ্রামের আশায় এই বনে নেমে আসেন। তাঁর নূপুরের শব্দে বিভাণ্ডকের ধ্যান ভঙ্গ হয়। তুমি ঋষির পুত্র, তোমার পক্ষে এইটুকু শোনাই যথেষ্ট হবে।'

'হে মহর্ষি, সেই নর্তকী যাঁর নাম উর্বশী তিনি দেখতে কেমন ছিলেন?'

'মানুষের মত।'

'এই কথাটি আমাকে বিভ্রম এনে দেয়। মানুষের মত হলে পিতৃদেব এবং আপনি যখন প্রায় একই প্রকৃতির তখন আমার ললাটে শৃঙ্গ কেন? আমি কি মানুষ নই? সেই নর্তকীর ললাটে কি শৃঙ্গ ছিল? তিনি আর এই বনে বিশ্রামের জন্যে আসেন না কেন?' সে কাতরকণ্ঠে নারদের কাছে জানতে চাইল।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই প্রশ্নাবলী তুমি বিভাণ্ডককে কখনও করেছ?'

সে দ্রুত মাথা নাড়ল, 'আগে কখনও আমার মনে এই সব প্রশ্ন উদিত হয়নি। পিতৃদেব অভিশাপ দেওয়ার পর থেকেই সর্বক্ষণ নানান প্রশ্নে হৃদয় আলোড়িত হচ্ছে।'

নারদ বললেন, 'সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তবে উর্বশী সামান্যা নন, তিনি অপ্সরা' দেবতাদের বিনোদনই তাঁর একমাত্র কাজ। এখন তুমি বল কি কারণে বিভাণ্ডকের অভিশাপগ্রস্ত হলে?'

সে উত্তর দিল, 'পিতৃদেব তিনদিন তিনরাত সমাধিতে ছিলেন। তাঁর তপস্যা দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়। সিদ্ধ হলে তিনি আমাকে ত্যাগ

করতেন। যিনি পরমকরুণাময় তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে যদি কেউ নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করে তা হলে সিদ্ধি আসতে পারে না। তিনি আমাকে ত্যাগ করে তাই পেতে চাইছিলেন। এই বিশ্বচরাচরে আমি একা। তাঁর ওই তপস্যাকে আমার স্বার্থসর্বস্ব বলে মনে হওয়ায় আমি বাস্তবে ফিরে আসতে আহ্বান জানাই।'

নারদ ঘন ঘন মাথা নাড়লেন, 'তুমি উপযুক্ত কাজ করনি। পাত্র যদি কলঙ্কযুক্ত হয় তা হলে ঈশ্বর তা ব্যবহার করেন না। সেই কারণে অনেক দৈত্য বা রাক্ষস এমন কি মানুষের সাধনা ভঙ্গ করার উদ্যোগ নেন, দেবতারা। বিভাণ্ডকের সাধনাধামে গমন করার ব্যাপারে দেবতাদের কোন আপত্তি নেই। তুমি ভুল ধাবণাবশত তাঁর যাত্রার বিঘ্ন ঘটিয়েছ। তুমি কি দেবতাদের অস্বীকার কর ?'

সে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'না। অস্বীকার করি না। কিন্তু দেবতারা আমার কাম্য নন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রয়োজনে সৃষ্ট। সূর্যালোকে পৃথিবী যেমন উজ্জ্বল তেমনি তাঁরা ঈশ্বরের জ্যোতিতে দিব্য। দেবতা নয়, আমি দেবাদিদেবের দর্শন প্রার্থনা করি।'

নারদ বললেন, 'আমি চমৎকৃত। তোমার ভেতরে তেজ আছে। কিন্তু তার ব্যবহার কখনও অকারণে করো না। পিতৃ আদেশে তুমি দুঃখ পাবেই। আমি কখনও শুনিনি কেউ ইচ্ছে করে দুঃখের অনলে নিজেকে দগ্ধ করতে চায়। যা হোক, হয়তো এ-ই তোমাকে পৌঁছে দেবে পরিণতিতে। তোমার কি আর কিছু জানবার ইচ্ছে আছে ?'

সে মুহূর্তকাল সময় নিল। তারপর বলল, 'ব্রহ্ম কি ?'

নারদ বললেন, 'ব্রহ্ম অন্ন এবং অন্নভোক্তাও। তিনিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবতাদেরও পূর্ববর্তী এবং তিনিই অমৃতত্ত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্ত্ব নামক মোক্ষ তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত। আদিত্যের মত জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত। এই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে সগুণ ব্রহ্ম অন্তর্হিত হয়।'

সে এবার শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করল, 'আপনি কি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ?'

সঙ্গে সঙ্গে নারদকে বিচলিত দেখাল। তিনি মাথা নিচু করে বললেন, 'না।' এবং তারপরেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

তরুণ তাপস দীর্ঘসময় নিশ্চুপ বসে রইল। এক সময় তার মনে হতে লাগল ওই সব ভারী কথায় কোন কাজ নেই। যোগাচারণ দ্বারা সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা শ্রেয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি যদি স্বেচ্ছায় তাকে দূরে রাখতে চান তা হলে কাছে পৌঁছতে চাওয়া মানে হয়তো তাঁকে বিব্রত করা। কিন্তু পিতৃদেব বলেছেন সমুদ্র বারিধারা পর্বতে প্রেরণ করে যাতে সে আবার তার কাছে ফিরে আসে। নারদ বললেন যে তার মধ্যে তেজ আছে। এই তেজ কি তা সে জানে না। তাপস ধীর পায়ে তার আসনে ফিরে এল। উপবিষ্ট হয়ে পদ্মাসনে বসে মেরুদণ্ড, গলা এবং মাথাকে সরলভাবে স্থিত করল। যখন মাথা থেকে কটিদেশ একটি সরলরেখায় তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহ বাতাস গ্রহণ করে তা শরীরের ভেতরে স্থিরভাবে ধারণ করতে চেষ্টা করে সক্ষম হল। এই সময় তার কটিদেশে কম্পন শুরু হল এবং সেই কম্পনের সঙ্গেই

একটি তেজ বিদ্যুৎআভার মত প্রকাশিত হল। সেই কটিদেশস্থ শক্তি যার নাম কুলকুণ্ডলিনী ক্রমে উর্ধ্বগামী হল। এবং একই সময়ে শিরোদেশের দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী অংশে কম্পন এবং জ্যোতি নির্গত হল। এই জ্যোতিও নিম্নগামী হয়ে উর্ধ্বগামী জ্যোতির সঙ্গে মিলিত হল। ওই সময় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বকেব দ্বারগুলো বন্ধ হতে লাগল। দ্বারগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে মন রুদ্ধ বাষ্পের মত কম্পিত হতে লাগল। তখন চিৎশক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে যে আভা জন্ম নিল তার উৎপত্তিস্থল দেহের মধ্যভাগে নাভির চারপাশে। এই আত্মহৃদিজ্যোতি ক্রমশ বর্ধিত হলে তাপস তাতেই মগ্ন হয়ে গেল। একটির পর একটি স্তর অতিক্রমণ করে সেই জ্যোতি ক্রমশ যখন উর্ধ্বগামী হতে উন্মুখ তখনই তাব স্মরণে এল এখনও দুঃখদর্শন হয়নি। ধীরে ধীরে যখন তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় সক্রিয় হল তখন সে বেহুঁশের মত আসনের ওপর পড়ে রইল। তার শরীরের পাশে সেই কুরঙ্গী সজাগ চোখে দাঁড়িয়ে। এই শবীর থেকে নির্গত জ্যোতির প্রকোপ তাকে স্পর্শ করছে না। কিন্তু অরণ্যের হিংস্র জন্তুরা যেন আবও দূবে সরে যাচ্ছিল। বয়োবৃদ্ধা কুরঙ্গী পরম স্নেহে তার ললাটের স্বেদ জিহ্বা দ্বাবা মুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল একমনে।

অঙ্গদেশের অধিরাজ লোমপাদ এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁর বাজত্বে প্রজারা সুখে নেই। পৃথিবীর সব রাজত্বেই প্রজাদেব একাংশ চিরকালই অসুখে থাকে। শুধু সেই কাবণ ঘটলে চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। বাজাব ভূমিকা পিতার তুল্য। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দাযিত্ব তাঁর। লোমপাদ এই কথায় বিশ্বাস করেন। প্রতিটি প্রজা যাতে কোনরকম রাজনৈতিক সমস্যাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন ব্রাহ্মণরা অকাবণে প্রজাদেব ওপর নানান ধর্মবিধি চাপিয়ে দিয়ে প্রজাদেব শোষণ করে। ধর্ম মানুষকে পরিচালিত করে। তাদের জীবনযাত্রায় তাই ধর্মের নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের ভূমিকা প্রবল। কিন্তু লোমপাদেব মনে হতে লাগল ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতরা সুযোগের অসদব্যবহার কবছেন। তিনি আর দ্বিধাগ্রস্ত হননি। অথচ সরাসরি পুবোহিতদের শক্তি খর্ব করাব সাহস তাঁর ছিল না। তাই তিনি মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলেন। প্রধান পুবোহিতকে ডেকে বললেন যে তিনি স্বপ্নাদেশ পেযেছেন, কিছুদিন এই রাজ্যে পূজার্চনা বন্ধ থাকবে। লোমপাদ যে বিরক্ত হয়েছেন এ কথা পুবোহিতবা জানতেন। অতএব এই স্বপ্নাদেশ যে বানানো তা বুঝতে সময় লাগল না। ফলে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের সঙ্গে লোমপাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল। কিন্তু বাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ কখনই বিচক্ষণ কাজ নয় বলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। লোমপাদ এতেই তুষ্ট হন। কারণ তিনি নিজে রাজা হলেও প্রজাবা যে ব্রাহ্মণদের বশ্যতাই বেশি স্বীকার করে তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ব্রাহ্মণেরা রাজসভা এবং রাজ্য ত্যাগ কবাতে তিনি তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। প্রজারাও ব্রাহ্মণদের অনুপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হলেও কঠোব অনুশাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচবণ করতে লাগল।

বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণরা একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা করল যাতে মহারাজ বিপদে

পড়েন। তারা একমত যে রাজা বিপদগ্রস্ত হতে পারে যদি প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়। সমস্ত রাজ্যের প্রজারা যদি একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তা হলেই মহারাজা কোণঠাসা হবেন। যেহেতু রাজশক্তি প্রজাদের মধ্যে থেকেই সংগৃহীত তাই তারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু অঙ্গরাজ্যের সমস্ত প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উপায় কি? একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ উপায় নির্ধারিণ করলেন। প্রজারা তুষ্ট থাকে যদি তাদের ঘরে পর্যাপ্ত অন্নের অভাব না হয়। প্রতি বছর অঙ্গ রাজ্যে প্রচুর ফসল ফলে। এই কারণে প্রজাদের কোন অভাব নেই, মনে শান্তি আছে এবং রাজস্ব দিতে তারা কুণ্ঠা করে না। কিন্তু কোন কারণে যদি ফসল না ফলে তা হলেই অন্নের অভাব ঘটবে। এবং সেই ঘটনা যদি কিছুদিন ধরে চলে তা হলে তাদের উন্মত্ত করা সম্ভব। অঙ্গ রাজ্যে ফসল নির্ভর করে বরুণদেবের কৃপায়। তিনি যদি অঙ্গরাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করেন তা হলে খরা আসতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতগণ এই উপদেশ গ্রহণ করে সহস্রালোচন ইন্দ্রের উপাসনা কবতে লাগল। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবরাজ বরুণদেবকে অঙ্গরাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

ঋতুর পরিবর্তন অঙ্গরাজ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করল না। গ্রীষ্মের দাবদাহ আর শেষ হচ্ছিল না। আষাঢ় শ্রাবণের আকাশে সামান্য মেঘের দর্শন কেউ পেল না। বৃষ্টির অভাবে ফসল মাঠেই জ্বলে শেষ হয়ে গেল। ক্রমশ মাটি শুকিয়ে ফেটে যেতে লাগল। জলাশয়গুলি কর্দমাক্ত হয়ে পডল। সঞ্চিত অন্নে হাত পড়ল। প্রথম বছর প্রজারা এই ঘটনাকে একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেই ধরে নিল। লোমপাদ অবাক হয়েছিলেন কিন্তু তখনও তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বছরেও যখন সূর্যদেব নিরন্তর আগুন ছড়িয়ে গেলেন, আকাশ এক ফোঁটা জল পৃথিবীকে দিল না তখন প্রজাদের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল। ব্রাহ্মণরা এই পরিস্থিতির জন্যে উদগ্রীব ছিল। লোমপাদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তপ্ত করার জন্যে তারা নানারকম ইন্ধন যোগাতে চাইল। প্রথমে তারা প্রচার করল যেহেতু মহারাজ মিথ্যা ব্যবহার এবং অত্যাচারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের পরিত্যাগ করেছেন তাই দেবতারা রুষ্ট হয়েছেন। এই রটনা কারো কারো মনে ধরলেও ব্যাপক কার্যকর হল না। কারণ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে স্মৃতি তখনও প্রজাদের মন থেকে মুছে যায়নি। তখন ব্রাহ্মণরা প্রচার করলেন, যেহেতু রাজা লোমপাদ অপুত্রক তাই এই খরা এবং মহামারীর উৎপত্তি। যে রাজার নিজস্ব পুত্র নেই তিনি কিভাবে প্রজাদের জনক হবেন? কন্যাসন্তান থাকা আর না থাকা সমান। পূর্বজন্মের কোন পাপের কারণেই মহারাজ পুত্রবান হননি। এবং সেই দোষেই প্রজাদের ওপর অভিশাপ নেমে এসেছে। প্রবাদের সঙ্গে সাযুজ্য থাকায় এই রটনা তৎক্ষণাৎ প্রজাদের মনে ধরে গেল। রাজার অপসারণ ভিন্ন এই অবস্থা থেকে মুক্তি নেই বলে তারা বিশ্বাস করল। অনাবৃষ্টির কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে রাজা লোমপাদও বিস্মিত ছিলেন। দ্বিতীয় বছরে তিনি রাজস্ব আদায় না করতে কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। এই আদেশ প্রজাদের কিছুটা স্বস্তি এনে দিলেও মূলের কোন পরিবর্তন ঘটল না।

রাজপ্রাসাদের দ্বিতলে দক্ষিণমুখো ঘরে মহারাজ লোমপাদ বিমর্ষ মুখে বসে ছিলেন। আজ প্রভাতে বিশেষ সূত্রে তিনি খবর পেয়েছেন অঙ্গদেশের

আবালবৃদ্ধবনিতা এখন তাঁর অপসারণ প্রার্থনা করছে। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এখনও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু কে না জানে ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত থাকে তখন নেতৃত্বের জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় না। কিন্তু কোন উপায়ে প্রজাদের শান্ত করা যায় তা তাঁর মাথায় আসছিল না। সৈন্যবাহিনী চিরকাল তাঁর অনুগত। কিন্তু সৈন্যদের আত্মীয়স্বজন যদি বিদ্রোহ করে তা হলে তারা অস্ত্রসংবরণ করবেই। চিন্তায় উদ্বিগ্ন রাজার সামনে কোন পথ খোলা নেই বলে মনে হচ্ছিল। অথচ এতকালের সাম্রাজ্য শুধু অনাবৃষ্টির কারণে ত্যাগ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। পূর্বপুরুষদের অর্জিত রাজ্য তিনি রাখতে পারবেন না এ হতেই পারে না। একবার মনে হল প্রজারা প্রস্তুত হবার আগেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরুতেই মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া উচিত কাজ হবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তা তিনি বাতিল করলেন। একেই ব্রাহ্মণরা প্রচার করেছিল তিনি অত্যাচারী। এই কাজ করলে সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তা ছাড়া রক্তপাত ক্ষুধার জ্বালা দূর করতে পারে না। এদিকে দূত আরও সংবাদ এনেছে, অঙ্গদেশে বিক্ষোভের সুযোগ নেওয়ার জন্য আশেপাশের কয়েকটি রাজ্য এগিয়ে আসার মতলব করছে। এতকাল যারা অঙ্গদেশ থেকে দূরে থাকত তারা মনে করছে এই সুযোগে তারা লোমপাদকে পরাস্ত করতে পারবে। মহারাজ লোমপাদ বাতায়নে দাঁড়িয়ে শুকনো আকাশ দেখলেন, রাজপ্রাসাদের চারপাশে যে পরিখা তার ওপাশে কোন মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। অঙ্গদেশ ঘরে-বাইরে ধিকিধিকি জ্বলছে। অথচ তাঁর বুদ্ধি ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। যে বিশেষ দূতকে তিনি পাঠিয়েছেন অযোধ্যাধিপতি দশরথের কাছে সাহায্যের আশায় তারও খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

মহারাজ লোমপাদ দু হাতে মুখ আবৃত করলেন। এই সময় দরজায় আঘাত হল। তিনি ঈষৎ অবাক হলেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ না থাকলে কেউ ওই বন্ধ দ্বারে আঘাত করতে সাহস পায় না। তা হলে কি অযোধ্যা থেকে দূত ফিরে এল ? নাকি প্রজারা রাজপ্রাসাদ দখল করতে এগিয়ে আসছে ? তিনি কম্পিত হাতে দ্বার খুলে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ?'

দ্বারের ও প্রান্তে যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীও তাকে ঈর্ষা করবে। চারুবৃত্তপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রের মত যে শ্যামা কামিনী দশদিক আলোকময় করছে রূপলাবণ্যে সেই পদ্মপত্রবিশালী কন্যা শান্তা অত্যন্ত সম্ভ্রমে বলল, 'পিতা, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।'

রাজা লোমপাদ নিজেকে সংবরণ করলেন, 'পরিস্থিতি কি ভয়ানক তা জানলে তুমি এ কথা উচ্চারণ করতে না। প্রজারা যদি বিদ্রোহী হয় আমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। তোমরা প্রস্তুত হও। এই বৈভব ত্যাগ করে দূর নিরুদ্দেশে যেতে হবে আমাদের। আজ আমার চারপাশে কোন মিত্র নেই যে আমাকে রক্ষা করে।' শান্তা বলল, 'কিন্তু পিতা, সত্যি কি কোন উপায় নেই ?'

লোমপাদ বিস্মিত, 'মহামন্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রজাদের শান্ত করতে। কিন্তু উদরে অগ্নি জ্বললে উপদেশ ক্রোধের উদ্রেক করে। একমাত্র বন্ধুবর দশরথ যদি সাহায্যের আবেদন গ্রহণ করে খাদ্যশস্য প্রেরণ করে—!'

'কিন্তু তাতেই বা কদিন চলবে ? কর্জ মানুষকে সাময়িক সাহায্য করে কিন্তু

চিরস্থায়ী শান্তির জন্যে আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে পিতা।' লোমপাদ বিস্মিত। সেই বালিকা কন্যা কখন প্রকৃতির নিয়মানুসারে শুধু তন্বী এবং সুন্দরীই হয়নি বিচক্ষণা এবং সাহসী বলেও মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, 'কি বলতে চাইছ ?'

'পিতা আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি ব্রাহ্মণ কিংবা পুরোহিতদের ওপর বিরক্ত। হয়তো তার নির্দিষ্ট কারণও আছে। কিন্তু এর ফলে আজ দুই বৎসর রাজ্যে কোনরকম পূজার্চনা বন্ধ হয়ে গেছে। ওসব তো ব্রাহ্মণরাই করতেন। আমি তাঁদের কাছে আপনাকে যেতে বলছি না। কিন্তু আপনি অঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী মহাহ্রদে যে সমস্ত ঋষিরা সাধনা করেন তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। সেই সত্যদ্রষ্টারা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।'

মহারাজ মুগ্ধ হলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার আগেই দ্বারী মহামন্ত্রীর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। শান্তা দ্রুতপদে অন্তর্হিত হওয়া মাত্র মহামন্ত্রী সামনে এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বললেন, 'অযোধ্যা থেকে দূত ফিরে এসেছে মহারাজ। অযোধ্যাধিপতি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট প্রহরীর ব্যবস্থা না থাকায় পথমধ্যেই তা কেড়ে নিয়েছে ব্রাহ্মণরা। এদিকে রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়। বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি সৈন্যদের— ।' মহামন্ত্রীকে হাত তুলে স্তব্ধ করলেন মহারাজ। তারপর বললেন, 'রথ প্রস্তুত করতে বলুন। আমি মহাহ্রদে যাব।'

'মহাহ্রদ ? সে তো অনেক দূরে। একাকী আপনার অতটা পথ ভ্রমণ ঠিক নয়।'

'বেশ। তাহলে কিছু সৈন্য আমার সঙ্গে চলুক।'

মহারাজ লোমপাদ মহাহ্রদে এক প্রবীণ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করার পর মুনি জানতে চাইলেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। সৈন্যবাহিনীকে যতটা দূরে সম্ভব রেখে মহারাজ একা মুনির দর্শনপ্রার্থী হয়েছিলেন। অতএব নিজেকে নগ্ন করতে তাঁর কুণ্ঠা হল না। লোমপাদ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করে আবেদন করলেন, 'হে ঋষি, অঙ্গদেশকে রক্ষা করতে পর্জন্যপটল কিভাবে বারি বর্ষণ করবে তার উপায় অন্বেষণ করুন।'

মুনি মহারাজের মুখের দিকে তাকালেন, 'মহারাজ, তুমি ব্রাহ্মণদের ওপর অবিচার করেছ। তাঁরা বরুণদেবের কৃপা অর্জন করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বরুণদেবের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করা। তোমার রাজধানীতে যজ্ঞের আয়োজন করা। তুমি সেই যজ্ঞে জগতের সমস্ত মুনি ঋষিকে আমন্ত্রণ জানাও। এবং রাজনীতিতে সঙ্কোচের কোন স্থান নেই তাই ব্রাহ্মণদেরও আমন্ত্রণ জানাবে। সেই যজ্ঞের ধূম আকাশে উঠে বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করলে বর্ষণ অনিবার্য হবে।'

বিগলিত লোমপাদ মুনিকে অনুরোধ করলেন, 'এই যজ্ঞের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।' মুনি বললেন, 'তথাস্তু।'

অঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে গেল। লোমপাদ প্রজাহিতার্থে যজ্ঞের ব্যবস্থা করছেন। এই যজ্ঞ বরুণদেবের কৃপা অর্জন করবে। অনেক বড়

বড় মুনিঋষিরা আসা শুরু করেছেন এই যজ্ঞকে সফল করতে। সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত স্রোত প্রবাহিত হল। অন্নাভাবে রটনা বিশ্বাস করে যারা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তারা পিছিয়ে গেল। কারণ দলে দলে মানুষ ছুটছে যজ্ঞদর্শনের কামনায়। রক্ত এবং সংস্কারে জড়িয়ে থাকা ধর্মভীতি তাদের চিত্ত থেকে ক্রোধ অপসারণ করল। মহারাজ তাদের মঙ্গলের জন্যে যখন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তখন সেই যজ্ঞকে সাহায্য করাই উচিত বলে মনে করল সবাই। ফলে বিদ্রোহের উদ্যোগ যারা নিয়েছিল তারা পিছিয়ে গেল।

বিশাল চত্বরে যজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছে। খ্যাতনামা সমস্ত ঋষি সারাক্ষণ মন্ত্রপাঠ এবং আহুতি প্রদান করছেন। যজ্ঞের ধূম আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। প্রজারা মুগ্ধ হয়ে সেসব দর্শন করছে। দূর-দূরান্ত থেকে তারা বড় বড় পাত্রে সঞ্চিত ঘৃতাদি নিয়ে আসছে যজ্ঞে প্রদান করবে বলে। মহারাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কন্যার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ কিন্তু সেটা প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করলেন না। মহামন্ত্রী গদগদ কণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'মহারাজ, আপনি প্রণম্য। যে ভাবে অঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করলেন তা আমার চিন্তার আগোচরে ছিল। রাজনীতি যেখানে পরাস্ত হয় তার নাম ধর্ম। প্রজারা এখন সেই ধর্মের মদে মাতাল হয়ে আছে।'

মহারাজ বাতায়নে দাঁড়াতেই তাঁর জয়ধ্বনি শোনা গেল। যজ্ঞ দেখতে আসা প্রজারা সমস্বরে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে। দুদিন আগেও যারা তাঁর অপসারণ প্রার্থনা করেছে তাদের এ কী পরিবর্তন।

কিন্তু যজ্ঞ চলছে তো চলছেই। মাসাধিককাল হয়ে গেল তবু বরুণদেবের কৃপা হচ্ছে না। অঙ্গদেশের আকাশ এখন যজ্ঞের ধোঁয়ায় মসীবর্ণ। দ্বিপ্রহরেও সূর্যদেবকে তা অদৃশ্য করে রেখেছে প্রায়। মহারাজের কানে এল প্রজারা আবার গুঞ্জন শুরু করেছে এ কেমন যজ্ঞ যা ফলদায়ক নয়! মুনি ঋষিদের এই চেষ্টা কি আন্তরিক নয়? নইলে যজ্ঞের ধোঁয়া বরুণদেবকে আকর্ষণ করছে না কেন? প্রশ্নটা মহারাজের মনেও উঁকি মারছিল। এত আয়োজন কি বৃথা হবে। তিনি যখনই ঋষিদের প্রশ্ন করেন তখন তাঁরা ধৈর্য ধরতে বলেন। অপেক্ষা করতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু জনসাধারণ ক্রমশ আশাহত হতে চলেছে। ধর্মবিশ্বাস অবশ্যই খুব ধারালো অস্ত্র কিন্তু ব্যবহারে পটুত্ব না থাকলে আহত হবার সম্ভাবনাই বেশি। মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে কারণ তার মনে গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকে ধর্ম তাকে কিছু দেবে। এই পাওয়াটা যদি অলীক হয়ে যায় তাহলে বিশ্বাসে চিড় পড়তে বাধ্য। নিষ্ফল যজ্ঞ সেইদিকে তাদের নিয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণরা যারা দূরে সরে গিয়েছিল তারা এখনও অপপ্রচার চালাচ্ছে। সেসব কথা যজ্ঞের শুরুতে প্রজারা বিশ্বাস করেনি। এখন করছে। অন্নাভাবের সঙ্গে ধর্মাভাব যদি মিশ্রিত হয় তাহলে রক্ষা থাকবে না। মহারাজ বিচলিত হলেন। তিনি ঋষিদের কাছে আবার প্রার্থনা জানালেন। নিষ্ঠা পবিত্রতা এবং জ্ঞানের চূড়ান্ত প্রয়োগ সত্ত্বেও কেন বরুণদেব কৃপা করছেন না তা ঋষিরা বুঝতে পারছিলেন না। কোথাও কোন ত্রুটি থেকে গেছে অনুমান করে কেউ কেউ যজ্ঞ ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। এই সময় মহারাজের বন্ধুবর অযোধ্যাধিপতি দশরথের প্রতিনিধি হিসেবে আগত অতিথি মহামতি মন্ত্রী সুমন্ত্র বিনীতকণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'মহারাজ, আপনার

যজ্ঞ ঠিক পথেই চলছে। হোতৃগণ মন্ত্রদ্বারা দেবগণকে আহ্বান করে যথাযোগ্য হবির্ভাগ প্রদান করছেন। দাস, তপস্বী, শ্রমণ, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী এবং বালকেরা আহার করছে। প্রতিদিন পর্বতাকার বহু অন্নকূট সজ্জিত হচ্ছে। যজ্ঞস্থলে কাষ্ঠনির্মিত বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারভূষিত একুশটি যূপও আছে। স্বর্ণপক্ষ গরুড়াকার অগ্নিও স্থাপিত হয়েছে। ঋষিরা দেবতাদের উদ্দেশে উরগ, পক্ষী, অশ্ব ও জলচর যথাশাস্ত্র বধ করছেন। কিন্তু কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক মুনির এক পুত্র আছেন ; তাঁর নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি যদি যজ্ঞের ঋত্বিক হন তাহলেই আপনার কামনা পূর্ণ হবে।'

বিস্মিত মহারাজ জানতে চাইলেন, 'কে সেই ঋষ্যশৃঙ্গ, কী এমন ক্ষমতা তাঁর যা এত সব ঋষিদের কৃতিত্ব ম্লান করবে ?'

মহামতি সুমন্ত্র বললেন, 'সনৎকুমারোক্ত ব্যাখ্যা শুনেছি। ঋষ্যশৃঙ্গ সরলস্বভাবসম্পন্ন নারী পরিচয়বর্জিত আজন্ম বনবাসী। তিনি ভোগসুখ জানেন না। পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষের চেহারা দেখেননি। তাঁকেই আনয়নের ব্যবস্থা করুন।'

মহারাজ লোমপাদ বললেন, 'বেশ। আমি এখনই মহামন্ত্রীকে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে পাঠাচ্ছি।'

সুমন্ত্র হাসলেন, 'না মহারাজ, সে কাজ করবেন না। ওই ঋষি নিজের ক্ষমতা জানেন না।

তিনি যদি মানবদর্শনে অসন্তুষ্ট হন তাহলে আপনার মহামন্ত্রী ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। তাঁর প্রকৃতি বিচিত্র হতে বাধ্য। লক্ষ সৈন্য পাঠালেও তিনি অনড় থেকে যাবেন। তাছাড়া তিনি পিতৃ আদেশে ওই অরণ্য ত্যাগ করবেন না। এক্ষেত্রে কী উপায় আছে আমার জানা নেই।'

একথা শোনার পর লোমপাদ মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করে ঋষ্যশৃঙ্গকে কি ভাবে অঙ্গদেশে আনা যায় তার উপায় নির্ধারণ করতে বললেন। তাদের কেউ কেউ বলল, 'মহারাজ, আপনি নিজে গেলে সেই তরুণ হয়তো কুপিত হবে না।' কিন্তু একথা সঠিক তা মহারাজের মনে ধরল না। ঋষ্যশৃঙ্গের তেজের মুখোমুখি হতে কারোরই সাহস হচ্ছিল না। তাছাড়া যদি পিতৃ আদেশ থাকে তাহলে তো তাকে আনা অসম্ভব হবে। মহারাজ লোমপাদের মনে হচ্ছিল এ যেন সোনার পাথরবাটি আনার চেষ্টা করা। অথচ প্রজারা জেনে যাচ্ছে যজ্ঞ বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এখন বিদ্রোহ দ্বিগুণ শক্তিতে প্রকাশিত হবে। তিনি অসহায় হয়ে পড়লেন।

এই সময় একজন প্রবীণা বারঘোষা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হল। এই প্রবীণা তার যৌবনকালে অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্না ছিল। অতএব মহারাজ তাকে দর্শন দিলেন। প্রবীণা বলল, 'মহারাজ, আপনার সমস্যার কথা আমার কানে এসেছে। যৌবনে আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম। এখন তা শোধ করতে চাই। ওই ঋষি নারী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, ভোগসুখও জানেন না। মানুষ যা চায় এমন চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থে তাঁকে প্রলোভিত করে আমি এ নগরীতে নিয়ে আসব। আপনি অনুমতি দিন।'

মহারাজ বিহ্বল হলেন। যেখানে বড় বড় পণ্ডিত, যোদ্ধারা সাহসী হচ্ছেন না,

সেখানে এই সামান্য প্রবীণা বারাঙ্গনার অনুরোধ শোনা উচিত কাজ কিনা বোধগম্য হচ্ছিল না। সে কথাই ব্যক্ত করাতে প্রবীণা বারঘোষা হাসল, 'মহারাজ, ঋষ্যশৃঙ্গ মানুষ। তিনি দেবতা হলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। যতক্ষণ তার হৃদয় থাকবে, ততক্ষণ তিনি নারীর কাছে পরাজিত হবেন। একটি সুগঠিত নারী-শরীর অনেক সময় এক কোটি দেবতার শক্তি হরণ করতে পারে। আমাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এবার অনুমতি দান করুন।'

মহারাজ লোমপাদ শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন। তাঁর সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। সমস্ত অঙ্গদেশে প্রচারিত হল ঋষ্যশৃঙ্গ নামক জনৈক ঋষিকে আনতে এই নগরের বারাঙ্গনারা যাচ্ছে। তিনি এসে যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক হলেই বরুণদেব কৃপা করবেন। ফলে প্রজারা আবার থমকে গেল। বারাঙ্গনাদের নিয়ে তারা রসালো গল্প ছড়াতে লাগল।

প্রবীণা বারঘোষা মহারাজকে বলল, 'মহারাজ! যদি আপনি আমাকে আমার অভিপ্রেত কতগুলো উপভোগ্য বস্তু প্রদান কবেন তাহলে সেই ঋষিপুত্রকে আনা সহজ হবে।'

মহারাজ লোমপাদ জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি তোমার অভিপ্রেত বস্তু?'

প্রবীণা বলল, 'আমার একটি বিশাল নৌকো চাই। কারণ মহাহ্রদ থেকে কৌশকী নদী ধরে সেই অরণ্যের পাশে পৌঁছাতে হবে। নৌকোটির ওপরে একটি মনোহর আশ্রম নির্মাণ করে সুস্বাদু ফল-নিবহশালী, বহুকুসুমবিভূষিত বিচিত্র কৃত্রিম তরুলতা ও গুল্ম দিয়ে সুশোভিত করতে হবে। যা দেখে যে কোন মানুষের নৌকোটিকে আশ্রম বলে মনে হবে। আর যে সমস্ত বারাঙ্গনা আমার সঙ্গে যাবে তাদের উপযুক্ত পারিতোষিক দেওয়া দরকার।'

মহারাজ লোমপাদের নির্দেশে এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে প্রবীণা রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী নৃত্যপটীয়সী এবং কামকলানিপুণাদের নির্বাচন করল। এই দলে সে তার নিপুণা কন্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করল। শুভক্ষণে নৌকো অঙ্গদেশ ছেড়ে যাত্রা করল। আদিগন্ত বিস্তৃত মহাহ্রদ পেরিয়ে একসময় তারা কৌশকী নদীতে প্রবেশ করল। এই বারিধারায় কখনও কোন নৌকো প্রবেশ করে না। বিশাল হাঙরেরা এখানে স্বচ্ছেন্দে বিচরণ করে। কিন্তু প্রবীণা যেহেতু বৃহৎ নৌকো নির্বাচন করেছিল তাই হাঙরের আঘাত অতিক্রম করতে সক্ষম হল। নৌকোর মাঝিমাল্লারা পুরুষ। কিন্তু তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল। কৌশকী নদীতে পৌঁছানোর পর তারা প্রবীণার নির্দেশে রমণীর পোশাক পরতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত এক উষায় তারা কাশ্যপাশ্রমের অনতিদূরে অরণ্যের প্রান্তে নৌকো নিবদ্ধ করল। নৌকোর প্রতিটি মানুষের ওপর নির্দেশ ছিল মৌন হয়ে থাকার। সূর্যদেব উদিত হলে প্রবীণা দুইজন মাল্লাকে নির্দেশ দিল অরণ্যে গোপনে প্রবেশ করে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে আসতে। আশ্রমে ঋষ্যশৃঙ্গ ছাড়া আর কেউ আছে কিনা তার সন্ধান করতে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা যেন ঋষ্যশৃঙ্গের মুখোমুখি না হয়। সে বারাঙ্গনাদের নির্দেশ দিল প্রসাধন শেষ করে নৃত্যগীতের জন্যে প্রস্তুত হতে। লতাগুল্মাদির আড়ালে অঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠা বারবনিতারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

আশ্রমের চাতালে বসে সে শৃঙ্গে হাত বোলাচ্ছিল। কুরঙ্গীটি কিঞ্চিৎ অদূরে প্রভাতের প্রথম রোদ গায়ে মেখে শুয়েছিল। শৃঙ্গে হাত বোলালে চিত্ত শান্ত হয়। সে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। পিতৃদেব আর ফিরে এলেন না। এখন এই অরণ্যে যখন তাকে একাই অবস্থান করতে হবে তখন সেটা মেনে নেওয়াই শ্রেয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুধার উদ্রেক হল। সে পদশব্দ শুনতে পেল। যেন কিছু ভীত প্রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল। কিন্তু এই শব্দ তার পরিচিত নয়।

চতুষ্পদ জন্তুরা এইভাবে ছুটে যায় না। সে বিস্মিত হল। কৃষ্ণমুখ বানরেরাও অতক্ষণ মাটিতে থাকে না। সে আশ্রম ত্যাগ করে যেদিক থেকে শব্দ ভেসে এসেছিল সেদিকে গেল। কিন্তু এখন অরণ্য স্থির এবং কাউকেই দেখা গেল না। উদ্বেগে মস্তিষ্ক স্থির নেই মনে করে সে ফলান্বেষণে মনোনিবেশ করল এবং এই সময় তার কানে এক বিচিত্র শব্দ প্রবেশ করল। শব্দটি কোন মানবকণ্ঠের নয়, কারণ তা কোকিলের মত সরু অথচ মাদকতাময়। সেই শব্দের সঙ্গে সুমধুর আওয়াজ হচ্ছে। এই আওয়াজ এবং শব্দ যেন পরস্পরের পরিপূরক। সে বিস্মিত হল। জন্মাবধি সে এমন শব্দ শোনেনি। কৌতূহলে সে অরণ্যের বিপরীত প্রান্তে যাত্রা করল। জলধারার কাছাকাছি যেতেই সে বুঝতে পারল, শব্দ বর্ধিত হচ্ছে। অরণ্যের শেষ আড়ালে দাঁড়িয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ওই ভাসমান সুদৃশ্য আশ্রম তো সে কখনও দ্যাখেনি। হিংস্র জলচরদের উপেক্ষা করে কি সুন্দর আশ্রম জলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ ভেসে আসছে ওই আশ্রমের ভেতর থেকে। তার স্মরণে এল পিতৃদেব একেই সঙ্গীত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিজেও অনেক শ্লোক সঙ্গীত হিসেবে গেয়ে থাকেন। তাঁর কর্কশ কণ্ঠের সঙ্গে এর তুলনা করাই যায় না। কিন্তু কোন প্রাণের অস্তিত্ব ওই আশ্রমে দেখা যাচ্ছে না। সে কিছুক্ষণ বিমোহিত হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করল। কিন্তু তখনই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠতেই মুখ ফেরাল। সে দেখল, কিঞ্চিৎ দূরে একটি শার্দুল পা মুড়ে শরীর টান টান করছে। তার লক্ষ্য কুরঙ্গীর দিকে যে তার অজান্তে অনুসরণ করে এখানে এসেছে। এই ভঙ্গির সঙ্গে সে পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে ক্রোধ জন্ম নিল। আর সে বিস্মিত হয়ে দেখল শার্দুলটি অকস্মাৎ ভস্ম হয়ে গেল। ক্রোধ সংবরণ করে সে নিজের শৃঙ্গে হাত দিল। এরকম ঘটনা তার জীবনে কখনও ঘটেনি। এটাই কি সেই তেজ, যার কথা পিতৃদেব বলেছিলেন ? সে একবার পেছন ফিরে তাকাল। তখনও ভাসমান আশ্রম থেকে সঙ্গীত ভেসে আসছে। তার স্মরণে এল পিতৃদেব বলেছিলেন, অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করো না। সে উন্মত্তের মত ছুটে ফিরে এল আশ্রমে। তার হৃদয় একই সঙ্গে বিস্ময় এবং আনন্দে আলোড়িত হচ্ছিল। ক্রুদ্ধ হলে শরীর থেকে যে জ্যোতি নির্গত হয় তাতে শার্দুল ভস্মীভূত হয়েছে : এ কি ক্ষমতা তার ? কে তাকে এই ক্ষমতা দিল ? তিনিই কি পরমপিতা ঈশ্বর ? বিস্ময় এই কারণে। আর আনন্দ সেই সঙ্গীতের মূর্ছনায়, যা এখনও তার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : সে কুরঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি মায়া ? না সত্যি, তুই জানিস ?'

অবলা জীব মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। সে

বারবার তার মসৃণ ক্ষুদ্র শৃঙ্গে হাত ঘষতে লাগল। পিতৃদেব থাকলে সে নিরাপদ হত। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকেই বিচিত্র কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে। শৃঙ্গ ঘর্ষণে চিত্ত শান্ত হতেই তার কান সজাগ হল। মধুর একটি ধ্বনি এগিয়ে আসছে। যেন কারও পদক্ষেপে সেই ধ্বনি ছন্দিত হচ্ছে। সে সোজা হয়ে বসল। কুরঙ্গীও চঞ্চলা হয়েছে। আলস্য ত্যাগ করে শব্দের বিপরীত দিকের অরণ্যে প্রবেশ করল কুরঙ্গী। এখন সে একাকী। জীবনে প্রথমবার অন্য ধবনের আশঙ্কা বোধ করল সে। ওই শব্দে জাদু আছে। কিন্তু উৎস সন্ধানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই ঝরনার মত এই দিকেই ধেয়ে আসছে ছন্দিত শব্দ। এবং তারপরেই তার চক্ষু স্থিব হয়ে গেল। একি অবলোকন করছে সে? এ কোন প্রাণী? অরণ্যেব আড়াল ছেড়ে যে পৃথু নিতম্বিনী অলস পদচারণা করছে সে কে? একেই কি মায়া বলে? এই মায়াণ প্রকৃত রূপ কি? ওই সচল দিব্যচন্দনচর্চিত, বিলোল-হারাবলিললিত, পীনোন্নত বক্ষ বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হয়ে যে আশ্রমের পূবদিকে এগিয়ে আসছে তার দিকে নেত্রপাত মাত্র হৃদয়ে ভূকম্প হচ্ছে কেন? সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শৃঙ্গে হাত দিল। এবং তখনই হাস্যমুখে সেই প্রাণী এগিয়ে এল তার সামনে। চম্পকনিন্দিত আঙ্গুলযুক্ত করে বিনীত হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'মুনে! তাপসগণের কুশল তো? এই অরণ্যে ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তো? তাপসগণের তো তপোবৃদ্ধি হচ্ছে?'

শুষ্ক কণ্ঠ থেকে স্বর নির্গত হল কোনবকমে তার, 'এই আশ্রমে তো অন্য কোন তাপস নেই।'

মুখে আঙ্গুল চাপা দিয়ে আকর্ষণীয় প্রাণীটি ফিরে দাঁড়াল। যেন হাস্য সংবরণ করল। ত্রিবলীদামমনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা। তার গিরিবরবিস্তীর্ণ রশনারঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থল। চকিতে ভ্রুক্ষেপ করে আবার প্রশ্ন নিবেদিত হল, 'বেশ, আপনাব পিতার তেজহানি হয়নি তো? বেদপাঠে আপনি কিরকম আনন্দ পান? আমি সামান্যা জীব, আপনার দর্শনলালসায় এই অরণ্যে আগমন করেছি।'

হঠাৎ সে আবিষ্কার করল কোন অদৃশ্য কারণ তার শক্তি হরণ করেছে। তবু সে উঠে দাঁড়াল। পিতৃদেব আশ্রমে নেই কিন্তু তার পক্ষে যতটা সম্ভব উপায়ে সে এই আশ্রমের সম্মান রাখবে। সে বলল, 'মহাশয়, আপনি তেজঃপুঞ্জের মত প্রকাশিত হয়েছেন। সন্দেহ নেই, আপনি আমার অভিবাদনীয়। কিন্তু আপনার ধর্ম আমি জানি না। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমার ধর্মানুযায়ী আপনাকে খাদ্য ও ফলমূল প্রদান করি। অনুগ্রহ করে এই কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত সুখস্পর্শ কুশময় আসনে উপবেশন করুন। হে ব্রহ্মণ্। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি কোন উপাসনায় নিজেকে নিয়োগ করেছেন?'

সুকোমলকুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছশোভিত সুদীর্ঘ কেশপাশ এক হাতে সরিয়ে বারবিলাসিনী এগিয়ে এল কয়েক পা, 'হে ব্রাহ্মণ' ওই ত্রিযোজনবিস্তৃত পাহাড়ের উল্টোদিকে আমার আশ্রম। অভিবাদন গ্রহণ কিংবা পাদোদক স্পর্শ আমার ধর্ম নয়। আপনি আমাকে অভিবাদন করবেন না। কিন্তু আপনি আমার অভিবাদ্য! তা প্রকাশ করতে অনুমতি দান করুন।'

সে বলল, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমলক, ইঙ্গুদ, ধম্বন প্রভৃতি সুপক্ক ফল নিশ্চয়ই আপনি উপভোগ করতে পারেন। আপনি অতিথি, এই সেবা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।'

বারবিলাসিনী হাসল, 'আহারে এখন আমার প্রবৃত্তি নেই। বরং আমি আপনার জন্যে কিছু খাদ্যদ্রব্য এনেছি। সেগুলো গ্রহণ করার পর আপনাকে অভিবাদন করব। অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দান করুন।'

সে চারপাশে তাকাল 'আপনার হাতে তো কিছু দেখছি না ব্রহ্মণ!'

বারবিলাসিনী কূর্মপৃষ্ঠের মত কিঙ্কিনীকিণলাঞ্ছিত পদদ্বয় ত্বরান্বিত করে মুহূর্তেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তার মনে হল যেন অমাবস্যার কালরাত্রি পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করেছে আশ্রমের চাতালে। কিন্তু তারপরেই যে মুখদর্শনে শশধরও লজ্জিত হবেন তা প্রকাশিত হল। সূক্ষ্ম বসনাবৃত তার অনিন্দনীয় জঘন দর্শনে বক্ষদেশ গ্রীষ্মের দুপুর হয়ে গেল। বারবিলাসিনীর হাতে সুদৃশ্য পাত্র এবং সেখানে অমূল্য খাদ্যদ্রব্য সাজানো। তার সামনে অর্ঘ্যের মত নিবেদন করে সে আবার হাসল, 'এসবই আমি নিজের হাতে আপনার জন্যে প্রস্তুত করেছি। যদি গ্রহণ না করেন তাহলে অপমানে জর্জরিত হব।'

সে মুগ্ধদৃষ্টিতে আহার্যের দিকে তাকাল। এ কিরকম আহার্য? ফল এবং মূল ছাড়া সে জন্মাবধি কিছু আহার করেনি। সঙ্কোচ তাকে যখন আচ্ছন্ন করছে তখন সেই কোকিলনিন্দিত কণ্ঠ বলল, 'জীবে দুঃখ দেওয়া কি ব্রহ্মণের উচিত কাজ হবে?'

মুহূর্তেই সে দ্বিধা ত্যাগ করল। কম্পিত হাতে সে কিছুটা খাদ্যদ্রব্য তুলে নিল। মুখে দেওয়ামাত্র মনে হল এক অনির্বচনীয় স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত দেহে। এই বিশ্বচরাচরে এমন খাদ্য আছে যা তার অজ্ঞাত ছিল? মুহূর্তেই তার ক্ষুধা বর্ধিত হল। পাত্রটি নিঃশেষ করার পর সে বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ।'

'ছিঃ। এই সামান্য কারণে কেন কৃতজ্ঞ হবেন। আর এ এমন কি খাবার. এর চেয়ে বহুগুণ সুস্বাদু খাদ্যবস্তু আমার আশ্রমে আছে। আসুন এবার এই পানীয় পান করুন। বারবিলাসিনী তাকে সুরামিশ্রিত পবিত্র জল পান করতে দিল। তার মিষ্ট অথচ উত্তেজক স্বাদ গ্রহণ করে সে পুলকিত হল।

তৃপ্ত কণ্ঠে সে এবার প্রশ্ন করল, 'ব্রহ্মণ। আপনার পরিচয় ব্যক্ত করুন।'

বারবিলাসিনীর ভ্রূভঙ্গে পৃথিবী যেন টলে উঠল, 'কি জানতে চান বলুন।'

'আপনি কি মানুষ না দেবতা?'

'আমি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ।' কথাটা শেষ হতেই দীর্ঘশ্বাস মোচন করল নারী।

'আপনি কি ধরনের মানুষ? আপনার শৃঙ্গ নেই। পিতা কিংবা দেবর্ষি নারদের মত শুষ্ক নন আপনি। আমার মত স্বাস্থ্যবানও নন। অথচ আপনার অঙ্গ থেকে যে জ্যোতি এবং বাস নির্গত হচ্ছে তা ওই ভ্রমরকেও আকর্ষণ করছে। আপনার আগে আমি দুজন মানুষ এবং ব্রহ্মর্ষিকে দেখেছি। কিন্তু আপনাকে দেখামাত্র আমার হৃদয় চঞ্চল হচ্ছে কেন?' সে সরল এবং কাতর স্বরে জানতে চাইল।

বারবিলাসিনী চকিত সরে গেল। একটি হাতে মুদ্রা প্রকাশ করে বলল, 'আমি মানবী।'

'মানবী ? সে কি বস্তু ?'

এবার বারবিলাসিনী স্তম্ভিত হল। তার মাতা প্রবীণা যা যা নির্দেশ দিয়েছে তা সে পালন করছে। কিন্তু এই তরুণ যে মানব এবং মানবীর প্রভেদ বুঝতে পারে না তা তার বিশ্বাসে ছিল না। এই সময় তরুণ বলল, 'এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।'

ফলভারনত লতার মত বারবিলাসিনী দুলে উঠল, 'কি বুঝেছেন ?'

'আপনি নৃত্য গীতাদিতে পটু, তাই না ?'

'উম্ !' যুবতী জিহ্বাগ্র অধরে বোলাল, 'আমার নৃত্য দেখবেন ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে সুললিত নিতম্বাভিনয়, কম্পমান পয়োধর, মনোহর হাবভাব বিলাস এবং কটাক্ষ—অনিন্দ্যসুন্দর নৃত্য শুরু করল। যুবতীর শরীরে এখন বর্ষাপ্লাবিত ঝরনার ঢল নেমেছে। চাতালের সর্বত্র তার শরীর ময়ূরীর মত ছন্দ তুলছে। তরুণ তাপস মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দর্শন করছিল। নৃত্য শেষ হলে মুক্তোর মত স্বেদবিন্দু দৃশ্য হল বারবিলাসিনীর নাসাগ্রে। সে বলল, 'আপনি অপ্সরা। আপনার নাম উর্বশী। আপনি সুরলোকের নর্তকী। আহ্। এতকাল পরে আমি আপনার দর্শন পেলাম।' সঙ্গে সঙ্গে সে নতজানু হল, 'আমার জন্মের কারণ আপনি। কি সে কারণ তা আমার জানা নেই। কিন্তু আজ আপনার দর্শন পেয়েছি যখন আজ নিশ্চয়ই আপনি সব কথা বলবেন। আপনি আমার আরাধ্য।'

'না !' বারবিলাসিনী মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'না। আমি উর্বশী নই। আমি সামান্যা মানবী। আপনার জন্মের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই।'

'কিন্তু আপনি যে নর্তকী ?' তাপস বিভ্রান্ত হল।

'তাতে কি হয়েছে। উর্বশী দেবসভায় নৃত্য করেন আমি আপনার আনন্দের জন্যে নৃত্য করছি। আমার এই নৃত্য কি আপনার ভাল লাগেনি ?'

'আমি অভিভূত। অপূর্ব।'

বারবিলাসিনী এগিয়ে এল, 'কিন্তু আমি সেটা বুঝব কি করে ?'

তাপস অসহায়ের মত উচ্চারণ করল, 'হায়, কি করে বোঝাই।'

বারবিলাসিনী বলল, 'থাক, আর বোঝাতে হবে না। আমি বুঝে নিয়েছি।'

শোনামাত্র তার মনের ভার লাঘব হল। পিতৃদেব কখনও তার অনুচ্চারিত কথা নিজে থেকে বুঝে নেননি। এ যদি মানবী হয় তাহলে অবশ্যই অনেক উন্নত শ্রেণীর। এই সময় মানবীর মুখের দিকে নজর পড়তেই সে বিস্ময় দেখতে পেল। চকিতে দূরত্ব দূর করে মানবী তার লতানো কেশরাজি থেকে একটি শুষ্ক পত্র তুলে নিল মৃণালসদৃশ হাতে, নিয়ে বলল, 'আহা এই পাতাটির কত ভাগ্য।'

হাতের স্পর্শ যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করতে পারে তা সে জানতো না। শরীরের সমস্ত রোমকূপ এখন কদম্বের মত বিস্ফারিত। সে কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কেন ?'

ছোট্ট একটি বক্রভঙ্গি অধরকে মারাত্মক ভাষা দিল, 'আপনার কেশে যে স্থান পায় সে কি ভাগ্যবান নয় ? বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মত পুরুষ দেখিনি।'

'পুরুষ ? পুরুষ কি ? আমি তো মানব।'

'বেশ তাই। এবার আমাকে আমার ধর্মমতে আপনাকে অভিবাদন করার অনুমতি দিন।'

তাপস সম্মতি দিল কি দিল না ভ্রূক্ষেপ না করে বারবিলাসিনী মদাভিভূতার মত তাকে আলিঙ্গন করল। তার সুডৌল দুটি হাত লতার মত তাপসের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল। তার মুখ সেই বলশালী বক্ষে ন্যস্ত হতেই তাপস পাথর হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ, জগৎসংসার মুছে গেল সামনে থেকে। হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। যুবতী সেই সময় অধর মুহূর্তের জন্যে তাপসের বক্ষে স্পর্শ করে ছিটকে সরে গিয়ে হাসিতে হিল্লোলিত হল। তাপস আর্তনাদ করল, 'না, মানবী তুমি সরে যেও না। তোমাকে আমি স্পর্শ করতে চাই। দয়া কর আমাকে।' বারবিলাসিনী কপট চোখে তাকাল, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি। আমার সমস্ত সত্তা এখন তোমার স্পর্শ কামনা করছে।' সে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল উন্মাদের মত। বারবিলাসিনী কয়েক পা পিছিয়ে গেল। শনৈ শনৈ কটাক্ষপাত করে তাপসের হৃদয়ে বন্যা আনল। তারপর বলল, 'বেশ, আপনি দু চোখ বন্ধ করুন। যদি আপনার হৃদয়ে আমার ছবি দেখতে পান তাহলে আমাকে স্মরণ করলে আমি আবার আসব। প্রথম দর্শনে দুইবার অভিবাদন জানানো আমার শাস্ত্রবহির্গত।' তাপস চোখ বন্ধ করতেই বারবিলাসিনীর অনিন্দ্যরূপ দেখতে পেল। সে উৎফুল্ল হয়ে চোখ খুলতেই কোথাও তাকে দেখতে পেল না। যেন হৃদয় অগ্নিস্পর্শ পেল, উন্মাদের মত সে ধাবিত হল চারপাশে। কিন্তু কোথাও সেই মানবী নেই। যে এসেছিল, দুই চরণে শব্দ নিয়ে মিলিয়ে গেছে নিঃশব্দে। এ কি তবে সেই মায়া যা দেবতারা সৃষ্টি করেন সাধনা ভঙ্গ করতে ? কিন্তু এখনও যে শরীরে রোমাঞ্চ রয়েছে স্পর্শের। স্পর্শ কি করে মায়া হতে পারে !

মদন-মত্ত এবং বিচেতন হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগল সে। শৃঙ্গটি করাঘাতে টনটন করছে কিন্তু চিত্ত স্থির হচ্ছে না। এমন মানবীর সান্নিধ্য ত্যাগ করার কথা এখন সে কোনমতে কল্পনা করতে পারছে না। মানবী যতক্ষণ এখানে ছিল ততক্ষণ গ্রীষ্মেও প্রকৃতি বসন্তের রূপ পেয়েছিল। পিকের ডাক তখন আরও সুমধুর মনে হয়েছিল। কিন্তু একজন মানুষ দেবতা বা অপ্সরাদের মত শূন্য থেকে আবির্ভূত হতে পারে না। তাকে আসতে হয়েছে ওই পর্বত কিংবা বারিধারা অতিক্রম করে। কিন্তু ওই কোমল অঙ্গ সেই ক্লেশ ধারণে কি করে সম্ভব হল। তাপস নিজের শরীরে হাত রাখল। এতদিন এইসব পেশি তাকে শক্তি দিত। অথচ আজ এরা কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অথচ সেই মানবীর শরীরে কোথাও পেশি নেই। নিতম্ব এবং বক্ষদেশের স্ফীতি প্রমাণ করে যে সেখানে অন্য কোন রহস্য আছে। আর সেই রহস্যের প্রভাবে তার সবল পেশিগুলো স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সে আচ্ছন্নের মত বসে রইল। তার হৃদয় এখন বিদীর্ণ হচ্ছে। এই সময় স্পর্শ পাওয়ামাত্র সে চমকে উঠল। এতক্ষণ কুরঙ্গীটির কথা তার স্মরণে ছিল না। অরণ্যে অন্তর্হিত ওই বয়োতীতা কখন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। অত্যন্ত স্নেহে তার শরীরে মুখ রাখছে। কিন্তু আজ এই স্পর্শ তার কাছে অসহ্য হল। বাম হাতের অবহেলায় কুরঙ্গীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চোখ ঢাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ চোখের পাতায় সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর রূপ প্রকাশিত

হল। রোমাঞ্চিত হয়ে সে সেই মানবীকে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল। কিন্তু হায়, বেলা গড়িয়ে যায়, সূর্যদেব সরে যান দিগন্তে কিন্তু কোন পদধ্বনি ওঠে না অরণ্যে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে, হৃদয়ে শুধু আর্তি, সে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল বারিধার উদ্দেশ্যে। তার কেবলই মনে হতে লাগল ওই যে ভাসমান আশ্রম ওখানেই মানবীকে পাওয়া যাবে। ওই ভাসমান আশ্রমেই এই অরণ্যে এসেছে ও। অরণ্যের প্রান্তে এসে সে অবাক হল। আশ্রমটি নেই দৃষ্টির সামনে। আদিগন্ত বারিধারা শম্বুকগতিতে বয়ে চলেছে। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। এই কি প্রহেলিকা। এই বিচিত্র মানবী যাকে সে দর্শন কবল, যার স্পর্শ পেল তার কথা পিতৃদেব কখনও বলেননি। সে ঠিক করল আশ্রমে ফিরে গিয়ে আসনে বসবে। চিত্তকে স্থির করতে হবে। সেই স্থিরচিত্তকে শূন্যে নিয়ে গিয়ে অন্বেষণ কাজে নিয়োগ করবে। বিহ্বল তরুণ তাপস যখন ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে আসছিল তখনই সে চমকে উঠল। তার শরীরে পুলক এল। উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করল, 'পিতা!'

বিভাণ্ডক ঋষি এখন আশ্রমের চাতালে দাঁড়িয়ে। তাঁকে সিংহের মত পিঙ্গলাক্ষ এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। বোঝা গেল পুত্রকে তিনি অনেকক্ষণ লক্ষ করেছেন। সে দূরত্ব অতিক্রম করে পিতৃদেবের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করল, 'পিতা, এক অপরাধের দুইবার শাস্তি কেন? অভিশাপ দিয়েও আপনি আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'কিন্তু করেছ। পৃথিবীর কোন শোকই অসহ্য নয়। সময় সব সময় সেই ক্ষত নিরাময় করে। কিন্তু বৎস, আশ্রমের এই অবস্থা কেন? তুমি কোন কারণে আজ সমিধ আহরণ করোনি? কি কারণে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করোনি? হোমধেনুকে পীতবৎসা কেন করেছ?'

সে সচকিত হল। সত্যি, আজ এসব কাজ করা হয়নি। কাজগুলো করার চিন্তা তার মাথায় আসেওনি। সে লজ্জিত হয়ে মুখ নামালে বিভাণ্ডক, বিস্মিত হলেন। পুত্রের মুখের এই অভিব্যক্তি তিনি কখনও দর্শন করেননি। তিনি বললেন, 'তোমাকে ঠিক আগের মত মনে হচ্ছে না। তুমি কি ঠিক আছ পুত্র?'

সে নিশ্চুপ রইল। বিভাণ্ডক নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করলেন, 'এ দেখছি দীনভাবাপন্ন, চিন্তাপরায়ণ!' তারপর যতটা সম্ভব সহজ স্বরে চেষ্টা করলেন প্রশ্ন করতে। 'বল তো দেখি, আমি চলে যাওয়ার পর এই আশ্রমে কোন ব্যক্তি আগমন করেছিল। কারণ আমার অদর্শন যদি তোমার মনে দুঃখের উদ্রেক করে তবে দর্শনে সুখের প্রাবল্য নেই।'

সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, 'পিতা। আপনার অনুপস্থিতিতে দেবর্ষি নারদ প্রথমে এখানে আগমন করেন। তিনি আপনার সন্ধান চান এবং আমাকে নানা উপদেশ দান করেন।'

'নারদ? এখানে। আশ্চর্য!' বিভাণ্ডক বিস্মিত হলেন, 'কি বলেছেন দেবর্ষি?'

'দেবরাজ ইন্দ্রের সভার নর্তকী উর্বশী আমার জন্মের কারণ।'

বিভাণ্ডক চোখ বন্ধ করলেন। তিনি এই প্রসঙ্গের অবসান কামনা করলেন।

অতএব দ্রুত প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আজ বলেছ প্রথমে দেবর্ষি এসেছিলেন। তাহলে কি জানব পরে কেউ এসেছিল ?'

'হ্যাঁ পিতা। আজ এই আশ্রমে নাতিখর্ব এবং নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী এসেছিল। তাকে অবলোকন করলে দেবতা বলে প্রতীতি হয়।' সে নিবেদন করল।

'দেবতা ? তুমি দেবতার দর্শন পেয়েছ ? অসম্ভব ! কি নাম তার ?'

'নাম আমি জানি না। তিনি পরিচয় প্রকাশ করেননি !'

'তাহলে বুঝলে কি করে তিনি দেবতা। তিনি দেখতে কেমন ?'

'তাঁর বর্ণ স্বর্ণচম্পকের মত, চোখ পদ্মের মত আয়ত এবং স্নিগ্ধ, তার মনোহর রূপ থেকে সূর্যের মত প্রভা বের হচ্ছিল। তার মস্তকের সুদীর্ঘ নীলনির্মল জটাভার সুদৃশ্য রজ্জুতে গ্রথিত। গলায় আকাশবিকাশিনী সৌদামিনীর মত আলবাল বিলম্বিত রয়েছে। ললাটে শৃঙ্গ নেই। লোমশূন্য বুকে অতি মনোহর গোল দুটি মাংসপিণ্ড সজাগ। কটিদেশের ক্ষীণতায় চমকিত হতে হয়। তিনি বল্কল পরেননি কিন্তু তাঁর পরণের আবরণ আমি কখনও দেখিনি আগে। দুপায়ে সমুধুর শব্দমান এক আশ্চর্য বস্তু দীপ্তি পাচ্ছিল। এসব বলা সত্ত্বেও আমি আপনাকে তাঁর বর্ণনা সঠিকভাবে করতে সক্ষম হচ্ছি না বলেই বোধ হচ্ছে।' সে চোখ বন্ধ করেই কল্পনা করছিল। পুত্রের বিচেতন মুখের দিকে তাকিয়ে বিভাণ্ডকের স্মৃতিতে উর্বশীর রূপ ভেসে উঠল। তবে কি তাঁর অসাক্ষাতে উর্বশী এখানে এসেছিল ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরও একটু বিশদ হও পুত্র। তুমি যে বর্ণনা করলে তাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ চিহ্নিত হয় না। তাঁর আচরণ কি রকম ?'

নবীন সন্ন্যাসীর মুখে যেন দীপ্তি এল স্মরণমাত্র, 'তিনি হাত বা পা সঞ্চালন করেন,তাঁর হাতের কলাপক কিংবা পায়েব সেই অদ্ভুত বস্তু সরোবরবিহারী মত্ত মরালকুহেব মত কলরব করতে থাকে। তিনি যখন কথা বলেন তখন হৃদয়ে আহ্লাদ এবং পুলক জাগে। বসন্তকালে কাননে সুগন্ধী মলয় প্রবাহিত হয়। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারীর অঙ্গ থেকে তার চেয়ে মনোহর সৌরভ আমি পেয়েছি। তাঁর সুসংযত জটাসমূহ ললাটদেশে বক্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। আমি সেই অনুপম ব্রহ্মচাবীকে দেখে পুলকিত। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে তাঁর অধর আমাব বুকে বিন্যস্ত করে যে শব্দ করেছিলেন তাতে আমাব সমস্ত রোমকূপে কদমফুল ফুটে উঠেছিল।'

বিভাণ্ডকের মুখে এবার প্রচণ্ড উত্তাপ, 'তিনি আর কি করেছিলেন ?'

নবীন সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে বলে যেতে লাগল, 'আমি তাঁকে যেসব ফল প্রদান করেছিলাম তিনি তা গ্রহণ করেননি। বরং আমাকে তাঁর খাদ্যদ্রব্য দিলেন। বললেন ওটাই তাঁদের ব্রত। সেইসব খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ আমি আগে কখনও পাইনি। এই অরণ্যের ফল তার তুলনায় তুচ্ছ। সেই উদারমূর্তি ব্রহ্মচারী আমাকে পান কবার জন্যে যে সলিল প্রদান করেছিলেন তা পান করার পর চিত্ত হৃষ্ট হয়েছিল এবং সেই সময় পৃথিবীকে কম্পমান বলে মনে হয়েছিল। পিতা, তিনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছেন। আমার বাসনা যে তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করি যাতে তিনি এই অরণ্যে চিরকাল তপশ্চর্যা করেন। তাহলে আমিও তাঁর

সঙ্গে তপোনুষ্ঠান করতে পারব। পিতা, তাঁর অদর্শনে আমার চিত্ত অত্যন্ত কাতর।'

বিভাণ্ডকের ক্রোধ তাঁর বাকরুদ্ধ করল কিছুক্ষণ। তারপর তিনি চিৎকার করলেন, 'হে মূর্খ, তুমি কি পঙ্কে পতিত হয়েছ তা বুঝতে পারছ না। ছি ছি ছি।'

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পিতা, কি দোষে আপনি আমায় ভর্ৎসনা করছেন ?' কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভাণ্ডক নিজেকে সংযত করলেন 'বৎস ! মন দিয়ে শোন। অমিত পরাক্রমশালী রাক্ষসরা অদ্ভুত রূপ ধারণ করে তপোবিঘ্ন বাসনায় সবসময় ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে তারা অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়ে বনবাসী মুনিদের প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। পরে ভীষণমূর্তি ধারণ করে তাদের সনাতন সুখ ও পুণ্যলোক থেকে ভ্রষ্ট করে। তাপসদের বিপন্ন করাই সেই সব পাপাচারপরায়ণ রাক্ষসদের খেলা। সেই অসাধুরা অপেয় পাপময় মদ্য সলিল হিসেবে পান করতে দেয়। মুনিদের সেদিকে নেত্রপাত করা অনুচিত। এই আগন্তুক রাক্ষস, ব্রহ্মচারী নয়।'

সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলল, 'পিতা, আমি জানি না আমার কান এইমাত্র যা শুনল আর যা দেখেছে তার মধ্যে কোনটি সত্যি। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে পুলক জেগেছে তা তো কখনই মিথ্যে নয়। তিনি বলে গিয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে স্মরণ করলেই তাঁর দর্শন পাব। আপনার কথা শোনার পরেও তাঁর সম্পর্কে আমার আগ্রহ নষ্ট হচ্ছে না। পিতা, দেবতাদের দর্শন পাওয়ার সাধনায় সমস্ত জীবন মগ্ন থেকে আপনি অস্থিসার হয়েছেন। অথচ সেই ব্রহ্মচাবী অতীব মনোহর, দিব্য রূপের অধিকারী। তাঁর তপস্যার প্রণালী জানতে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

বিভাণ্ডক হতভম্ব। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিভাবে এই সরলমতিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনবেন। ধ্যানে মগ্ন না হলে তিনি সেই রাক্ষসের সন্ধান পাবেন না। তারপরেই তাঁর স্মরণে এল পুত্রের কণ্ঠে তিনি যে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দিয়েছেন তাতে কোন রাক্ষস তো দূরের কথা অপ্সরারাও কাছে আসতে সাহস পাবে না। তাহলে এ কে ? তিনি বিভ্রান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'সেই আগন্তুক যাকে তুমি ব্রহ্মচারী বলছ, তার পরিচয় কি ?'

সে উত্তর দিল, 'তিনি পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন তিনি মানবী। পিতা মানবী কি ? তাঁরা কি অন্যজাতের মানুষ ? কলাপের যেমন কলাপী তেমনই কি মানুষের মানবী ? দয়া করে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করুন।'

বিভাণ্ডক চমকে উঠলেন। মানবী। মানবী কি করে এই অরণ্যে এল। ওই মহাহ্রদ, ঊর্মিমুখর কৌশকী নদী, এই বিশাল পর্বত অতিক্রম করে কোন মানুষের এখানে আসা যখন অসম্ভব তখন একজন সামান্যা মানবীর কি করে আগমন সম্ভব হল ? কিন্তু এখন উত্তেজনা পরিহার করা দরকাব। পুত্রকে সৎপথে চালিত করা পিতার কর্তব্য। তিনি হাসলেন, 'কলাপ কলাপী, কুরঙ্গ কুরঙ্গী জ্ঞানহীন চৈতন্যহীন জীব। সাধারণ মানব মানবীও তাই। আমরা যারা তপস্যার মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি তারা এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। পুত্র, সেই আগন্তুক যদি মানবী হয় তাহলে তার ওই অপরূপ শোভায় বিভ্রান্ত হয়ো না। মানবী সমস্ত দুঃখের আধার। বিষাক্ত ফলেরা যেমন আকৃতিতে সুন্দর হয় তারাও

তাই। একজন অপ্সরা খুব সামান্য সময়ের জন্যে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কারণ দীর্ঘকাল তোমায় সঙ্গ দেবার সময় তাদের নেই। কিন্তু মানবী হল সেই জলৌকার মত, যা তোমাকে রক্তশূন্য করেও পরিত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা শৌচ এবং শমগুণে অলঙ্কৃত তার ইন্দ্রিয়সংযম অত্যন্ত জরুরী। একজন মানবী তাঁর এই সব গুণ মুহূর্তেই নষ্ট করে নরকের পথে পরিচালিত করতে পারে। অতএব সেই মানবীকে বিস্মরিত হও। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখের চেয়ে মানবীজাত দুঃখ প্রবলতর।'

বিভাণ্ডক অত্যন্ত অশান্ত চিত্তে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যে মানবী এখানে এসেছে সে নিশ্চয়ই ফিরে যায়নি। এই গভীর অরণ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। সারাদিন ধরে তিনি সমস্ত অরণ্য পরিভ্রমণ করে বারিধারার কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পেলেন না। তীর ধরে সমস্ত অরণ্য হেঁটে বেড়ানোর ক্ষমতা যদি তাঁর থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বজরাটিকে দেখতে পেতেন। শেষ পর্যন্ত বিভাণ্ডক স্থির করলেন আসনে বসে তিনি মানসপরিভ্রমণ করবেন।

নবীন সন্ন্যাসী পিতৃদেবের উপদেশ মন দিয়ে শুনেছিল। তিনি কখনই তাকে ভুলপথে চালন করেননি অতএব এখন তাঁকে মান্য করাই কর্তব্য। সে নিজেকে প্রাণপণে স্থির করে অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করার জন্যে দুই চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখ তার মানসনেত্রে ভেসে উঠল। সেই মানবীর হাঁটা-চলা, কথা বলা, তাকানো, মুহূর্তেই স্মরণে আসায় তার সমস্ত ধমনীতে জোয়ার এল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ওই মানবী কিংবা ব্রহ্মচারী ডান হাতে একটি বৃত্তাকার বিচিত্র ফল গ্রহণ করলেন। অনায়াসে সেই ফলকে বারংবার মাটিতে নিক্ষেপ করলে সেটা ওপরে উঠছিল আবার নিচে নামছিল আর তিনি হিল্লোলিত তরুর মত ঘুরে ঘুরে তাকে অভিঘাত করছেন। এ দৃশ্য দেখামাত্র সে আসন ত্যাগ করল। এই মানবী যদি দুঃখের আধার হয় তাহলে তাঁকে ঈশ্বরই প্রেরণ করেছেন। জাগতিক সমস্ত দুঃখের মধ্যে মানবী যদি সেবা দুঃখদায়ক হয় তাহলে একটি মানবীকে অধিকার করতে পারলেই দুঃখকে জানা হয়ে যাবে। এই অভিশাপই তো পিতৃদেব তাকে দিয়েছেন। সে তার শৃঙ্গে হাত বোলাল। ধীরে ধীরে তার চিন্তা স্থির হয়ে এল। ওই মানবীকে জানতে হবে এবং সেটা করলে পিতৃদেবকে অস্বীকার করা হবে না। কারণ এই মুহূর্তে সমস্ত চরাচরে সে কেবল ওই মানবীকেই দেখতে পাচ্ছে। ওই সর্জ, অশোক, তিলক তরুর নিচে তিনি কি অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন তার বক্ষে বক্ষ স্পর্শ করিয়েছিলেন তিনি তখন কি অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল মনে। জন্মাবধি সেই আনন্দের স্বাদ সে পায়নি। তারপরেই তাঁর শেষ কথা মনে এল। নবীন সন্ন্যাসী আবার আসনে বসল। তিনি বলেছিলেন দর্শনাকাঙ্ক্ষা এলে স্মরণ করতে। সে চোখ বন্ধ করে ওই অপরূপার শরীর কল্পনা করতে লাগল। এই সময় ক্লান্ত বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এলেন। পুত্রকে সাধনায় মগ্ন হতে দেখে তিনি খুশি হলেন। উপদেশে কাজ হয়েছে মনে করে তিনি নিজের আসনে বসলেন। অনেক চেষ্টার পর রাক্ষসকুলে চিন্তাশক্তি নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথাও কোন চক্রান্তের সন্ধান পেলেন না। তারপর অপ্সরাদের দিকে নিজেকে

ধাবিত করতে যেতেই মনে পড়ে গেল তাঁর। অনেক কাল আগে একদা উর্বশীকে দর্শনমাত্র তার রেতঃ স্খলিত হয়েছিল। যদিও এখন তার শরীর অস্থিসার, দেহে কোন উত্তাপ পরিভ্রমণ করে না তবু কোন নবীনা উর্বশী যে জাদু সৃষ্টি করতে পারবে না তাই বা কি করে বলা যায়। সাধ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার কি দরকার।

প্রত্যূষে উঠে বিভাণ্ডক বৈদিকবিধি অনুসারে গভীর অরণ্যে ফল আহরণ করতে গেলেন। নবীন সন্ন্যাসীর তখন প্রায় সমাধির অবস্থা। তার ত্রিভুবন তখন সেই মানবীতে আচ্ছন্ন। বিচেতন হয়ে সে ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছিল যেন সেই মানবীতে। এই সময় কুরঙ্গীর আঘাতে তার চৈতন্য হল। মুহূর্তেই অরণ্য, পাখির ডাক, প্রভাতের রোদ তার সেই কল্পনার জগত মুছে দিল। সে দেখল কুরঙ্গী তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। এবং তখনই সে নিজের বুকে অদ্ভুত দাহ অনুভব করল। দুচোখে অশ্রুধারা নেমেছে অনেকক্ষণ। অর্থাৎ কুরঙ্গী তাকে ব্যথিত দেখেই জাগরণে ফিরিয়ে এনেছে। সে দুহাতে কুরঙ্গীকে আলিঙ্গন করে তার গলায় মুখ রেখে বিলাপ করতে লাগল, 'আমায় একবার তাকে দেখতে দে। সে কেন এল যদি এমন করেই চলে যাবে।'

তখন নদীতটে আশ্রমসদৃশ তরীতে আর একটি প্রস্তুতি চলছিল। এইমাত্র সংবাদ সংগ্রাহক জানিয়েছে বিভাণ্ডক মুনি গভীর অরণ্যে গমন করেছেন। এবং নবীন সন্ন্যাসী একটি কুরঙ্গীকে আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করছে। সূর্যোদয়মাত্র প্রবীণা বারঘোষা সমস্ত বিলাসিনীদের নির্দেশ দিয়েছিল প্রসাধন এবং সাজসজ্জা শেষ করতে। এবার সে তার কন্যা বেশঘোষাকে কাছে ডাকল, 'এখন তোমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পরীক্ষাব সময় উপস্থিত। কৈশোব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছানো পর্যন্ত আমি যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাই এতকাল তোমাকে নিবিড় করে শিখিয়েছি। আজ তুমি তোমার শেখা সেই সব কামকলা প্রয়োগ করে ওই নবীন সন্ন্যাসীকে মুগ্ধ কর।'

বেশঘোষা বলল, 'মা, গতকালই তিনি যথেষ্ট মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। আমি ছাড়া অন্য কেউ গেলে হবে না?'

প্রবীণার ললাটে ভাঁজ পড়ল, 'তার মানে? কি কারণে অস্বস্তি?'

বেশঘোষা বলল, 'অগ্নির ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে তার হাত প্রসারিত করতে পারে সেই সন্ন্যাসী ঠিক তেমনি করেই আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে তিনি নরনারীর পার্থক্য জানেন না। আমি যখন আমার বক্ষের বাস মুক্ত করে তাঁকে আলিঙ্গন করলাম তিনি শুধু শিহরিত হলেন মাত্র, কিন্তু কোনরকম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন না। তিনি বারংবার আমার শরীরের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য পর্যালোচনা করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। তিনি সুস্থ সবল তরুণ। কিন্তু মনের দিক দিয়ে শিশুরও অধম। এই মানুষের সঙ্গে কোনরকম ক্রীড়া করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। অথচ তাঁকে দর্শনমাত্র আমি আকৃষ্ট, বিষম শর অনঙ্গের বশবর্তিনী। কিন্তু তিনি তো তরুর মত, তাঁকে— ।'

প্রবীণা হাত তুলে কন্যাকে থামতে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলা

হয়নি। যে কোন অবস্থায় ওই সন্ন্যাসীকে তুমি মুগ্ধ করবে কিন্তু কখনই শারীরিক সম্ভোগে তাঁকে প্ররোচিত করবে না। তোমার কোন অধিকার নেই ওঁর সঙ্গে মিলিত হবার।'

বেশঘোষা চিৎকার করে উঠল, 'মা!'

প্রবীণা বলল, 'হ্যাঁ। এটাই আদেশ। ওই অক্ষত পুরুষটিকে এই অবস্থায় অঙ্গদেশে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

বেশঘোষা তার মায়ের চরণে মাথা রাখল, 'তাহলে আমাকে মুক্তি দিন। দয়া করে অন্য কাউকে পাঠান। ওই সুন্দরকে দর্শন করামাত্র আমি পুলকিত। এতকাল আপনি আমাকে অনেক রাজপুরুষকে মুগ্ধ করতে বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি ইচ্ছায় অনিচ্ছায়। কিন্তু একে শুধু মুগ্ধ করব অথচ মিলিত হব না এমন আদেশ আপনি আমাকে দেবেন না। আমি জানি তিনি আমাকে দেখলেই চঞ্চল হবেন। সেই সময় কোন কারণে নিজেকে সংযত থাকতে বলছেন?'

প্রবীণা বলল, 'কারণ গীত, নৃত্য এবং শারীরিক ছলাকলার মাধ্যমে পুরুষের মন জয় করা আমাদের ব্যবসা। নিজস্ব শারীরিক আনন্দের কোন স্থান সেখানে থাকতে পারে না। তাছাড়া ওই ঋষিতনয়কে অটুট অবস্থায় না নিয়ে যেতে পারলে যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না। আজ অঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। তোমার ব্যক্তিগত কামনা সহস্র মানুষকে মৃত করবে, মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করবে তা নিশ্চয়ই তুমি চাও না।'

অনেক কষ্টে বেশঘোষা নিজেকে সংবরণ করল। তার মুখ চোখে একটি কাঠিন্য নেমে এল। প্রবীণার নির্দেশে সখীরা তাকে আবার সাজিয়ে দিল। সে তরী থেকে নামল স্থির পায়ে।

প্রভাতের অরণ্যে তখন পাখির কাকলি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে বেশঘোষা যখন পা ফেলছিল তখন নূপুরের শব্দ সেই কাকলিকে সমৃদ্ধ করছিল। তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল, পা ভারী হয়ে আসছিল কিন্তু কোন উপায় নেই।

নবীন সন্ন্যাসী সেই চরণধ্বনি শুনতে পেয়ে টান টান হয়ে বসেছিল। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কুরঙ্গী দ্রুত অরণ্যে মিলিয়ে গেল। ক্রমশ তাকে দেখতে পেল সে। গতকাল হলুদ রঙের আধিক্য ছিল আর আজ শরতের মধ্যরাতের আকাশ। বেশঘোষা কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে মদির হাসল, 'তুমি কি আমাকে স্মরণ করেছিলে?'

নবীন সন্ন্যাসীর যেন বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টায় সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বেশঘোষা শরীরের ভার এক চরণ থেকে অন্য চরণে নিয়ে এল, 'তাই তো আমি এলাম। আমি কথা দিলে কথা রাখি। তাই না?'

সে কথা খুঁজে পেল এবার, 'আমি, আমি কৃতজ্ঞ।'

বেশঘোষা বলল, 'ছিঃ। ও কথা বলতে নেই। আমি সামান্যা নারী।'

সে বলল, 'নারী?'

বেশঘোষা হাসল, 'হ্যাঁ, ঈশ্বরের সৃষ্ট সবচেয়ে রহস্যময় এবং সুন্দর সৃষ্টি।'

সে এক পা এগিয়ে এল, 'আমারও তাই বিশ্বাস। ঈশ্বর তোমাকে পরম যত্নে

সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তুমি নারী এবং মানবীও ?'

বেশঘোষা হাসল। যেন ঝরনা পাহাড় থেকে নেমে আসছিল প্রস্তর চূর্ণ করতে কবতে। তার বক্ষের আবরণ স্থানচ্যুত হল, 'একই। নারী এবং মানবীর মধ্যে পার্থক্য শুধু ভাবনার। আমি নারী এবং তুমি পুরুষ।'

সে বিচলিত হল। সম্পর্ক যেন জটিল হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'আমি ওসব কিছু জানতে চাই না। হে ব্রহ্মচারী, তুমি আমাকে তোমার আরাধনা শিখিয়ে দাও।'

বেশঘোষা বারংবার মাথা নাড়ল, 'আমাকে এভাবে কথা বলা উচিত নয়। আমি তোমাকে কি শেখাতে পারি। তুমি রূপবান জ্ঞানবান তাপস। তবে তোমাকে একটা কথাই বলতে পারি। তোমার সমস্ত জ্ঞানচর্চা মিথ্যে হয়ে যাবে যদি তুমি একটি নারীকে পরিপূর্ণ জানতে না পার। আমি তোমাকে সেই জানার কাজে সাহায্য করতে পারি মাত্র।'

নবীন সন্ন্যাসী আর একটু এগিয়ে এল, 'তোমাকে যত দেখছি তত পৃথিবীকে সুন্দর মনে হচ্ছে। আমার হৃদয়ে এমন কম্পন কখনও হয়নি আগে। তুমি অত দূরে থেকো না। এসো আমার বক্ষে এসো।' সে দুহাত বাড়াল।

'না।'

'না কেন ?' সে আর্তনাদ করে উঠল যেন।

'আমি যুবতী। যৌবনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। কিন্তু যা জীর্ণ যা শুকনো তার ধারে কাছে থাকতে চাই না আমি।' কটাক্ষ হানল বেশঘোষা।

তরুণ সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে নিজের শরীরের দিকে তাকাল, 'তুমি আমাকে জীর্ণ বলছ ?'

'না তুমি নও। তুমি বর্ষার মেঘের মত উদ্দাম, বসন্তের অরণ্যের মত কাম্য। তুমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। যৌবন তোমার শরীরে হীরক খণ্ডের মত, শুধু সে শিল্পীর আঘাতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ।'

'তাহলে কার কথা বলছ তুমি ?'

'তোমার পিতা ঋষি বিভাণ্ডকের কথা বলছি। তিনি সামনে এলে আমি শীতের তরুর মত পত্রশূন্য হয়ে যাব।' করুণ মুখ করল বেশঘোষা।

'না-না। তাহলে আমরা ওইদিকে গিয়ে কথা বলি চল। আমি লক্ষ করেছি পিতৃদেব কখনোই ওই দিকে যান না। শুনেছি যৌবনে তিনি ওইদিকেই সাধনায় বসতেন। অতএব ওখানে গেলে তুমি তাঁর দর্শন পাবে না।'

বেশঘোষা তার চাঁপার মত আঙ্গুল এগিয়ে ধরতেই নবীন সন্ন্যাসী তাকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে কম্পন এল। ধীরে ধীরে বেশঘোষা তাকে অরণ্যের প্রান্তে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বল তুমি কি চাও ?'

'আমি, আমি শুধু তোমাকে জানতে চাই।'

'কেন ?'

'আমি জানি না। শুধু জানি তোমাকে দেখলেই আমার দেহ-মনে প্লাবন বয়ে যায়।'

'সেই প্লাবন স্থির হলেই তো আমাকে ত্যাগ করবে, তাই না ?'

'না, কখনও না।'

'আর কিছু জানতে চাও না ?'

'ও হ্যাঁ। তুমি মানবী। মানবী মানে দুঃখের আধার। তোমাকে জানলে দুঃখকে জানা হবে।'

'কি ? আমি দুঃখের আধার ?' সুন্দরীর অধরে কুঞ্চন এল।

'হ্যাঁ। পিতৃদেব তাই বলেছেন।'

'তোমার পিতা মিথ্যেবাদী।'

'অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।' চকিতে সে ঘুরে দাঁড়াল।

বেশঘোষা অপাঙ্গে তাকে দেখল। তরপর দুহাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে মুখের টানে তার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাব্বা ! কি পিতৃভক্ত ! আমি সুখের আকর। আমার মধ্যে ডুব দিলে তুমি সুখের ঝিনুক পাবে। সেই ঝিনুকে আছে ভালবাসার মুক্তো।'

মুহূর্তেই সমস্ত অভিমান দূর হয়ে গেল তার। সেই পরাগের মত নরম শরীরের স্পর্শে সে ঘনঘন কম্পিত হচ্ছিল। যুবতী ধীরে ধীরে তার বক্ষদেশ চুম্বন করতে লাগল। প্রতিটি চুম্বনে যেন সুখের ছোবল পড়ছে সমস্ত অঙ্গে। ক্রমশ সে বিবশ হয়ে গেল। তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন অন্তর্হিত। সে কোনরকমে হাত তুলতে নারীর বক্ষের ওপর তা নাস্ত হল। এক মুহূর্ত মাত্র, বেশঘোষা কপট ভঙ্গিতে সরে গেল, 'না।'

ভঙ্গিতে কপটতা ছিল, কিন্তু বেশঘোষার সমস্ত শরীর আকাঙ্ক্ষায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল ; তবু তাকে বলতে হল, 'না, তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না।'

নবীন সন্ন্যাসী কাতর হল, 'কেন ? তুমি তো আমাকে স্পর্শ করছ !'

'আমি করছি কারণ আমার সেই অধিকার আছে।' অনেক চেষ্টায় নিজেকে কঠোর করল নারী।

'কি অধিকার ?'

'কারণ আমি তোমাকে জানি। তোমার শরীর জানি। তুমি আমার শরীর জানো ?'

'না। কিন্তু আমি জানতে চাই। দয়া করে আমাকে চিনিয়ে দাও।'

'বেশ। তুমি এবং আমি মানুষ। কিন্তু আমাদের আকৃতিগত পার্থক্য আছে ; তাই না ?'

'হ্যাঁ। সেটা কেন হল ?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এই যে হিরণ্যরজ্জুগ্রথিত সুদীর্ঘ নীল কেশরাজি এ কেবল নারীর হয়। আষাঢ়ের মেঘের মাতন জাগে এই কেশ দেখলে পুরুষের মনে। এই যে কমলেব মত আমার নয়ন, এর দিকে তাকালে পুরুষের ইচ্ছে করে সরসীতে অবগাহন করতে। আমার অধরের দিকে তাকাও। কথা না বলেও আমি অনেক কথা বলতে পারি এর সামান্য আন্দোলনে যা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।' নারী তার কেশরাজি পিঠে নিয়ে গেল।

সে বলল, 'ঠিক ঠিক।'

বেশঘোষা তার বক্ষে হাত দিল, 'এই সেই স্থান যার জন্যে যুগ যুগ থেকে পুরুষ পতঙ্গের মত ধাবিত হয়। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। তুমি নিজে রোমশ বক্ষের দিকে একবার তাকাও। ঈশ্বর ওখানকার কাঠিন্য ঢাকতে রোমরাজির সৃষ্টি

করেছেন। কিন্তু এই বর্তুলাকার দুটি মাংসপিণ্ড শ্রীফলের মত কঠোর অথচ নবনীব মত নবম। অহঙ্কাব এর সর্বত্র জড়িয়ে থাকে বলে এ এত উগ্র। লক্ষ কর এব চূড়ার চারধারে বৃত্তাকারে নীলাভ ছড়িয়ে। পর্বতের শীর্ষদেশের গরিমা ম্লান করেছে এই বৃন্ত।'

'কেন, কেন তোমাকে ঈশ্বর ওই ঐশ্বর্য দিয়েছেন ?'

বেশঘোষা হাসল, 'এই হল সুখের প্রথম লীলাস্থল। যার পরিণতিতে এখানে অমৃত তৈরি হয়। সেই অমৃতে শিশু জীবনধারণ করে।' বলতে বলতে সহসা কান্নার আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হল। নবীন সন্ন্যাসী সেই পরিবর্তন লক্ষ করে বিচলিত হল, 'কি হল তোমাব ?'

আত্মসংবরণ করল বেশঘোষা কোনমতে, 'কিছু না।'

তবপর নিজের কটিদেশে হাত রেখে বলল, 'এর ক্ষীণতা সিংহীর ঈর্ষা উদ্রেক করে।'

'তারপব ?'

এবার ম্লান হাসল বেশঘোষা, 'তারপর ? সে পাঠ আজ নয়। একদিনে অতিভোজনের কুফল ঘটতে পারে। শুধু জেনে রেখ, এই দুই কদলীসদৃশ উরুর সঙ্গমস্থল হল দেবতাগণেবও আকাঙ্ক্ষার স্থান। পুরুষদের সমস্ত পাপ অথবা পুণ্য নারী এই স্থানে গ্রহণ করে পূর্ণতা দেয। এর বেশি কিছু আজ জানতে চেও না।'

নবীন সন্ন্যাসী নতজানু হল বেশঘোষার সামনে, 'আমি দেবতাদের নমস্য বলে মনে করি না। পরমপিতা ঈশ্বরই আমার একমাত্র অভীষ্ট। সেই ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি কবেছেন। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি কি করলে আমি পূর্ণতা পাবো তা বলে দাও। তোমার মত সুন্দর আমি এই জীবনে কখনও দেখিনি।'

হাসিতে ভেঙে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে নবীন সন্ন্যাসীকে তুলে ধরল যুবতী, 'আমি সুন্দর। হয়তো। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী নাবী এই পৃথিবীতে রয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস কবি না।' সে দৃঢ় গলায় বলল।

'ওমা, কেন ?'

'এর চেয়ে কিছু সুন্দর হতে পারে না।'

'বেশ। আমি যদি তোমাকে দেখাতে পারি ?'

'কোথায় ?'

'ওই নদীতটে আমার ভাসমান আশ্রমেই তারা আছে।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু তোমাকে দুটো শপথ কবতে হবে।'

'কি সে শপথ ?'

'আগে প্রতিশ্রুতি দাও।'

'তথাস্তু।'

'প্রথমত, যদি আমার চেয়ে সুন্দরী কোন নারীকে দ্যাখো তাহলে আমাকে ত্যাগ কববে। অপাপবিদ্ধ তুমি। জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীই একমাত্র তোমার কাম্য হবে। দ্বিতীয়ত, কোন অবস্থাতেই তুমি ক্রুদ্ধ হবে না।' বেশঘোষা আবদার করল

যেন।

তরুণ সন্ন্যাসী ললাটের শৃঙ্গে হাত রাখল। তার হাতে যেন একটু পরিবর্তন ঠেকল। সে সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বলল, 'কথা দিলাম।'

বেশঘোষা বলল, 'তাহলে আর দেরি কোরো না। আমার ভাসমান আশ্রমে চল। নাহলে তোমাব পিতা জানতে পারলে তোমার যাওয়া হবে না।'

তরুণ সন্ন্যাসীর মনে কথাটা ধরল। সে বলল 'হ্যাঁ, পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। শীত কখনও বসন্তকে সহ্য করতে পারে না। চল, আমি দূর থেকে একবার দেখেই ফিরে আসব।'

'ফিরে আসবে? সেকি! তুমি সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে গ্রহণ করবে না?'

'না। কাবণ আমি জানি তুমিই শ্রেষ্ঠ, তোমার চেয়ে সুন্দরী কেউ হতে পারে না।'

বেশঘোষা এবাব নবীন সন্ন্যাসীর হাত ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। আড়চোখে তার আন্দোলিত বক্ষ, নিতম্বের দিকে তাকিয়ে নবীন সন্ন্যাসীর মনে হল ঈশ্বর এত যত্নে দেবতাদেরও সৃষ্টি করেননি। ইন্দ্রসভার নর্তকীদের সে দ্যাখেনি। সেসব অপ্সরা আর যাই হোক মানুষ নয়, মানবী নয়। প্রয়োজনে তারা রূপ ধারণ করে ইন্দ্রের মনোহবণ করে মাত্র। কিন্তু তাদের সৌন্দর্য যে পৃথিবীর মানবীর কাছে পরাস্ত তার প্রমাণ সেই ইন্দ্র এসে মানবীর কাছে প্রেম নিবেদন করেন। বেশঘোষার শরীরের ছন্দোময় গতি তাকে আবার প্রলুব্ধ করছিল। নিজের কান এবং গালে সে উত্তাপ অনুভব করল। হাত বাড়াতেই বেশঘোষা বলল, 'না। যতক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত না হচ্ছেন আমিই সেরা সুন্দরী ততক্ষণ আমাকে স্পর্শ করবেন না। চিত্ত স্থির করুণ সন্ন্যাসী।'

সে হেসে ফেলল। এই উপদেশ সাধনায় বসবার আগে, শয়নে স্বপনে পিতৃদেব তাকে দিযে থাকেন। ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষায় এবং মানবীকে কামনায় যদি একইভাবে চিত্তের স্থিরতার প্রয়োজন তবে ওই দুই-এর তফাত কোথায়। সে আরও উৎসাহ পেল।

শান্ত নদীতীরে প্রভাতের মধুর মলয় বয়ে যাচ্ছে। অরণ্যের আড়াল সরে যাওয়া মাত্র ওরা ভাসমান আশ্রমটিকে দেখতে পেল। পাতায় ছাওয়া সেই কুটির থেকে সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছে। নবীন সন্ন্যাসী বেশঘোষাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ওই ধ্বনি যা শুনলে মন ভরে যায়?'

বেশঘোষা বলল, 'ওর নাম সঙ্গীত। আমরা প্রভুর বিনোদনের জন্যে এই সঙ্গীত গেয়ে থাকি।'

নবীন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভু কি?'

বেশঘোষা হাসল 'যিনি আমাদের আরাধ্য।'

'ও তুমি ঈশ্বরের কথা বলছ?'

'ঈশ্বর। তা বটে। তিনি অন্তত যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ ঈশ্বরের মত আচরণ করেন।'

'সেকি!' সে চমকে উঠল, 'তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছ?'

বেশঘোষা ওই তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে রসিকতার লোভ সংবরণ করল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'সেই ভাগ্য কি আমার কখনও হবে?

আসুন। এই পথে আসুন।'

বেশঘোষা ইচ্ছে করেই সম্বোধন পাল্টাল। তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল।

নবীন সন্ন্যাসী যত তরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ততই সঙ্গীতের ধ্বনি বেড়ে যাচ্ছিল। এইসময় বিশাল তরীর ওপরে সুনির্মিত কুটিরের দ্বার খুলে গেল। দুজন অপরূপা দ্বারের দুপাশে দাঁড়িয়ে অর্ধনত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতেই সে অবাক হয়ে গেল। চকিতে বেশঘোষার দিকে তাকাল তরুণ। বেশঘোষা হাসল, 'ভেতরে চলুন অনুগ্রহ করে।'

সে জানতে চাইল, 'এরা কারা?'

বেশঘোষা বলল, 'আমার সাধনসঙ্গিনী। শুধু এরা নয়, আরও কয়েকজন রয়েছে ভেতরে।'

সে কেবলই বিভ্রান্ত হচ্ছিল। ওই দুই মানবীর সঙ্গে বেশঘোষার যেন কোন পার্থক্য নেই। শরীরের গঠন, বেশবাস এক। কিন্তু কোথাও অবশ্যই একটা অমিল আছে কিন্তু সেটা সে বুঝতে পারছিল না।

ভেতরে পা দিতেই নানারকম সুমধুর ধ্বনি বেজে উঠল। আশ্রমের অভ্যন্তরে ফুলের মেলা। তাদের উৎপত্তি ছোট ছোট মৃত্তিকানির্মিত পাত্র থেকে। অদ্ভুত মায়াময় আলো জ্বলছে চারপাশে। যদিও বাইরে এখন সূর্যালোক প্রখর তবু ভেতরে তাকে আড়ালে রেখে এই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশঘোষা তার পাশে, দুই সুন্দরী আগে এগিয়ে চলল। কণ্ঠের সঙ্গে অন্যরকম ধ্বনি যুক্ত হওয়ায় সঙ্গীত প্রবল হয়েছে। বেশঘোষা বলল, 'বিভিন্ন যন্ত্র সুরে বেঁধে বাজালে ওই রকম ধ্বনি নির্গত হয় যা কণ্ঠসঙ্গীতকে উজ্জ্বল করে। আপনি আমাদের সাধনকক্ষে আসুন।'

কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়ার দ্বারে সূক্ষ্ম আবরণ। সুন্দরীরা তাই সরিয়ে ধরলে সে দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করল। এখানকার আলো সামান্য নীলাভ। পায়ের তলায় ফুলের মত নরম কিছু বিছানো যার ওপর হাঁটলে অত্যন্ত আরাম হয়। দুই চোখ ধাতস্ত হতে যে সময় তাতেই সে টের পেল মধুর সৌরভ কক্ষে ছড়ানো। এক প্রান্তে তিনজন অপরূপা বসে সঙ্গীত পরিবেশন করছে কণ্ঠ এবং বিচিত্র যন্ত্র সহযোগে। কোন কক্ষ যে এমন পরিপাটি সাজানো হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। এবার বেশঘোষা তাকে বলল, 'আপনি আমাদের অতিথি। আমাদের নিয়মানুসারে আপনাকে পরিচর্যা করার যদি অনুমতি দেন তাহলে কৃতার্থ বোধ করব।'

বিহ্বল তরুণ কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে পারল। বেশঘোষার ইঙ্গিতমাত্র আরও দুই সুন্দরী একটি বড় পাত্র নিয়ে এল সামনে। একজন একটি সুদৃশ্য বসবার আসন তার পাশে রাখতে বেশঘোষা তাকে সেই আসনে বসিয়ে দিল। কৌতুক বোধ হচ্ছিল তার। সামনে কয়েকজন সুন্দরী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এদের কারো শারীরিক গঠনের সঙ্গে তার কিংবা পিতৃদেবের মিল নেই। কিন্তু এরা কেউ ক্ষীণা, কেউ ঈষৎ ভারী। বক্ষদেশ এবং নিতম্বের পার্থক্য নজরে পড়ল। বেশঘোষা ততক্ষণে নতজানু হয়েছে। তার নরম হাত তাপসের চরণ স্পর্শ করল। সে কিছু বোঝার আগেই বেশঘোষা চরণদ্বয় নিয়ে গেল পাত্রের ভেতরে। সেখানে যে সলিল রয়েছে তা টের পায়নি সে তার পবিত্রতার জন্যে।

অবাক হয়ে সে দেখতে লাগল নানারকম গন্ধদ্রব্য দিয়ে বেশঘোষা তার চরণ মার্জনা করছে। সলিলের রঙ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। জীবনে কখনও এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ সে পায়নি তাই এখন রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। একজন সুন্দরী পাত্রটি সরিয়ে নিয়ে গেলে বেশঘোষা তার সুদীর্ঘ নীল নির্মল জটাধার মুক্ত করে তাই দিয়ে ধীরে ধীরে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দুই চরণ সলিলমুক্ত করল। সেই সময় যে সৌরভ কক্ষে প্রবাহিত হচ্ছিল তা চন্দনবনকে পর্যন্ত ম্লান করে দেয়।

এইবার তাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি বিশেষ আসনে। সেখানে বসামাত্র যে সুখানুভূতি হল তার তুলনা নেই। সে সামান্য হেলান দিতেই পিঠে নরম স্পর্শ পেল। বেশঘোষা বলল, 'এটি আপনার আরামের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত। অত্যন্ত মূল্যবান তুলোয় তৈরি।' এই কথার শেষে সে ইঙ্গিত করামাত্র সুন্দরীরা যেন পলকেই অন্তর্হিত হল।

ব্যস্ত হয়ে নবীন সন্ন্যাসী প্রশ্ন করল, 'তোমার সাধনসঙ্গিনীরা কোথায় গেল ?'

বেশঘোষা বলল, 'অপেক্ষা করুন। ব্যস্ততার কি আছে ?'

সে বলল, 'তোমরা সবাই কি সুন্দর !'

বেশঘোষা সশব্দে হেসে উঠল, 'কিন্তু আমার কাছে যে শপথ নিয়েছেন তা যেন বিস্মরিত হবেন না।'

তরুণ সন্ন্যাসী স্বর পরিবর্তন করল, 'না। হব না। কিন্তু তুমি হঠাৎ সম্বোধন পরিবর্তন করলে কেন ? যতক্ষণ তুমি আমাকে তুমি বলছিলে ততক্ষণ তোমাকে খুব কাছের মনে হচ্ছিল।'

এই সময় পার্শ্ববর্তী আর একটি কক্ষের দ্বার খুলে গেল। সে আগ্রহ নিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠল। একে ? এ কেন এখানে ? প্রবীণা বারঘোষা তখন দ্বারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয় বিদ্রোহ করে উঠল। এও কি মানবী ? তাহলে এ লোলচর্ম কেন ? মুখে এত কুঞ্চন, দেহ শুষ্ক, কেশরাজিতে কুন্দফুলের শুভ্রতা। এই মানবীর বক্ষ প্রায় পিতার মতনই যদিও সেখানে আবরণ রয়েছে। এর শুষ্ক গাল ভেতরে ঢুকে গিয়েছে খানিক। এর চলনে কোন ছন্দ নেই। দেখলে মনে সামান্য পুলক জাগে না। সে আর পারল না। ক্ষিপ্তস্বরে প্রশ্ন করল, 'এ কে ?'

বেশঘোষা ঘনিষ্ঠ হল, 'কি হয়েছে সন্ন্যাসী ?'

'এ এখানে কেন ?' তার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

'ওঁকে কি আপনি সহ্য করতে পারছেন না ?'

'না। এই সুন্দরের মাঝে কুশ্রী ! উঃ। বিকৃতির পীড়া সইতে পারি না।'

'চিত্ত স্থির করুন।' বেশঘোষা বলল, 'আপনি শপথ নিয়েছেন ক্রুদ্ধ হবেন না।'

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল সে। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কেন ?'

বারঘোষা ভীত হয়েছিল। অঙ্গদেশ ত্যাগ করার আগে সে এই ঋষিপুত্র সম্পর্কে নানান কাহিনী শুনেছিল। কাহিনী না বলে ভাষ্য বলাই শ্রেয়। পিতার কাছ থেকে এ কুপিত স্বভাব পেয়েছে। সেই কোপের সামনে যে পড়বে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। তবু সে সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'আমি এখানে না এলে আপনি

অভিজ্ঞ হবেন না সন্ন্যাসী।'

'তার মানে ? আমি তোমাকে দেখতে চাই না।' সে চিৎকার করে উঠল।

'কিন্তু অসুন্দর থাকে বলেই সুন্দরের মূল্য বোঝা যায়। অন্ধকারই তো আলোর মাহাত্ম্য বাড়ায়। নিদ্রাই তো জাগরণকে মধুব করে। আমাকে দেখলে যদি আপনার অন্তর বিরক্ত হয় তবেই তো আপনি বুঝতে পারবেন সৌন্দর্যের মর্ম।' বারঘোষা গম্ভীর স্বরে বলল।

কথাগুলো মনে ধরল তার। প্রশ্ন কবল, 'কিন্তু তুমি এত অসুন্দর কেন ?'

বারঘোষা বলল, 'প্রকৃতির নিয়মে। যে তরু দিনের পর দিন ফলফুল ছায়া বিতরণ করে, তার দেওয়াব ক্ষমতা এক সময নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন সে জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে। আপনি কি তা দ্যাখেননি ?'

'দেখেছি। কিন্তু তুমি কি মানবী ?'

'হ্যাঁ। ঈশ্বর আমাকে সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কালের জন্যে তা দিয়ে থাকেন। আমার সেই কাল শেষ হয়ে গেছে।'

'তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।'

এবার বেশঘোষা খুব নিবিড়ভাবে বলল, 'আপনি ওঁকে দুঃখ দিচ্ছেন সন্ন্যাসী। উনি দুঃখ পেলে আমিও দুঃখিত হব। কারণ উনি আমার জননী।'

'জননী ?' সে চমকে উঠল, 'তোমার জননী আছে ?'

'কেন থাকবে না ? জননীব গর্ভে বাস না করলে মানুষের পৃথিবীতে আসার অধিকার জন্মায় না।'

'কিন্তু আমার জননী নেই। থাকলেও তাঁকে আমি কখনও দেখিনি।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত নিজের মনেই সে উচ্চারণ করল, 'ওই মানবীর গর্ভে তুমি ছিলে ? কি আশ্চর্য !'

বেশঘোষা বলল, 'এটাই ঈশ্ববের ইচ্ছে। তখন আমার জননী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন। ওঁর দেহলাবণ্য দেবতাদেরও হয়তো মুগ্ধ করত। আমি তার সামান্যই পেয়েছি।'

সে এবার মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পেরেছি। জননীব গর্ভে বাস করে তাঁর সৌন্দর্য তুমি আহরণ করেছ বলেই তুমি সুন্দরী এবং তা তোমাকে দিয়ে দিয়েছে বলে ও অসুন্দর হয়ে পড়েছে।'

বারঘোষা বলল, 'বাঃ। আপনি চমৎকার বললেন। জননীর গর্ব সন্তানের সৌন্দর্যে। আমি সেই গর্বে গর্বিত কিন্তু দীর্ঘকাল বিভিন্ন মানবচরিত্র দেখে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা আমার কন্যা পায়নি। পেতে পারে না। অরণ্যে ফলাভাব ঘটলে যেমন মাটি সরিয়ে মূল খুঁজে খেতে হয় তেমনি নব্যযৌবন আমার কাছে অভিজ্ঞতার জন্যে আসে। আমি যাকে সেই অভিজ্ঞতা দান করি সে জীবন এবং যৌবনকে নিপুণ ব্যবহার করতে পারে।'

বেশঘোষা উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা কথা বলুন। আমি এবার আপনার আপ্যায়নের আয়োজন করি। না-না। আপনি আপত্তি করবেন না।' তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেশঘোষা দ্রুত অন্তর্হিত হল। সে আসন ত্যাগ করে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল এইসময় প্রবীণা বারঘোষা দ্রুত বলে উঠল, 'স্থির হন

তাপস। ওর দেখা আপনি এখনই পাবেন।'

নবীন সন্ন্যাসী কি করবে বুঝতে পাবছিল না। এই অচেনা আশ্রমে একা থাকতে তার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু প্রবীণার নিষেধ অমান্য করার চেষ্টা সে করল না। প্রবীণা সামান্য দূরত্ব রেখে তাব সামনে বসল। নবীন সন্ন্যাসী খানিকটা ইতস্তত কবে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কোথায গেল ?'

'প্রসাধন করতে।'

'প্রসাধন ?'

'ঈশ্বর পৃথিবীতে মানবীকে যে রূপে পাঠান তার নিজস্ব সৌন্দর্য তাতে নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু ঈশ্ববও চান মানবী সেই সৌন্দর্যকে আবও রমণীয় করুক। এই জন্যেই প্রসাধনের প্রয়োজন।'

'উপাসনা কখন শুরু হবে ? আমি সেটা দেখতে চাই।'

'উপাসনা ! ও। আমাদের উপাসনার প্রক্রিয়া খুব সহজ। ঈশ্বর অনেক দূরে থাকেন। তাঁর কাছে পৌঁছাবার প্রক্রিয়া আমাদের জানা নেই। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত সম্পদশালী আমবা তাদেরই উপাসনা করি। তাদেব সন্তুষ্ট করলেই আমরা তৃপ্ত হই।'

নবীন সন্ন্যাসী চমকে উঠল, 'সে কি ! মানুষ কখনও আরাধ্য হয় ? মানুষ কি দিতে পারে ? এই উপাসনাব অন্তিমে কি আছে।'

'আনন্দ। একমাত্র মানুষই পারে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নিতে।'

'কিন্তু পিতৃদেব বলেছেন মানবী দুঃখের আধার। দুঃখ কি করে আনন্দের সঙ্গে মিশ্রিত হবে ? এ আমি বুঝতে পারছি না।'

'তাপস, সৃষ্টিতত্ত্বের এটি প্রধান অঙ্গ। এই লীলায় পৌঁছাতে গেলে অনুশীলন দরকার। যেহেতু আপনি মানবসমাজ থেকে দূবে একাকী ছিলেন তাই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি।'

'অরণ্যে পিতৃদেব আমার সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন।'

'ও হ্যাঁ। দুটি কুরঙ্গ একত্রে বাস করলে যেমন তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায় না তেমনি মানবজীবনে মানবীর স্পর্শ না এলে গ্রীষ্মের আকাশেব মত শুধু শূন্যতাই থাকে। আমাদের সাধনায় মানব এবং মানবী পরস্পরের লীলাসঙ্গী।' এই কথা বলে প্রবীণা বারঘোষা মৃদু করতালি দিল। নবীন সন্ন্যাসী কিছু বলতে গিয়েও ইতস্তত করে থেমে গেল। সে অবিষ্কার করল আগে এমন আচরণ কখনই করত না; পিতৃদেবকে যা মনে আসত সরাসরি বলে ফেলত। এখন এত দ্বিধা জন্মাচ্ছে কেন ? সে ললাটে হাত দিল। এবং তখনই শৃঙ্গটি ঈষৎ অন্যরকম বলে বোধ হল। চিত্তকে শান্ত করতে সে বারংবার শৃঙ্গটিকে ঘষতে লাগল। এবার তার মনে হল, আশ্রমের ভেতরে আসার কথা ছিল না। দূর থেকে সুন্দরীদের দর্শন করে সে মিলিয়ে নেবে কে বেশি সুন্দরী এমন ইচ্ছে ছিল। এই স্থান এক্ষুনি ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সে কোথায় ? তাকে না নিয়ে তো ফিরে যাওয়া অসম্ভব। প্রবীণা বারঘোষাকে ওই কথা বলতে যেতেই সুমধুর সঙ্গীত বেজে উঠল। নবীন সন্ন্যাসীর মনে হল সুরভিত চন্দনের ধোঁয়া যেন এই কক্ষ ছেয়ে ফেলছে। এবং সেই সঙ্গীতের ছন্দে পা রেখে অতীব সুন্দরী এক মানবী কক্ষের অপর প্রান্তে প্রবেশ কবল। সে কারো দিকে তাকাচ্ছে না। আপন মনে সমস্ত

শরীরে হিল্লোল তুলছে। নবীন সন্ন্যাসী তাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়েছিল। প্রবীণা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ওকে চিনতে পারছেন?'

'নিশ্চয়ই। একে পারব না চিনতে? আমার সমস্ত হৃদয় যাকে দেখামাত্র অসাড় হয়ে গিয়েছে, যার কথা রাখতে আমি এখানে এসেছি তাকে চিনব না?' সে এক পা এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে ওপাশের দ্বার অতিক্রম করে আর একজন কক্ষে প্রবেশ করল। আগের জনের অঙ্গে যে আবরণ ছিল এরও তাই। দেখামাত্র চোখ জুড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়া কক্ষে প্রবেশ করেছে ওই একই ছন্দ তুলে, তার হাত পা কোমর নিতম্ব দুলছিল প্রথমার মত। এবং সে-ও অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করছিল না।

প্রবীণা জিজ্ঞাসা করল, 'হে তাপস, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি একে চেনেন না!'

সে হতভম্ব হয়ে গেল। এ কি করে সম্ভব? এই দুই মানবী দেখতে একই রকম কি করে হয়? এদের কটিদেশে এবং বক্ষে অত্যন্ত স্বল্প আবরণ, কিন্তু ললাট এবং চোখ এমন কিছুতে ঢাকা যা দেখা এবং অদেখার মধ্যে রয়ে গেছে। কুয়াশার মত রহস্যময় তাই আকর্ষণ বেড়ে গেছে বহুগুণ। কিন্তু ওদের অধর এবং গ্রীবা এক। বক্ষের গড়ন যেটুকু বোঝা যায় তেমন তারতম্য নেই। কটি এবং ঊরুতে প্রভেদ নেই। এই দুজনের মধ্যে কে তার কাছে গিয়েছিল সে ধরতে পারছে না। তাকে এই অবস্থায় দেখে প্রবীণা বলল, 'বেশ, আরও লক্ষ্য করুন।' সে করতালি দিতেই দুজন চারজন হয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন ঈষৎ পৃথুলা বলে আলাদা চিহ্নিত করা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেকের পোশাক এক মুখে সেই একই রকম রহস্যময়ী আবরণ। এই শরীর সঞ্চালন দর্শন করতে করতে নবীন সন্ন্যাসীর শরীরে আবার কম্পন শুরু হল। এবার প্রবীণা বলল, 'তাপস, বলুন তো এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী?'

সে ইতস্তত করল। একবার যাকে মনে হচ্ছে অন্যজনকে দেখামাত্র তাকে বাতিল করতে হচ্ছে। কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না সে। কোনরকমে তার কণ্ঠ উচ্চারণ করল, 'এরা সবাই সুন্দর। এদের দেখে চিত্তে অপূর্ব আরাম হচ্ছে।'

প্রবীণা হাত তুলে তাদের স্তব্ধ হতে বলল। মুহূর্তেই সুন্দরীরা প্রস্তরবৎ হয়ে গেলে প্রবীণা জিজ্ঞাসা করল, 'এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কোনজন?'

নবীন সন্ন্যাসী মরীয়া হয়ে একজনকে নির্দেশ করল। প্রবীণা হাসল, 'আপনাকে যে এখানে এনেছে এই মানবী কি তার চেয়েও অপরূপা?'

'না। কারণ এই হচ্ছে সে যে আমাকে এখানে এনেছে।'

প্রবীণার ইঙ্গিতে চার বিলাসিনী তাদের চোখের আবরণ মুক্ত করতেই দ্বারে পঞ্চমী এসে দাঁড়াল, 'আপনি পরাস্ত সন্ন্যাসী। আশা করি শপথ বিস্মরিত হবেন না?'

সে চমকে দেখল তাকে। তার পথপ্রদর্শিকা মিষ্টি হাসছে। চারজনের মধ্যে সে ছিল না। অথচ এতক্ষণ তাকেই সে মনে করছিল এদের একজন। আর কি আশ্চর্য, এখন যে সাজে সে দাঁড়িয়েছে তাতে তাকে এদের তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ ঠেকছে। কণ্ঠ থেকে চরণ পর্যন্ত একটি অনুজ্জ্বল আবরণ তাকে

অনাকর্ষণীয় করে তুলেছে। সে বলল, 'এ কি করে সম্ভব ? তুমি যখন একা এলে তখন মনে হল পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠল। আর এদের দেখার পর কেন সেই মন থাকছে না। এ কি আমার ভ্রম ?'

প্রবীণা বলল, 'আপনার কোন দোষ নেই। এই সরল ভ্রম মানবমাত্রই করে থাকে। যৌবনে উপনীত হয়ে যে মানবীকে তারা প্রথম দেখে আপ্লুত হয় তাকেই অন্ধ প্রেম দান করে বসে। কিন্তু পরবর্তীকালে আরও পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটে। আপনি অসামাজিক তাপস। আপনার তো এই বিভ্রম ঘটবেই।'

বেশঘোষা বলল, 'তাহলে আমি মুক্ত। আপনি আর আমাকে নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করেন না ?'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করতে চাও তো স্বচ্ছন্দে করতে পারো। আমি বাধা দেব না।'

বেশঘোষা বলল, 'সাধু। কিন্তু আপনাকে আমি একটি গোপন সংবাদ দিচ্ছি।'

সে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি সেই সংবাদ ?'

'আমাকে দেখে আপনার মনে হয়েছিল পৃথিবী সুন্দর হয়েছে। আবার একে দেখে মনে হচ্ছে আরও বেশি সুন্দর। এই মনে হওয়ায় ভুল নেই। কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দরী যে তাকে না দেখা পর্যন্ত আপনি স্থির থাকুন।'

'তোমার চেয়ে, এদের চেয়ে রূপবতী পৃথিবীতে আছে ? অসম্ভব ! আমি বিশ্বাস করি না।'

সে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল।

এবার প্রবীণা বলল, 'আছে। তাপস, পৃথিবীর সমস্ত জননীর কাছে তাদের সন্তানই সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু আমি ওর জননী হয়েও বলছি পৃথিবীতে একজন অতি পরমাসুন্দরী মানবী আছে। যাকে দেখলে মানব তো বটেই মুনিঋষিরা কোন ছার, স্বয়ং বিধাতাও চঞ্চল হবেন। কিন্তু যেহেতু সেই মানবী অসূর্যম্পশ্যা তাই কারো দৃষ্টি ওর ওপর পড়েনি।'

সে বলল, 'আমি জানি না একথা সত্য কিনা !'

বেশঘোষা বলল, 'সন্ন্যাসী কিছু সময় আগে আপনি বিশ্বাস করছিলেন না যে আমার চেয়ে সুন্দরী এই আশ্রমে আছে। এখানে এসে সেই বিশ্বাস আপনার জন্মালো। অঙ্গদেশের্ রাজকুমারীকে দেখলে আপনার মনে হবে আপনি দ্বিতীয়বার ভুল সন্দেহ করেছিলেন।'

'অঙ্গদেশের রাজকুমারী ? সে এখানে আসছে না কেন ?'

প্রবীণা বলল, 'একটু আগেই আপনাকে বললাম সে অসূর্যম্পশ্যা। তার দর্শন পেতে হলে আপনাকে তার কাছে যেতে হবে। সে অনেক দূরের পথ। আপনাকে অত শ্রম করতে বলতে পারি না। আপনি এই আশ্রমে এসেছেন তাতেই আমরা ধন্য। বেশঘোষা, তাপসের আহারের ব্যবস্থা কর।

'দ্বিপ্রহরের আগেই আমাদের যাত্রা করতে হবে। তার আগে তুমি ওঁকে ওঁর আশ্রমে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।' প্রবীণা ইঙ্গিত করামাত্র চার সুন্দরী অন্তর্হিত

হল।

নবীন সন্ন্যাসী ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কোথায় সেই অঙ্গদেশ ? আমি যে তার পথ চিনি না। এই অরণ্যে থেকে গেলে সেই পরমাসুন্দরীর দর্শন তো আমি কখনই পাব না। তোমরা এই স্থান ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ ?'

প্রবীণা স্মিত স্বরে বলল, 'আমরা অঙ্গদেশের অধিবাসী। সেখানেই ফিরে যাব।'

সে দ্রুত বলে উঠল, 'তাহলে তোমরা আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না কেন ? আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, ঈশ্বরের সেই অনবদ্য সৃষ্টিকে দেখতে চাই।'

প্রবীণা সম্ভবত এইরকম অনুরোধ প্রত্যাশা করেছিল। সে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখিয়ে বলল, 'আপনি আমাদেব সঙ্গে যাবেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আমি আপনার পিতার কথা শুনেছি। তিনি যদি মনে করেন আপনাকে দেবেন না তাহলে আপনি যাবেন কি করে ?'

সে কথাটা শোনামাত্র পিতৃদেবের মুখ কল্পনা করল। পিতৃদেব যে কিছুতেই তাকে অরণ্যত্যাগ করতে দেবেন না তাতে সে নিঃসন্দেহ। সেই শুষ্ক হাড়সর্বস্ব মুখটি মনে করে তার অন্তর বিদ্রোহী হল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল, 'পিতৃদেব দেবতাদের আরাধনা করেন। আমি দেবতাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরের কথাই কেবল স্মরণ করি। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে দেখতে যাওয়া মানে দেবতাদেরই দেখতে যাওয়া। কিন্তু পিতৃদেব হয়তো এই যুক্তি গ্রহণ করবেন না। তাই তিনি প্রত্যাবৃত্ত হতে না হতেই চল আমরা যাত্রা শুরু করি।'

'কিন্তু যদি সেই ঋষি ক্রুদ্ধ হন, যদি তিনি আমাদের অভিশাপ দেন ?' প্রবীণা তখনও তার কপট দ্বিধা দেখিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসীর মুখে রক্ত ঘনীভূত হল, 'তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন দুঃখকে জানতে। তিনি বলেছেন মানবী দুঃখের আধার। তাই আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবীকে জানতে যাচ্ছি। তোমরা দ্বিধা করছ কেন ? আমি যতক্ষণ এই ভাসমান আশ্রমে সাধনায় বসব ততক্ষণ পৃথিবীর কোন শক্তির ক্ষমতা নেই তোমাদের কোন ক্ষতি করে। এখন আমার মনে হচ্ছে তোমরা সৎ নও। আমাকে অসত্য কথা বলে বিপাকে পড়েছ। এই কারণেই অঙ্গদেশে নিয়ে যেতে চাইছ না।' কথাগুলো বলার সময়ে তার মুখ থেকে তাপ বের হতে লাগল। মুহূর্তেই সেই কক্ষের স্নিগ্ধতা ওই উত্তাপ গ্রাস করে নিল। সেই সরল সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। বেশঘোষা ছুটে এসে তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল, 'শান্ত হন সন্ন্যাসী। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই যাত্রাপথে কখনই ক্রুদ্ধ হবেন না। দয়া করে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবেন না।'

'কিন্তু তোমরা আমাকে সত্যি কথা বলনি।' সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিল এবার।

'না। মিথ্যে নয়। আমরা সত্য কথাই বলেছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

এই কথা শোনামাত্র তার চিত্তে প্রশান্তি এলেও সমস্ত দেহে অস্বস্তি থেকে গেল। প্রবীণা দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে মাল্লাদের নির্দেশ দিল তরী ভাসাতে। চারদিকে প্রায় নিঃশব্দেই কাজের জোয়ার লাগল। কক্ষের ভেতরে সন্ন্যাসীর শরীরে তখন

অসহ্য বেদনা। এই বেদনা কি কারণে তা সে জানে না। কিন্তু বেশঘোষা বুঝতে পারল উদ্‌গত ক্রোধ প্রকাশিত হতে না পেরে সন্ন্যাসীকে পীড়ন করছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে অনুজ্জ্বল দীর্ঘ বসন খুলে কক্ষের মেঝেতে ফেলে বলল, 'এইখানে আপনার ক্রোধ ত্যাগ করুন সন্ন্যাসী।'

সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওইদিকে তাকাতেই সেই বসন ভস্মে রূপান্তরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে শরীর শান্ত হল তাঁর। কিন্তু নগ্ন বেশঘোষার দিকে তাকিয়ে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। চার সুন্দরী মুহূর্তেই ম্লান। বেশঘোষা বলল, আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে এমন কাজ করবেন না। যাত্রাপথ দীর্ঘ, কথা দিচ্ছি অঙ্গদেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। আর এই ভস্ম আমার চিরজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

সে অবাক, 'ভস্ম? ভস্ম কেন রাখবে তুমি?'

বেশঘোষা হাসল, 'কিছু কিছু মানুষের ললাটে ঈশ্বর শুধু ভস্মই রাখেন।'

এইসময় তরী দুলে উঠল। মাল্লারা নিঃশব্দে তীর ছেড়ে আসতেই ঢেউ-এর ধাক্কা লাগল। সে কোনরকমে নিজেকে সামলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'সর্বনাশ! ধরিত্রী কুপিত হয়েছেন, নাকি আমার শরীর টলছে!' সে হাত বাড়িয়ে বেশঘোষাকে অবলম্বন করতে চাইল।

চকিতে সরে গিয়ে বেশঘোষা বলল, 'ওসব কিছুই হয়নি। তরীতে দোলা লেগেছে। এই দেখুন সব ঠিক হয়ে গেল। আপনার অভিজ্ঞতা ছিল না তাই ভুল করেছিলেন।'

অঙ্গদেশে বিদ্রোহ অনিবার্য। মহারাজ লোমপাদ তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। যজ্ঞ চলেছে। যজ্ঞের সুবাসে সমস্ত রাজধানী সুরভিত। ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন। দিনরাত মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। সর্বত্রই একটা ধার্মিক পরিবেশ। কিন্তু আকাশের গায়ে সামান্য কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন নেই। এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘের দর্শন প্রজাদের শান্ত করতে পারত। লোমপাদ মহামন্ত্রীকে বললেন, 'বারবনিতারা এখন কোথায় সে-সংবাদ কি জানো?'

'না মহারাজ! তারা যদি ভস্মীভূত না হয় তাহলে সংবাদ পেতে দেরি হবে না।' লোমপাদ বিরক্ত হলেন, 'কি আশ্চর্য। তুমি সেজন্যে অপেক্ষা করছ। এখনই দূত পাঠাও।' মহামন্ত্রী বিনীত স্বরে বলল, 'মহারাজ। তারা নদীপথে যাত্রা করেছে। তাদের মাল্লারা তরীতে স্ত্রীলোকের পোশাকে আত্মগোপন করে কাজ করছে। এই সময় তাদের সন্ধানে কেউ গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এই মুনি কখন কি করবেন তা আন্দাজ করা মুশকিল।'

লোমপাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি তো আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হতে পারেন।'

'তা পারেন।' মহামন্ত্রী মাথা নাড়ল।

'কি সর্বনাশ।' মহারাজ সোজা হয়ে বসলেন, 'দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র এ কি মন্ত্রণা দিল। ও হ্যাঁ, দশরথকে তুমি জানিয়েছ যে তার পাঠানো খাদ্যদ্রব্য পথেই লুঠ হয়ে গিয়েছে? সে কি আবার খাদ্য পাঠাচ্ছে?'

'জানিয়েছি। মহামতি সুমন্ত্র তো নিজের চোখেই দেখে গেছেন। কিন্তু শুনলাম মহারাজ দশরথও খুব সুখে নেই।' মহামন্ত্রী জানাল।

'সে কি ? আমার বন্ধুর আবার কি হল ?' লোমপাদ জানতে চাইলেন।

'তাঁর বয়স হচ্ছে অথচ কোন সন্তান নেই। আপনার তো তবু একটি অতীব সুন্দরী কন্যা আছে।'

'তাতেই বা কি হচ্ছে ! প্রজারা এখন বলছে পুত্রহীন রাজা মানেই অমঙ্গল। তা দশরথের রাজ্যে তো দুর্ভিক্ষ হয়নি। প্রজারাও বিদ্রোহ করেনি।'

'করেনি। কিন্তু তিনি অন্দরমহলে সুখে বাস করতে পারেন না। তার তিন রানীর কেউ সন্তানবতী হয়নি। প্রাসাদে তাঁর সেবায় যে সমস্ত রমণীরা রয়েছে তারাও বন্ধ্যা রয়েছে। এ থেকে তো প্রমাণিত হয় স্বয়ং মহারাজ দশরথ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। অক্ষমতা একজন নারীর আসতে পারে এতগুলোর নয়। আর এই কারণেই তিনি সুখে নেই।'

মহামন্ত্রীর কাছে প্রিয়বন্ধুর বৃত্তান্ত শুনে ব্যথিত হলেন মহারাজ লোমপাদ। কিন্তু বন্ধুর জন্যে শোক প্রকাশের সময় এটা নয়। অবশ্য তিনি স্থির করে রেখেছেন একটি উপায়। প্রজারা যদি বিদ্রোহী হয়ে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে তাহলে তিনি প্রতিরোধ করবেন না। প্রজাপালনে অক্ষমতা স্বীকার করে আত্মঘাতী হবেন।

মহামন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লোমপাদ রথে নগর পরিভ্রমণে যাবেন স্থির করলেন। এই ইচ্ছা শোনামাত্র মহামন্ত্রী শিহরিত হলেন। তিনি তাঁকে বারংবার বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। প্রজারা যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে তাতে মহারাজকে সামনে পেয়ে কি কাণ্ড করে বসে তার ঠিক নেই। কিন্তু মহারাজ বললেন, 'অদর্শনই বিভেদ সৃষ্টি করে। অথবা সৃষ্ট বিভেদ আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রজারা যদি আমাকে তাদের মধ্যে দেখে তাহলে এটাও তো ভাবতে পারে আমি একই ব্যথার সঙ্গী।'

তখন অপরাহ্ণ। রথ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কিছুদূর যেতেই মহারাজ শুনতে পেলেন শৃগালরা দক্ষিণদিকে সূর্যের উদ্দেশে অশিবধ্বনি করছে। একপক্ষা একনেত্র, একচরণা, মলিনা, ঘোরদর্শনা বর্তিকা যেন সূর্যের মুখে রক্তবমন করছে। পাখিরা চিৎকার করছে তুমুলভাবে। প্রচণ্ড রুক্ষ বাতাসের বেগে বালুকারাশি উড়ে আকাশ ঢেকে দিল। পেছনে বায়সেরা একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে। মহারাজের ডানহাত এবং বামচোখ কাঁপতে লাগল।

এইবার মহারাজ ভীত হলেন। মহামন্ত্রীর অনুরোধে তিনি আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে না প্রবেশ করে যজ্ঞভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত মুনি-ঋষিরা সেখানে তখন মন্ত্র উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের উৎসাহ যে আগের মত নেই তা বোধগম্য হচ্ছিল। মহারাজ করুণ চোখে যজ্ঞের দিকে তাকালেন।

কৌশকী নদী অতিক্রম করতে মাল্লাদের যে পরিশ্রম হয়েছিল প্রথমবার তার অর্ধেক শ্রম এবার ব্যয় করতে হল না। নদী শান্ত, বাতাস অনুকূলে। প্রবীণা বারঘোষার নির্দেশে মাল্লারা অবশ্য অতিদ্রুত দাঁড় বাইছিল। বিশাল তরীর ভেতরে অবশ্য তখন অন্য চিত্র। দিগন্ত বিস্তৃত বারিরাশি সামনে। তরুণ সন্ন্যাসী বাতায়নে বসে সেদিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। প্রাথমিক উদ্দীপনা কেটে যাওয়ার পর তার মনে এক ধরনের অবসাদ এসেছে। যে-অরণ্যে এতকাল সে

কাটাল, বৃক্ষ, পশু, পাখি অথবা তাদের পরিচিত সাহচর্যে বড় হল তদের দর্শন পাবে না কিছুদিনের জন্যে। এখন চোখের সামনে শুধু অনন্ত সলিল। কিন্তু অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতি যে মায়া, তার টান কম নয়। সে সেই টান বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল পিতৃদেব যখন ফল সংগ্রহ্ করে ফিরে আসবেন তখন নিশ্চয়ই তাকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হবেন। হয়তো সমস্ত অরণ্য খুঁজবেন। তিনি কি তার জন্যে বিলাপ করবেন ? এইসময় মনে তার এক ধরনের সুখ এল। পিতৃদেব যখন তাকে না বলে অন্তর্হিত হয়েছিলেন তখন সে সমস্ত অরণ্যে সন্ধান করেছিল, বিলাপ করেছিল। এখন পিতৃদেব সেই একই ভূমিকায় এলে তাকে হৃদয়ঙ্গম করবেন। কিন্তু সুখ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হল। পিতৃদেবের জন্য তার হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হল।

'কি হল সন্ন্যাসী। ওই মুখে অত বিষাদ কেন ?'

প্রশ্নটি শোনামাত্র মুখ ফিরিয়ে সে দেখল বেশঘোষা দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নাড়ল।

'না, কিছু নয়। আশ্রম, অরণ্য, পিতার জন্যে মন উচাটান হয়েছে।'

'ও।' বেশঘোষা অধর স্ফীত করল, 'আমাদের সঙ্গ আপনার কি ভাল লাগছে না ?'

'কেন লাগবে না ! তবে ওই চিন্তাও মাথায় আসছে।'

'এসব চিন্তা লোপ পেয়ে যাবে অঙ্গদেশেব রাজকুমারীকে দেখলে।'

'আচ্ছা, তার রূপের বর্ণনা করো তো।'

'তিনি কি রকম তা তো আমি চোখে দেখিনি। তিনি অসূর্যম্পশ্যা যখন, তখন তাঁকে দেখব কি করে। তবে শুনেছি পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্রদেব তাঁকে দেখলে লজ্জিত হন। থাক, এসব চিন্তা না করে আসুন আহার গ্রহণ করবেন।' বেশঘোষা আমন্ত্রণ জানাল।

আহারের কথায় নবীন সন্ন্যাসীর চিত্ত প্রফুল্ল হল। এই কদিন তরীতে অবস্থানকালে সে যেসব অমৃততুল্য খাদ্য গ্রহণ করেছে তার তুলনা নেই। প্রতিদিনই তার জন্যে নানান স্বাদু খাদ্য তৈরি হচ্ছে। সে প্রশান্ত মুখে বেশঘোষাকে অনুসরণ করল।

আহারের জন্যে একটি বিশেষ কক্ষ নির্দিষ্ট। সেখানে প্রবেশ করে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। আসনের সামনে একশ আটটি পাত্রে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সাজানো। প্রতিদিন প্রবীণা বারঘোষা তাকে উপদেশ দেয় কোনটা প্রথমে খেতে হবে। সে আসন গ্রহণ করে বলল, 'আপনাদের সাধনায় আমি মুগ্ধ। না হলে এই বিশাল নদীপথে চলতে চলতে আপনারা এইসব মহার্ঘ খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে পারতেন না।'

প্রবীণা হাসল, 'তা ঠিক। পৃথিবীর মানবীরা ইচ্ছে করলে খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে যেকোন অসাধ্য সাধন করতে পারে। গতকাল আপনার পাত্রে রোহিত মৎস্যের আয়োজন ছিল। আপনি তৃপ্ত হয়েছিলেন—'।

'অহো অপূর্ব। কি স্বাদ। এই বারিধারায় যে রোহিতেরা বাস করে তা জানতাম কিন্তু তার স্বাদ যে এত মনোহর তা পিতৃদেবও কখনও বলেননি।'

'আজ কিন্তু অন্যরকম খাবার। এ সবই দুগ্ধনির্মিত।'

'দুগ্ধ, কার দুগ্ধ ?'

'গাভীর।'

'এই আশ্রমে গাভীও আছে ?'

'অবশ্যই।'

নবীন সন্ন্যাসী পরমসুখে প্রায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করল। এইসময় বেশঘোষা চামর দুলিয়ে তাকে বাতাস করছিল। তাও তার কাছে সুমধুর মনে হল। এইবার প্রবীণা তাকে সুদৃশ্য স্বর্ণপাত্রে স্বর্ণাভ মদিরা পরিবেশন করল। নবীন সন্ন্যাসী সেটা দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি ? তরল মধু ?'

বেশঘোষা বলল, 'না সন্ন্যাসী। এই সলিল আপনি প্রথম দিন অরণ্যে অল্প পান করেছেন।'

সে বিরক্ত হল, 'এই সুমিষ্ট সলিল এতদিন কেন পরিবেশন করনি ?'

প্রবীণা জানাল, 'এই বস্তু প্রস্তুত করতে সময় লাগে তাপস। আপনি চিন্তা করবেন না, এখন থেকে প্রত্যহ্ এই বস্তু আপনার সেবার জন্যে থাকবে। না-না, অত দ্রুত পান করবেন না। মনে বাখবেন, নারী এবং মদিরা পান করতে হয় অত্যন্ত ধীরে, যত্নের সঙ্গে। তবেই তাদের স্বাদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। আপনি ওই মদিরাকে প্রথমে জিহ্বায় রাখুন। তারপর উত্তাপ সঞ্চারিত হলে ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করুন।'

তরুণ সন্ন্যাসী সেইভাবে কিছুটা খেয়ে বলল, 'বাঃ, সত্যি তো চমৎকার।'

প্রবীণা বলল, 'অভিজ্ঞ সুহৃদ সবসময় মঙ্গল করে।'

ক্রমশ নবীন সন্ন্যাসীর অনুভবে এল এই ভাসমান আশ্রম কাঁপছে। তারপরেই তার খেয়াল হল যাত্রা শুরুর পর থেকেই তো ঢেউ-এর দোলায় কাঁপন সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু দু পায়ে বল নেই কেন। মাথার ভেতর শূন্য ঠেকছে কেন ? কিন্তু সে কারণে কোন কষ্ট তো নয় বরং অতীব আনন্দ হচ্ছে। সে প্রবীণার দিকে তাকাল। মুখটি আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। তার চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছিল। চোখ বন্ধ করতেই চোখের পাতায় বেশঘোষার অপরূপা মুখমণ্ডল ভেসে উঠল। দ্রুত চোখ খুলে সে বেশঘোষার দিকে তাকাল। ওকি ? বেশঘোষা একা নয় কেন ? তার মনে হল দুজন বেশঘোষা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে আর ভুল করবে না স্থির করল। একজন যদি চারজনও হয়ে যায় তবু স্থির থাকবে। সে কথা বলল, 'আমি শপথ রাখছি, তুমিও শপথ রাখ। আমাকে সঙ্গ দাও।' সে হাত বাড়াল।

বেশঘোষা চকিতে তার জননীর দিকে তাকাল। সন্ন্যাসীর কথা জড়িয়ে গেছে। কম্পমান হাত তার সামনে। অভিজ্ঞতা তাকে বলছে এইসময় পুরুষেরা কি করবে তা তারাই জানে না। প্রবীণা বলল, 'হে তাপস, ও আপনার সামনেই আছে। আপনি আর একটু মদিরা পান করুন।'

বেশঘোষা চিৎকার করে না বলতে গিয়েও মুখে হাঁত চাপা দিয়ে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল। নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আছে ? কিন্তু দুজন কেন ?'

'আপনি পান করুন আর একটু দেখবেন একজন হয়ে যাবে।' প্রবীণা সযত্নে আরও মদিরা স্বর্ণপাত্রে ঢেলে দিল। বেশঘোষার দিকে ঝাপসা চোখে তাকাল নবীন সন্ন্যাসী। তার শরীর স্থির থাকছিল না কোনমতেই। আরও খানিকটা

মদিরা পান করার পর তার কথা বলার শক্তি অন্তর্হিত হল। কয়েক বার সেই চেষ্টা করে ধীরে ধীরে সে লুটিয়ে পড়ল।

প্রবীণা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতেই চারজন বারবনিতা উপস্থিত হল। প্রবীণা তাদের নির্দেশ দিল সন্ন্যাসীকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে যেতে। আগামী কয়েক প্রহর এর কোন চেতনা থাকবে না। কন্যার দিকে একঝলক অগ্নিনেত্রে তাকিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রবীণা উচ্চারণ করল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা সমগ্রের জন্যে উৎসর্গীকৃত, ব্যক্তির জন্যে নয়।'

বাইরে এসে দাঁড়াতেই একজন মাল্লা চিৎকার করে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ? আনন্দের কি কারণ ঘটেছে।' মাল্লাটি জানাল, অঙ্গদেশ আর দূরে নেই।

প্রবীণা দেখতে পেল অনেক দূরের আকাশে কালো ধোঁয়া। যজ্ঞ তাহলে এখনও চলছে। কিন্তু সেই যজ্ঞ যাকে না নিয়ে গেলে সম্পন্ন হবে না সে তো এখন অচেতন। প্রবীণা মাল্লাদের নির্দেশ দিল ওখানেই নোঙর করতে। চেতনা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বেশঘোষা নীরবে অশ্রুপাত করছিল। প্রবীণা বারঘোষা সেখানে উপস্থিত হয়েছে তাও সে বুঝতে পারেনি। প্রবীণা কন্যার অবস্থা দেখে বিরক্ত হল, 'তোমাকে আমি আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা দান করেছি কিন্তু তা থেকে তুমি কোন শিক্ষা গ্রহণ করোনি। আমাদের জীবিকায় হৃদয়ের কোন স্থান নেই। পুরুষমানুষকে একটি বিশেষ সময়ের জন্যে আনন্দ দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়। আত্মসংবরণ কর।'

বেশঘোষার মস্তক আন্দোলিত হল, 'আমি পারছি না। সন্ন্যাসী সাধারণ পুরুষ নন। তাঁর মনে কোন অসৎচিন্তা আসেনি। আমাদের কাছে যেসব পুরুষ আনন্দ পেতে আসে তাদের সঙ্গে ওঁর কোন তুলনাই চলে না। পৃথিবীতে কেউ এমনভাবে আমার সঙ্গ প্রার্থনা করেনি। কাউকে দেখে আমার দেহে-মনে এমন প্লাবন আসেনি।'

বারঘোষা বলল, 'উত্তম। তুমি অঙ্গদেশের মানুষের ক্ষতি করতে চাও ?'

'না !' বেশঘোষা চমকে উঠল, 'একথা কেন ?'

'ওই ঋষিপুত্রকে অক্ষত না নিয়ে গেলে অঙ্গদেশে বর্ষণ হবে না। তোমাদের যা অবস্থা তাতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে বিলম্ব হবে না। যেহেতু ওই তাপস এখনও ওই বিষয়ে অন্ধ তাই তার শরীরে জোয়ার এলেও প্রকাশের জন্যে সক্রিয় হতে পারছে না। মদিরা পান করার পর তার চোখ দেখে আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। সে কারণেই ওঁকে অচেতন করতে হল। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া ?'

'তার কামনার সঙ্গিনী হিসেবে আমি অঙ্গরাজকুমারীকে স্থির করে রেখেছি।'

'কিন্তু আমি কি দোষ করলাম ?'

'তুমি ওর উপযুক্ত নও। তুমি ইতিমধ্যেই পুরুষদগ্ধা। অঙ্গরাজকুমারী এখনও কুমারী। কোন পুরুষের স্পর্শ সে পায়নি। এক্ষেত্রে তাই রাজযোটক হবে।'

বেশঘোষার অশ্রু কোন বাধা মানছিল না। তা দেখে প্রবীণা একটুও তরল হল না। সে বলল, 'ভেবেছিলাম অঙ্গদেশ এখনও দূরে রয়েছে। কিন্তু যজ্ঞের

ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কয়েক প্রহর ঋষিপুত্র অচেতন থাকলে অসুবিধে হবে। আর এই অবস্থায় ওকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করাও যায় না। তুমি ওর চেতনা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর।'

'আমি ?' চমকে উঠল বেশঘোষা।

'হ্যাঁ। আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।' প্রবীণা আর দাঁড়ালেন না।

প্রায় স্খলিত পায়ে বেশঘোষা নবীন সন্ন্যাসীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। সেই সুগঠিত দেহের অধিকারী এখন ভগ্ন তরুর মত পড়ে আছে শয্যার ওপরে। বেশঘোষা পাশে এসে দাঁড়াতেই তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। নিঃশ্বাসের ছন্দে সন্ন্যাসীর প্রশস্ত বক্ষ ওঠানামা করছে। ওই বক্ষবৃন্তে সে চুম্বন করেছিল প্রথম দিন। শরীরের মিলনই একমাত্র কৌমার্য হরণের কারণ, সে-ঘটনায় যে কদম্ব ফুটেছিল ওই দেহে তাতে কি কৌমার্য অটুট থাকল ?

বেশঘোষা ঝুঁকে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসতেই চমকে উঠল। নবীন সন্ন্যাসীর ললাটের শৃঙ্গে শুকনো দাগ। ফাটলের সূক্ষ্মরেখা, যা দূর থেকে বোঝা যায় না।

প্রবীণা বারঘোষা একজন মাল্লাকে ক্ষুদ্র তরীতে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল মহারাজ লোমপাদের কাছে এই সংবাদ দিয়ে যে অভিযান সফল হয়েছে। একজন সাধারণ মাল্লার পক্ষে সরাসরি মহারাজের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব, বেচারি কোনক্রমে মহামন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হতে পারল। মহারাজ বিদ্রোহ দমন করতে অক্ষম বুঝতে পারায় মহামন্ত্রী অত্যন্ত গোপনে ধনসম্পদ রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। সৈন্যদলে বিদ্রোহীরা মিশে গেলেই তিনি যাতে অন্তর্হিত হতে পারেন তার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। তিনি নিশ্চিত যে মহারাজ লোমপাদের রাজত্ব যে কোন দিন শেষ হয়ে যেতে পারে।

মহামন্ত্রী রাজনীতি বোঝেন। রাজার নীতি তিনিই নির্ধারণ করেন। সেই রাজনীতি প্রজাদের বশে রেখেছিল এতকাল। এ রাজ্যের সাধারণ প্রজারা কৃষিজীবী। তাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ সামান্যই থাকত। জমিদাররা অবশ্যই সম্পন্ন। মহামন্ত্রী যেমন রাজ্যের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতেন তারাও রাজপুরুষের অনুপস্থিতিতে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চিরকাল রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। মহামন্ত্রী সে সুযোগ তাদের দিয়েছেন। না হলে রাজকোষ এবং ব্যক্তিকোষ বৃদ্ধি পেত না। মহারাজার প্রতি প্রীতি এবং ভীতির ব্যবহার করে মহামন্ত্রী এতকাল এই রাজ্যের প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, কিন্তু উদরের জ্বালা তীব্র হলে উষ্মা জাগে, তীব্রতর হলে মানুষের ভদ্রতাবোধ লোপ পায়। এই রাজ্যের মুষ্টিমেয় মানুষ এখনও নিরাপদে আহারবিহার করছে আর আপামর জনসাধারণ অভুক্ত হয়ে তাই দেখছে। এ অবস্থায় মহামন্ত্রীর সব রকম রাজনৈতিক প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। রাজনীতি যদি তলোয়ার হয় তবে ধর্ম তীর। সঠিকভাবে ছুঁড়লে বহু দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা যায়। ধর্মের দোহাই দিয়ে মহামন্ত্রী আবার প্রজাদের শান্ত করতে পেরেছিলেন। উদরের জ্বালা মানুষ উপেক্ষা করে থাকে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভ্যাসে। কিন্তু তার যে একটি

নির্দিষ্ট সময় আছে তা মহামন্ত্রীর জানা ছিল না। ধর্ম যদি অলৌকিকতা-বর্জিত হয় তা হলে ক্ষুধা প্রবল হতে বাধ্য। এই সময় যে পালায় সে বেঁচে থাকে।

কিন্তু মাল্লাটি যখন মহামন্ত্রীর কাছে নিবেদন করল অঙ্গদেশের সামান্য দূরে বারিধারায় ভাসমান তরীতে নির্মিত আশ্রমে নবীন সন্ন্যাসী এখন শায়িত, তখন তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র অবশ্য চিরদিনই একটু বেশি কথা বলে। লোকে অবশ্য ওকে মহামতি বলে মাথায় তুলেছে কিন্তু সেরকম কিছুই ভাবার দরকার নেই। সুমন্ত্র তাকে বলেছে এই সন্ন্যাসী অপাপবিদ্ধ, বীর্যবান, অসীম শক্তির অধিকারী, যে শক্তিকে দেবতারা ভয় পাবেন। ইনি ক্রোধ প্রকাশ করলে পৃথিবী ভস্মীভূত হতে পারে কারণ এঁর কোথাও মালিন্য লাগেনি। একমাত্র ইনিই পারেন অঙ্গদেশে বর্ষণ আনতে। মহামন্ত্রী তখন ভেবেছিলেন কালক্ষেপ করার একটা ভাল অছিলা পাওয়া গেল। কিন্তু এই মাল্লা যদি সত্যি কথা বলে তাহলে তো বিপদ। সুমন্ত্রর কথা যদি না ফলে, যদি ও তরুণ তাপস যজ্ঞের কাজ করা সত্ত্বেও বর্ষণ না নামে তা হলে প্রজাদের হাত থেকে নিস্তার নেই। পালাবার কোন পথ খোলা থাকবে না তাহলে। এখন আর অপেক্ষা করতে বিশ্বাসী নয় ওরা। যজ্ঞস্থলে হয়তো তাঁকে ঘিরেই রাখবে। কারণ প্রজারা তো তাঁর প্রতি প্রথমে বিরক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুমন্ত্রের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে সেটা এখন কার্যকর হবে এমন ভাবার কারণ নেই। বারবনিতারা গিয়েছিল ঋষিপুত্রকে নিয়ে আসতে। প্রবীণা বারঘোষার সংগৃহীত ললনাদের রূপ গুণের খ্যাতি এ রাজ্যের বাইরেও। যে মানুষ এর আগে কখনও নারী দর্শন করেনি সে এই দীর্ঘ নদীপথ নারীশরীর সম্পর্কে অজ্ঞান থাকবে তা ভাবা যায় না। বিশেষত ওই বারবনিতারা এই রকম এক নবীন খাদ্য ছেড়ে দেবে এমন তো ওদের স্বভাবে নেই। নিজের যৌবনে ওই প্রবীণা বারঘোষা কি মহামন্ত্রীর কাছে প্রবল আকর্ষণের বস্তু ছিল না! তার ছলাকলার কিছু স্মৃতি তো মহামন্ত্রীর মনে এখনও উত্তাপ সঞ্চার করে। প্রবীণা নিশ্চয়ই তার শিষ্যাদের সেসব শিখিয়েছে। তা হলেই ওই ঋষিপুত্র এতদিনে নদীপথেই তাঁর সমস্ত তেজ হারিয়েছেন। এক আধজন নয়, অতগুলো সুন্দরী শার্দুলীর সঙ্গে একটি হরিণশিশু বাস করে অক্ষত থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে ঋষিপুত্রকে দিয়ে যজ্ঞ করানো পণ্ডশ্রম হবে। অথচ মহারাজ লোমপাদকে এই আগমনবার্তা জানালে তিনি উন্মাদের মত ধাবিত হবেন নদীতীরে। তারপর?

মহামন্ত্রী মাল্লাকে বললেন, 'এই সংবাদ তুমি অঙ্গদেশের আর কাকে জানিয়েছ?'

মাল্লা বিনীত গলায় উত্তর দিল, 'মা বলেছেন আপনি কিংবা মহারাজ ছাড়া আর কাউকে যেন এই সংবাদ না জানাই। ব্রাহ্মণরা যেন জানতে না পারে। আমি সেই আদেশ পালন করেছি।'

মহামন্ত্রী খুশি হলেন। তিনি উদাস গলায় বললেন, 'এই সংবাদ আর কাউকে জানানোর দরকার নেই। সন্ধ্যা হয়ে এল। অপেক্ষা কর। আমি তোমার সঙ্গে তরীতে করে গিয়ে নিজে ঋষিপুত্রকে দেখে আসব। তরীটি ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। তবে ওটা এত ক্ষুদ্র যে দুজনের বেশি ভার বইতে পারবে না।'

'আমার এই যাওয়ার কথা তৃতীয়জন জানবে না।'

‘কিন্তু।’

‘কি কিন্তু ?’

‘সেখানে আমাদের নারীর পোশাকে থাকতে হত। সন্ন্যাসীর সামনে আসা নিষেধ ছিল। তিনি পুরুষ দেখলে ক্রুদ্ধ হতে পারেন। সেই ক্রোধ মারাত্মক। আপনি এই বেশে গেলে হয়তো তাঁর ক্রোধের শিকার হবেন।’ মাল্লা নিবেদন করল।

মহামন্ত্রী একটু থিতিয়ে গেলেন। এ বলে কি ! বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে নারীর পোশাক পরতে হবে ? সেই দৃশ্য কেউ দেখলে আর সম্মান অবশিষ্ট থাকবে ? আবার ঋষিপুত্রের ক্রোধের সামনে পড়া তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মহামন্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

ইদানিং তাঁর অল্পেই বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন গোপনে তরীতে গিয়ে প্রবীণার সঙ্গে কথা বলবেন। এমনও তো হতে পারে তিনি অলক্ষ্যে থেকে ঋষিপুত্রকে দর্শন করতে পারেন। গম্ভীর গলায় তিনি মাল্লাকে প্রশ্ন করলেন, ‘সন্ন্যাসী তরীতে কি করতেন ?’

‘তিনি সর্বদা নারীদের সান্নিধ্যে থাকতেন। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।’ কথাগুলো বলে মাল্লার মনে হল মহামন্ত্রী আরও কিছু জানতে চাইছেন। এভাবে কখনও এতবড় রাজপুরুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ সে পায়নি। তাই সে উৎসাহে জানাল, ‘কিন্তু কক্ষের বাইরে এসে নারীরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করত, তখন সেসব কথাবার্তা আমরা শুনেছি।’

‘কি বলত তারা ?’

মাল্লার মুখমণ্ডল রসপূর্ণ হল, ‘তারা আক্ষেপ করত। এরকম সুদর্শন সুস্বাস্থ্যবান তরুণকে পেয়েও যৌবনের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে নিঃশ্বাস ফেলত।’

‘বঞ্চিত হচ্ছে ?’ মহামন্ত্রী চোখ বড় করলেন।

‘তাই তো বলত তারা। অবশ্য তরুণী বেশঘোষা ওই দলে থাকত না।’

‘সে কোথায় থাকত ?’

‘শুনেছি সে সবসময় সন্ন্যাসীকে সঙ্গ দিত।’

‘হুম !’ মহামন্ত্রী বুঝলেন প্রবীণা বারঘোষা নিজের কন্যাকে উৎসর্গ করেছে ওই সন্ন্যাসীর মন দখল করতে। এই সব বারবনিতারা উপযুক্ত পুরুষ পেলে সন্তান উৎপাদন করায়। বোঝাই যাচ্ছে প্রবীণা এই লোভ সংবরণ করতে পারেনি। তিনি মাল্লাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে মহামন্ত্রী যখন নিঃশব্দে মাল্লার সঙ্গে নদীতটের দিকে যাত্রা করেছেন তখন আরও চারটি মানুষ ছায়ার মত তাঁদের অনুসরণ করল। মহামন্ত্রী অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরেছিলেন যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। কিন্তু তিনি জানতেন না আজ প্রত্যূষ থেকেই তাঁর ওপর নজর রাখা হয়েছে। মাল্লা যখন তরী আনতে গেল তখন তিনি ছায়ামূর্তিগুলোকে আবিষ্কার করলেন। মূর্তিদের মুখে কৃষ্ণাবরণ থাকায় পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের নেতা জানতে চাইল, ‘এই অন্ধকারে এরকম বেশে মন্ত্রীমশাই চলেছেন কোথায় ?’

মহামন্ত্রী ভীত হলেও দাপট দেখাতে চাইলেন, 'কে, কে তোমরা ? কি চাও ?'

'আপনি পালাচ্ছেন। আপনার পালানো বন্ধ করতে চাই। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজপ্রাসাদকে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। আপনাদের ওই যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়া হবে। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। এখন কি আর যেতে দিতে পারি!'

মহামন্ত্রী ক্ষিপ্ত হলেন, 'এত বড় আস্পর্ধা! আমাকে এসব বলা হচ্ছে। সৈন্যরা জানতে পারলে!' মহামন্ত্রীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চারজনেই হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে নেতা বলল, 'আমরাই সৈন্য। এখন জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য নেই। ফিরে চলুন। আজ রাত্রে শেষ সুখনিদ্রার স্বাদ নিন।'

মহামন্ত্রীর শরীরে আর বল অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর এখন মাল্লাটিকেও সন্দেহ হল। সে তাঁকে ভুলিয়ে এত দূরে বের করে এনেছে। ছায়ামূর্তিদের নেতা বলল, 'আপনি যে লুকিয়ে ধনসম্পদ নিয়ে পালাবেন তা আমরা জানতাম। আমাদের মহারাজকে আপনিই বিপথে চালনা করেছেন। কিন্তু সেসব ধনসম্পদ কোথায় ?'

এই সময় মহামন্ত্রীর লোপ পাওয়া বুদ্ধি ফিরে এল, 'দ্যাখো, কোন ধনসম্পদ আমার সঙ্গে নেই।' তিনি ভেবে নিলেন এই অবস্থায় ঝুঁকি না নিলে প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব হয়ে যাবে, 'আমি যাচ্ছিলাম অভ্যর্থনা করতে।'

'অভ্যর্থনা ? কাকে ? অযোধ্যাপতির সৈন্যদলকে ?' হাসি ভেসে এল।

'না না। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ মহারাজ যে যজ্ঞ শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ হবে না যদি ঋষি বিভাণ্ডকের অমিততেজ পুত্র এসে ঋত্বিক না হন। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবের বলেই আমি শুনেছি। অকারণেই তিনি ক্রুদ্ধ হন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো মহারাজ একদল বারবনিতাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিভ্রম সৃষ্টি করে এখানে নিয়ে আসার জন্যে। সংবাদ পেয়েছি তাঁকে নিয়ে তরী কিছু দূরে অপেক্ষা করছে। সেকারণেই আমি যাচ্ছি।'

মহামন্ত্রীর কথা শুনে চারজন চুপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একজন বলল, 'যে ঋষি বারবনিতাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হন তিনি আর কি করবেন ?'

প্রতিবাদে তাদের একজন জবাব দিল, 'না হে। দেবতারাও অপ্সরাদের মোহে ভোলে।'

তাদের নেতা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মন্ত্রীমশাই, ঋষি যদি আপনাকে ভস্ম করে দেয় ?' প্রশ্নটির জবাব যেহেতু নিজের জানা নেই মহামন্ত্রী কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নেতা বলল, 'আগামীকাল ক্ষমতা দখল করার পর বরুণদেব যে আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।'

অন্যজন বলল, 'ব্রাহ্মণরা তো সেরকমই আশ্বাস দিয়েছে।'

'আশ্বাস এক জিনিস আর সেটা কাজে পরিণত করা আর এক জিনিস। কিন্তু ওই ঋষিপুত্র সম্পর্কে যেসব কাহিনী প্রচারিত হয়েছে তা সত্য কিনা জানার জন্যে মাত্র দুতিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।' দলনেতা এই কথা বলে একজনকে নির্দেশ দিল, 'তুমি সত্বর যাও। সবাইকে জানিয়ে দাও বিদ্রোহ তিনদিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। একথাও জানাও ঋষিপুত্র এসেছেন।'

মহামন্ত্রীর শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল। তিনি বললেন, 'এবার আমি যেতে পারি ?'

'না। আপনি যে নদীপথে সঠিক জায়গায় যাচ্ছেন তার কোন প্রমাণ নেই। আমরা মহারাজকে সংবাদটা জানাচ্ছি। যা ব্যবস্থা নেওয়ার তিনিই করুন।'

অনিদ্রা এখন মহারাজ লোমপাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাতায়নে দাঁড়িয়ে তিনি দূরের নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। এই সময় রাজকুমারী শান্তা তাঁর পেছনে দাঁড়াল, 'পিতা, আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন না।'

লোমপাদ ফিরে তাকালেন, 'রাজা কিংবা পিতা না হওয়া পর্যন্ত একথা বলা সহজ।'

'কিন্তু দুশ্চিন্তা করে কি লাভ ? ব্রাহ্মণরা বরুণদেবকে [illegible] করেছেন আমাদের প্রতি রুষ্ট হতে। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের তো পরিত্রাণ নেই।' শান্তা বলল।

'তা হলে এই যজ্ঞ কেন ? কেন মুনি ঋষি পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন ? যখনই এঁরা পরাস্ত হন তখনই আর একটি পথের নির্দেশ দেন।' লোমপাদ দুই হাত পেছনে রেখে আবার পায়চারি শুরু করতেই দ্বারী জানাল, 'সংবাদ আছে।'

মহারাজ অধীর হলেন। একবার কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস।'

শান্তা জানতে চাইল, 'পিতা, আমি কি এখানে থাকতে পারি ?'

লোমপাদ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। তারপর দ্বারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। ব্যস্ত পায়ে কিছুটা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন, 'বুঝতে পেরেছি, তুমি বিফল হয়েছ। হায়, আর আমার কোন আশা রইল না।'

প্রবীণা বারঘোষা প্রায় আভূমি নত হয়ে বলল, 'না মহারাজ, দাসী কখনও ব্যর্থ হয় না।'

মহারাজ লোমপাদ চিৎকার করে উঠলেন, 'কি বললে ? ব্যর্থ হওনি ?'

'হ্যাঁ মহারাজ। তিনি এসেছেন।' প্রবীণা জানাল।

'কোথায় তিনি ?' মহারাজ ব্যস্ত হলেন।

'মধ্যনদীতে। আমি আপনাকে সংবাদ দেওয়ার জন্যে একজন বিশ্বাসী মাল্লাকে গোপনে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই চলে এলাম। আর রাজধানীতে প্রবেশ করেই বুঝলাম সংবাদ অনেকের কানেই পৌঁছেছে। তারা দলে দলে নদীতটে সমবেত হচ্ছে। আর এখন জানছি শুধু আপনিই—।'

'হ্যাঁ, শুধু আমিই জানি না আর সবাই জানে। চমৎকার। মহামন্ত্রী কোথায় ?'

'আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।' শান্তা বলল।

প্রবীণা তাকে শান্ত করল, 'না রাজকুমারী, ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মহামন্ত্রী বজ্রাহতের মত যজ্ঞভূমিতে বসে আছেন। দেখে মনে হল তাঁর ওপর ঝড় বয়ে গেছে।'

লোমপাদ দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন, 'কিন্তু তুমি তাঁকে নদীতে রেখে এসেছ কেন ?'

'কারণ আছে মহারাজ।'
'কি কারণ ?'
'তরুণ তাপস অরণ্যে বাসকালীন কোন নারীর মুখ দর্শন করেননি।'
'সেকথা তো আমরা জানি।' মহারাজ ব্যস্ত হচ্ছিলেন।
'আমার কন্যাদের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আমার স্বকন্যাকে অবলম্বন করার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝানো হয়েছে ও তাঁর যোগ্য সুন্দরী নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী আছে অঙ্গদেশে। তিনি তাঁকে দর্শনের জন্যে এখানে আসতে সম্মত হয়েছেন মহারাজ।' প্রবীণা নিবেদন করল।
'কে সেই সুন্দরী ?' শান্তা জিজ্ঞাসা করল।
'আপনি রাজকুমারী।'
'না।' দুহাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী শান্তা।
'এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না ওকে নিয়ে আসার। আমি এও বলেছি যে আপনি অসূর্যম্পশ্যা। অবশ্য আপনি যে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এতে তো কারো দ্বিমত নেই।'
'আমি অসূর্যম্পশ্যা ?' রাজকুমারীর যেন বাক্‌স্ফুরণ হচ্ছিল না।
'বলতেই হয়েছে। দয়া করে আপনি এখন বাইরে যাবেন না।'
এতক্ষণে মহারাজ কথা বললেন, 'কিন্তু তাঁকে কিভাবে নিয়ে আসা হবে ?'
'আমি বুঝতে পারছি না। যদি তিনি তীরে এসে পুরুষদের দেখেন তাহলে ক্ষিপ্ত হতে পারেন। যদি জানেন যজ্ঞের ঋত্বিক হতে ওঁকে আনা হয়েছে তাহলে তিনি আমাদের ভস্ম করে দিতে পারেন। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাজকুমারীকে দর্শন করা।'
প্রবীণার কথা শেষ হওয়ামাত্র শান্তা বলল, 'একজন নারীলোভী কামুক ঋষিপুত্রের সামনে কি আমাকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হবে ?'
প্রবীণা দ্রুত হাত নাড়ল, 'না রাজকুমারী তিনি কামুক কিংবা নারীলোভী নন। এ সম্পর্কে তাঁর কোন বোধই জন্মায়নি। তাঁর মধ্যে আছে শিশুর কৌতূহল। তাঁর আচরণ বিতৃষ্ণা আনে না, কৌতুক জন্মায় মনে। পৃথিবীর অন্য পুরুষদের সঙ্গে আপনি ওঁকে মেলাবেন না।'
লোমপাদ একবার কন্যার দিকে তাকালেন। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন প্রবীণাকে, 'প্রত্যাগমনের সময় তিনি নারীদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করেছিলেন ?'
'অত্যন্ত দামী হীরকখণ্ডের জন্যে শিশু যেমন বায়না ধরে ঔজ্জ্বল্যের কারণে, মূল্য বোঝে না, ব্যবহার জানে না, কাছে পেলেই খুশি হয়, তরুণ তাপসের আচরণ সেইরকম ছিল। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা তাঁর অজ্ঞাত, আমার কন্যাদের ওপর নির্দেশ ছিল যেন তাঁকে জ্ঞান দান না করা হয়। কিন্তু মহারাজ, আমরা অকারণে কালক্ষেপ করছি। ক্রুদ্ধ হলে তিনি অঙ্গদেশ দগ্ধ করতে পারেন।' প্রবীণা জানাল।
লোমপাদ বিব্রত হয়ে বললেন, 'কি উপায়ে তাঁকে নগরে নিয়ে আসব।'
প্রবীণা বারঘোষা বলল, 'একটি উপায় আছে। নদীতট থেকে সমস্ত পুরুষদের

আপনি সরে যেতে বলুন। ওখান থেকে নগরের নারীদের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসা হোক। যজ্ঞের ঋষিদের দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন না কারণ তাঁরা দেখতে তাঁর পিতার মতন। নারীদের দেখে বিরূপ হবেন না কারণ তিনি ইতিমধ্যে নারীদের চেহারায় অভ্যস্ত। কিন্তু যুবাপুরুষদের দেখে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।'

সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হল। পুরুষ প্রজারা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না নদীতট ত্যাগ করতে। কিন্তু ঋষিপুত্রের ক্রোধের পরিণাম কি হবে জানতে পারার পরে সবাই দ্রুত সরে গেল। প্রাণভয় যে কোন কৌতূহলকে দমন করে। প্রবীণার ওপর দায়িত্ব পড়ল ঋষিপুত্রকে যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসার। কারণ মহারাজ লোমপাদও একজন পুরুষ।

দ্রুতগামী তরীতে প্রবীণা ফিরে এল ভাসমান আশ্রমে। নারীবেশী মাল্লাদের সাহায্যে ওপরে উঠে এসে সে বুঝল আশ্রম শান্ত। ধীর পায়ে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে সে সুন্দরীদের দেখতে পেল। তাকে দেখামাত্র তারা এগিয়ে এল, 'একটু আগে সন্ন্যাসীব চেতনা ফিরে এসেছে। কিন্তু তিনি শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।'

'আমার কন্যা কোথায়?'

'সে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।'

প্রবীণা নির্দেশ দিলেন নোঙর তুলে ফেলতে। তরপর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। তরুণ তাপস দুহাতে বেশঘোষার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আমার কি হয়েছিল? কোন কিছুই যে স্মরণে আসছে না। মনে হয় সমস্ত অন্ধকার। আর এখনও যেন মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে আছে। আমি ঈশ্বরচিন্তাও করতে পারছি না।'

বেশঘোষা পরম যত্নে একটি হাত মুক্ত করে ঋষিপুত্রের কেশ বিন্যস্ত কবে দিল, 'আপনাব কিছুই হয়নি। আমি সর্বদা আপনার সঙ্গী ছিলাম।'

প্রবীণা মৃদু শব্দে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে বলল, 'হে তাপস, এবার আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবার লগ্ন উপস্থিত। আমরা এখনই অঙ্গদেশে পৌঁছাচ্ছি।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'কিন্তু আমার মন স্থির নেই। নিদ্রান্তে কখনও এমন বোধ হয় না। মনে হচ্ছে সমস্ত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমি এখনই ঈশ্বরাধনার জন্যে আসনে বসব। হয়তো পিতৃদেব আমার সন্ধান করছেন। আমাকে জানতে হবে।'

প্রবীণা বলল, 'আপনার কাজে বাধা দেব না। কিন্তু একটি অনুরোধ। এই কাজটি আপনি আশ্রমে না করে অঙ্গরাজধানীতে করলে কি খুব অসুবিধে হবে? কাবণ যাত্রা পথ শেষ হয়ে এসেছে এবং নদীতটে সহস্রাধিক সুন্দরী মানবী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'সহস্রাধিক সুন্দরীতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা বলেছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেখানে আছে। আমি শুধু তারই দর্শন চাই।'

ঋষিপুত্র কথাগুলো বলামাত্র বেশঘোষা উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রবীণা তাকে আদেশ দিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ! এখানে থাক। ওঁকে নিয়ে তুমি নদীতটে নামবে।'

বেশঘোষা অনেক কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করল।

তরুণ সন্ন্যাসী বিস্মিত। এত মানুষ? রাত্রির এই দ্বিতীয় প্রহরেও এত মানুষ তাঁর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে? কিন্তু এরা তো সবাই সুন্দরী না! কেউ কেউ তো রীতিমত কুৎসিত। ওরা যেভাবে তাকে লক্ষ করছে তাতে সঙ্কুচিত হল সে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কি চায়?'

তার এক পাশে প্রবীণা অন্য পাশে বেশঘোষা। বেশঘোষা বলল, 'আপনার দর্শন।'

'কেন?'

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর্যবান মনুষের দর্শন নারীরা তো চাইবেই।'

'কিন্তু আমি তো জানি না।'

বেশঘোষার চিবুক বুকে নেমে এল। নবীন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এদের অনেকেই অস্থিসার, পরিধান মলিন। কেন?'

প্রবীণা জবাব দিল, 'কারণ দেবতা এদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন।'

'দেবতা? কোন দেবতা?'

'বরুণদেব। তিনি এই রাজ্যে বারিবর্ষণ করেন না।'

'সেকি! বারি ছাড়া তরু বাঁচবে কি করে?'

'বারি ছাড়া মানুষেরও একই দশা হয়।'

'ও। কিন্তু এসব কথায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। সেই পরমা কোথায়?' সমবেত নারীরা তাদের পথ করে দিয়েছিল। ওরা তার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। ঋষিপুত্রের শারীরিক গঠন দেখে নারীরা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছিল। কিন্তু শৃঙ্গের কাহিনী শুনে তারা যতখানি আশা করেছিল ততখানি না দেখে কিঞ্চিত হতাশও হয়েছিল। প্রবীণা বলল, 'অপরাধ নেবেন না। সেই পরমাসুন্দরী অত্যন্ত অভিমানী।'

'অভিমান? সেটি কি বস্তু?'

'প্রাপ্য জিনিস না পেলে হৃদয়ে যে কষ্ট জাগে অথচ প্রকাশ করা যায় না তার নাম অভিমান। সেই পরমাসুন্দরী অভিমানে কক্ষের দ্বার বন্ধ করে আছেন।' প্রবীণা বলল।

'কি সেই প্রাপ্য জিনিস যা থেকে সে বঞ্চিত? কে বঞ্চিত করেছে?'

'বরুণদেব। তিনি বর্ষণ শুরু না করা পর্যন্ত পরমাসুন্দরী পৃথিবীর কোন মানুষের মুখ দেখবেন না।'

'আমারও না?'

'না।'

'কিন্তু আমি তো তার মুখদর্শন করতে পারি। সে চক্ষু বন্ধ করে থাকুক।'

'তাপস, আপনি জানেন না, তিনি অভিমানে কি করতে পারেন।'

'তাহলে তোমরা আমাকে এখানে আনলে কেন? আমার অস্বস্তি হচ্ছে। যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ আর মানুষ।' তার মুখে ক্রোধ জন্ম নিচ্ছিল।

প্রবীণা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'প্রকৃত পুরুষ তিনিই, যিনি নারীর অভিমান দূর করে থাকেন। হে তাপস, পরমাসুন্দরীর অভিমান দূর করতে কি আপনি সক্রিয় হতে

পারেন না। আপনি কি এতটা নির্দয় হবেন ?'

নবীন সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হল। প্রশ্নটি সে সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারছিল না। তাছাড়া এখানে আসার পর গৃহের চেহারা দেখে, মানুষের পোশাক, পথ এবং উদ্যান নজরে পড়ার পর তার বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই সে উপলব্ধি করেছিল, সব বিস্ময় প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ না। প্রবীণা যে অনুরোধ করল তার সম্যক চেহারা জ্ঞাত না হওয়া সত্ত্বেও সে অভ্যাসে ললাটের শৃঙ্গে হাত বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন করল, 'কি ভাবে ?' এবং সেটা করার সময় স্পষ্ট অনুভব করল তার আঙুলে লাগছে। শৃঙ্গটি আর আগের মত মসৃণ নেই। তার গায়ে তীক্ষ্ণ কিছু জন্ম নিয়েছে। নবীন সন্ন্যাসী চিন্তিত হল। এই জায়গার কোন মানুষের ললাটে সে শৃঙ্গ লক্ষ করেনি। হয়তো মানবীদের শৃঙ্গ থাকে না।

প্রবীণা বলল, 'আপনি যদি, ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, বরুণদেবকে তুষ্ট করেন তাহলে অঙ্গদেশে বর্ষণ শুরু হতে পারে, পরমাসুন্দরীর দর্শন পাওয়া যাবে।'

'বরুণদেব ? অসম্ভব। দেবতারা ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর জগৎ-শাসনের সুবিধের জন্যে তাঁদের তৈরি করেছেন। কিন্তু তারা নিজেদের উন্নত করেনি। কোনরকম ধর্মাচরণে তাদের প্রবৃত্তি নেই। অমৃতের কল্যাণে তাঁরা অমর অথচ সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত। ঈশ্বরের পক্ষে তাঁদের ত্যাগ করার কোন উপায় নেই। আর তুমি আমাকে সেই দেবতাদের একজনকে আরাধনা করতে বলছ ? আমি দেবরাত। আমার পক্ষে তা সম্ভব না।' নবীন সন্ন্যাসী যতক্ষণে এইসব কথা শেষ করল ততক্ষণে তাঁরা যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে দেখল পিতৃদেবের চেহারার কিছু মানুষ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে চলেছে। অবশ্য কিছু মানুষের চেহারা বেশ নধর, জটাভস্ম থাকা সত্ত্বেও পিতৃদেবের বিপরীত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা ?'

প্রবীণা জবাব দিল, 'এঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ঋষি। বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এঁরা উপাসনা করে চলেছেন। কিন্তু—।'

'তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। এঁদের আপাতত স্তব্ধ হতে বল। আমি সহ্য করতে পারছি না।' তরুণ সন্ন্যাসী দুই কানে হাত চাপা দিল। ঋষিপুত্রকে দেখে অন্য ঋষিরা এতক্ষণ উদ্দীপ্ত হয়ে মন্ত্রপাঠ করছিলেন, কিন্তু কথাটা শোনামাত্র অপমানিত বোধ করলেন। তাঁদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু ঋষিপুত্রের ক্রোধের স্বরূপ নিয়ে নানান গল্প শোনা থাকায় তাঁরা নীরবে স্থানত্যাগ করলেন। যজ্ঞাগ্নি জ্বলছিল। নবীন সন্ন্যাসী সেই দিকে তাকাল। তার মুখে ঈষৎ আগ্রহ জন্মাল।

প্রবীণা তার পাশেই ছিল। বলল, 'বরুণদেব রুষ্ট হয়েছেন বলে অঙ্গদেশের মানুষ মৃতপ্রায় হয়েছে। এই অবস্থা থেকে আপনি ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।'

সে বলল, 'আকাশ থেকে সলিল যদি নাই পড়ে ক্ষতি কি, ওই নদী থেকে তো তোমরা সংগ্রহ করতে পারো।'

প্রবীণা বলল, 'নদীর কাছে যারা থাকে তারা সে সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু দূরদূরান্তের মানুষরা তো সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।'

নবীন সন্ন্যাসী কুণ্ডের সামনে এগিয়ে গেল। প্রথমে এক হাত চতুষ্কোণ মাটি

কুশ দিয়ে তিনবার মার্জনা করে গোময় লেপন করল। কুশ দিয়ে পুব দিকে তিনটি রেখা আঁকল। অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী দিয়ে সেই রেখা থেকে তিনবার মাটি তুলল। তারপর জ্বলন্ত কাঠ একটি কাংস্যপাত্রে তুলে দক্ষিণ দিকে ছুঁড়ে ফেলল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকল সে। তারপর উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'হে, ব্রহ্ম, হে ঈশ্বর ! আপনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আপনার প্রথম দান সলিল। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ্ নঃ। উশতীরিব মতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নাঃ। জননী যেরকম স্নেহ প্রকাশ করে সন্তানের কল্যাণভাজন করে সেরকম তোমার স্বকীয় রসধারায় আমাদের কল্যাণ কর। তোমার যে রসে সমস্ত জগত সম্প্রীত সেই রসে আমরা যাতে পরিতৃপ্ত হতে পারি তাই কর।'

এই প্রার্থনা শেষ হওয়ামাত্র মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসে শীতল স্পর্শ পেল অঙ্গদেশের মানুষ। দীর্ঘকাল পরে সেই বাতাসের স্পর্শ পেয়ে তারা আবেগে কম্পিত হল। মুহূর্তেই অগ্নিরূপ আকাশকে কৃষ্ণমেঘ গ্রাস করে নিল। পৃথিবীর সমস্ত আলো যা রাত্রেও অবশিষ্ট ছিল তা হল অন্তর্হিত। বিদ্যুৎ নেই, বজ্র তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে না। কিন্তু অঙ্গদেশের শুষ্ক মটিতে সেই কৃষ্ণমেঘ পরম স্নেহে সলিল হয়ে নেমে আসছিল। ঘরে ঘরে তখন উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যে সমস্ত রমণী ওই নিশীথে উপস্থিত হয়েছিল তারা আনন্দিত হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। নবীন সন্ন্যাসীর শরীরে ফোঁটা ফোঁটা সলিল জমছিল। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'নারীদের কণ্ঠের সঙ্গে আর এক ধবনের গম্ভীর এবং কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। তারা কারা ?'

প্রবীণা দুই হাত জোড় করে তার পদপ্রান্তে পড়েছিল। বেশঘোষা মুগ্ধ নয়নে নবীন সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে। বর্ষণে যে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে বসন তাতে তার হুঁশ নেই। তরুণ সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সেদিকে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তোমাতে নেই কেন ? পিতৃদেবের মুখে শুনেছি আরাধ্য দেবতার দর্শন পেলে এইরকম বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ অথচ তোমাব দৃষ্টি সক্রিয় না। কেন ?'

বেশঘোষা লজ্জিত হল। সে মুখ নামাল। প্রবীণা মাথা তুলল, 'হে তাপস, আপনার আগের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। নারীদের সুমিষ্ট স্বরের সঙ্গে যাদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তারা পুরুষ। নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের ওপব।'

'পুরুষ।' তরুণ সন্ন্যাসীর ললাটের মসৃণতা মুহূর্তের জন্যে লোপ পেল, 'এই নগরীতে তাহলে পুরুষ আছে। পুরুষ মানে আমার কিংবা পিতৃদেবের চেহারার মানুষ। একথা আগে বলনি কেন ?' তার মুখের চেহারা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

প্রবীণা বলল, 'মেঘের জন্যে যেমন আকাশের প্রয়োজন নারীর জন্যে তেমনি পুরুষ। অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুর অভাবে প্রজ্বলিত হতে পারে না তেমনি পুরুষবিহীন নারী তো অকল্পনীয়। এই সরল সত্যটি আপনি জ্ঞাত বলে জানাইনি।'

ধন্দে পড়ল সে। ইতিমধ্যে সে বুঝে গিয়েছে কখন কি বলা উচিত। সত্যটি যদি সরল হয় তাহলে তো তার জানা উচিত। সে স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'কিন্তু সেই পরমাসুন্দরী কোন্ পুরুষের দায়িত্বে রয়েছে ?'

'তার পিতার। তিনি বৃদ্ধ, এই রাজ্যের মহারাজা।'

'মহারাজা কি করে পিতা হয়?'

'সৃষ্টিকর্তার বিধানে। তবে পিতা কন্যার সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পুরুষের সন্ধান পেলে সেই দায়িত্ব তিনি হস্তান্তর করে থাকেন।'

'সেই উপযুক্ত পুরুষটি কে?'

'এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

বাক্যটি শোনার পর নবীন সন্ন্যাসীর উষ্মা কিছুটা হ্রাস পেল। সে বেশঘোষাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার দায়িত্ব কোন পুরুষের ওপব সমর্পিত?'

বেশঘোষা চকিতে নবীন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমি নদীর মত। প্রতিটি ঘাটের মানুষ মনে করে আমি তার। শুধু আমিই জানি না।' এই সময় বর্ষণেব বেগ বেড়ে গেল। প্রবীণা এবং বেশঘোষাকে এগিয়ে যেতে দেখে সে অনুসবণ করল। রাজপ্রাসাদের সামনে একটি আচ্ছাদনের নিচে আসার পব সে দৃশ্যটি দেখতে পেল। নারী এবং তাদের রক্ষকবা উন্মাদেব মত এই বর্ষণ গায়ে মাখছে। অরণ্যে বৃষ্টি এলে যে সুমধুর গন্ধ, তরুশাখার আন্দোলনে যে শব্দের জন্ম হয় তা এখানে নেই। কিন্তু অদ্ভুত সোঁদো গন্ধ চারধারে ছড়িয়ে পডছে। সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রবীণা বলল, 'মিলনের সময় পৃথিবীর শরীর থেকে এইবকম তৃপ্তিময় ঘ্রাণ বেরিয়ে আসে।'

ইতিমধ্যে নবীন সন্ন্যাসীর কেশ, শ্মশ্রু, বল্কল কিঞ্চিত সিক্ত হয়েছিল। বেশঘোষার বসন এতই সিক্ত যে সসঙ্কোচে নিজেকে আবরিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ না করে নবীন সন্ন্যাসী জানতে চাইল, 'কোথায সেই পরমাসুন্দরী, তাকে দেখাতে বিলম্ব করছ কেন?' প্রবীণা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সব কিছুব জন্যে একটা সময় দবকার তাপস।' হঠাৎ বেশঘোষা বলল, 'না মা। অঙ্গদেশে বর্ষণ আনতে ইনি যেমন সময় নেননি তেমনি রাজকুমারী যদি ওই প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তবে এখন তাঁর সময় নেওয়া উচিত নয়।'

প্রবীণা চমকে তাকাল কন্যার দিকে। এতক্ষণ সে কন্যাকে তার অনুরাগ প্রকাশের জন্যে নানান ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে যে নিজেই তাপসকে রাজকুমারীর কাছে পাঠাতে ব্যস্ত হবে তা ওর অকল্পনীয় ছিল। কথাটা শোনামাত্র তাপস মাথা নাড়ল, 'ঠিক ঠিক। আমার আর সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি দর্শন সেরে অরণ্যে ফিরে যেতে পারি ততই শ্রেয।'

অবিশ্রান্ত বারিধারা নেমে আসছিল আকাশ থেকে। এই মুহূর্তে মুখ ওপরে তুললে কল্পনাতেও পাওয়া যাবে না ক্ষণিক আগের প্রকৃতিকে। বাতাস ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। দূরদূরান্তের আকাশ জুড়ে শুধু মেঘ আর মেঘ। প্রবীণা রাজপ্রাসাদে চলে যাওয়াব পর বেশঘোষা বলল, 'সন্ন্যাসী, এবার আমাকে অনুমতি দিন। আমার কর্তব্য শেষ।'

'কর্তব্য?' নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অন্যরকম শুনল সে।

চমকে উঠে আত্মসংবরণ করল বেশঘোষা। যে কর্তব্যের চাপে তাকে নৌকাবিহার করতে হয়েছে তা এই নবীন সন্ন্যাসীর কাছে প্রকাশ পেলে ক্রোধের অনল জ্বলবে। সে দ্রুত বলল, 'আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা

সুন্দরীর কাছে নিয়ে আসব। সেই সময় উপস্থিত। এখন যেতে দিন।' সে বলল, 'কিন্তু তোমার নির্দিষ্ট সুন্দরীকে আমি এখনও দেখিনি। আমার চোখে যদি সে সুন্দরী না হয়?' বেশঘোষা ঘন ঘন মাথা নাড়ল, 'সূর্য উঠলে যেমন পৃথিবী জাগ্রত হয় তেমনই তাকে দেখলেই আপনার মনে কোন দ্বিধা থাকবে না। সে-সময় আমার উপস্থিতি বাহুল্য। কারণ সূর্যের আলোয় তারা তো দূরের কথা চাঁদকেও হৃতসর্বস্ব মনে হয়। আমি যাই তবে—।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'কিন্তু কি করলে আমি তোমার দেখা পাব?'

'আমার দেখা আপনি কেন চান সন্ন্যাসী?'

'আমি ঠিক জানি না। হয়তো তুমিই প্রথম নারী যার দর্শন আমি পেয়েছি, তাই।'

'বেশ। আমার মাকে জানাবেন আপনার বাসনার কথা। আমাদের সমাজের নিয়মানুযায়ী তিনি আদেশ করলেই আমাকে আসতে হবে। তবে মিনতি করছি, এ প্রয়োজন না হয় যেন। ভবিষ্যতে আপনি কষ্ট পান আমি চাই না। কারণ মানুষ কষ্ট পেলেই আর একজনের কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।' বেশঘোষা নবীন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করল। তারপব ধীরে ধীরে সেই বর্ষাস্নাত মধ্যরাতের রাজপথে নেমে গেল। তার শরীরে অজস্র সলিলধারা, অতএব এই সময় আত্মসংবরণের কোনও প্রয়োজন হল না। এখন পথে কোন মানুষ নেই। দীর্ঘকাল পরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অঙ্গদেশের প্রজারা যে যার ঘরে ঘুমাচ্ছে। চৌচির মাটির মুখ জুড়তে শুরু করেছে। ধরণী প্রাণভরে রসসিক্ত হচ্ছে। যজ্ঞে অংশ গ্রহণ কবেছিলেন যে-সমস্ত ঋষিবা তাঁরা স্তব্ধ। তাঁরা শুনেছেন বরুণদেবকে নয়, সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেছেন ঋষিপুত্র। প্রচলিত পূজাপদ্ধতির ব্যাপক কোন প্রয়োজন হয়নি। রাজ্য থেকে বিতাড়িত ব্রাহ্মণবা প্রথমে হতভম্ব এবং শেষে ভীত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ নতুনভাবে বরুণদেবকে বিরূপ হবার জন্যে প্রার্থনা করেও তাঁর কোন সাড়া পেল না। ব্রাহ্মণরা চুপি চুপি ফিরে আসছিল যে যার আলয়ে।

নবীন সন্ন্যাসী দেখল প্রবীণা ফিরে আসছে। কিন্তু সে একা নয়। তার পেছনে করজোড়ে এক দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ সংকুচিত পদক্ষেপে আসছেন। পুরুষটি বৃদ্ধ কারণ তাঁর মুখের শ্মশ্রু শুভ্র, ললাটেব রেখা গভীর। কিন্তু শরীরে মেদ থাকায় পিতৃদেবের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। পুরুষটির বর্ণবহুল পোশাক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রবীণা সামনে এসে বলল, 'হে তাপস। আপনি এঁকে দর্শন করে ক্রুদ্ধ হবেন না। ফল আহরণ করতে গেলে যেমন বৃক্ষের দর্শন প্রয়োজন হয় তেমনই সেই পরমাসুন্দরীর সাক্ষাৎ পেতে হলে এঁকে প্রয়োজন।'

নবীন সন্ন্যাসী কিছুটা উষ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ও, তুমিই তার রক্ষক?'

মহারাজ লোমপাদ আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন। যদিও ঋষিপুত্রের ক্রোধের লক্ষ্য হবার আশঙ্কায় তার সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। প্রবীণা বলল, 'এঁর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ইনি মহারাজ লোমপাদ। অঙ্গদেশের ইনি কর্ণধার। পরমা সুন্দরী রাজকুমারী শান্তার ইনি পিতা।'

লোমপাদ যুক্ত করে বললেন, 'হে ঋষিপুত্র, হে নবীন সন্ন্যাসী আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। অঙ্গদেশের সমস্ত মানুষকে প্রাণদান করেছেন।'

নবীন সন্ন্যাসী বিস্মিত হল, 'সেকি! কি করলাম আমি?'

লোমপাদ বললেন, 'যখন সমস্ত ঋষিমুনিরা বরুণদেবকে তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন আপনি ইচ্ছাপ্রকাশ করামাত্র বর্ষণ শুরু হল।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'বরুণদেব তাঁর কর্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন ঈশ্বরের আদেশে। কিন্তু সেই কন্যা কোথায়? সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল কেন তা এখন পূর্ণ করছে না?'

মহারাজ লোমপাদ বললেন, 'হে ঋষিপুত্র! আপনি অনুগ্রহ করে আমার গৃহে পদধূলি দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। আমার কন্যা শান্তাকে যদি আপনার মনঃপূত হয়, তবে তাকে গ্রহণ করলে অঙ্গদেশ খুশি হবে।'

নবীন সন্ন্যাসী প্রতিবাদ করল, 'আমি তাঁকে গ্রহণ করে কি করব? তিনি কি ফুল অথবা ফল? আমি শুধু তাঁকে দর্শন করেই চলে যাব।'

মহারাজ লোমপাদ অসহায় চোখে প্রবীণার দিকে তাকালেন। প্রবীণা তাঁকে ইশারায় শান্ত হতে বলল। মহারাজ বললেন, 'আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনই হবে। এবার আসতে আজ্ঞা হোক।'

নবীন সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। মহারাজ জীবনে প্রথমবার কাউকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সবার পেছনে প্রবীণা বারঘোষা। মধ্যরাত্রি এখন যদিও অতিক্রান্ত তবু রাজপ্রাসাদের ভেতর মশাল জ্বলছে পূর্ণতেজে। প্রাসাদের গঠন, আলো এবং শ্বেতপাথরে পা ফেলে নবীন সন্ন্যাসী চমকিত হচ্ছিল। এই সময় তার ওপরে পুষ্পবৃষ্টি হল। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরীরা সুগন্ধী ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার সামনে। ঋষিপুত্র জিজ্ঞাসা করল, 'এদের মধ্যেই কি তিনি রয়েছেন?' প্রবীণা দ্রুত পাশে এসে দাঁড়াল, 'না, তাপস। এরা রাজকুমারীর সখীর দল। চাঁদের চারপাশে যেমন তারারা থাকে।'

বিশেষভাবে যত্নে সাজানো একটি দ্বিতলকক্ষে মহারাজ নবীন সন্ন্যাসীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষের বিলাসসামগ্রী দেখে সে বাকরহিত হয়ে গেল। সে একবার ফুলসজ্জায় হাত দেয়, একবার অন্য আসবাবে। শিশুর মত তাকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে মহারাজার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই ঋষিপুত্রকে অনুরোধ করেন তিনি এমন কাজ করে যান যাতে এরাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি না হয়, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস না পায়। কিন্তু অনেক চেষ্টায় তিনি সংবরণ করলেন নিজেকে। যে রাজ্য খরায় চৌচির হচ্ছিল, বিদ্রোহ যখন অনিবার্য ছিল, মহামন্ত্রীকে বিদ্রোহীরা আটক করার পর যখন তাঁর স্বরূপ জানা গেল তখন দিশেহারা তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছেন নবীন সন্ন্যাসী। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আর বিরক্ত করা অনুচিত হবে বলে মনে হল মহারাজার।

প্রবীণা বলল, 'হে তাপস, আপনি বিশ্রাম করুন। তিনি এখনই আসছেন। আমরা চলি।' ঋষিপুত্র বলল, 'এই অপূর্ব কক্ষ ত্যাগ করবে কেন তোমরা?'

প্রবীণা হাসল, 'আপনার অন্যান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে তো।'

কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রবীণা বলল, 'মহারাজ, যত তাড়িতাড়ি সম্ভব রাজকুমারী শান্তাকে নিয়ে আসুন এখানে। এই ঋষিপুত্রের ধৈর্য বড় কম।'

মহারাজ এতক্ষণে একটু অস্বস্তি প্রকাশ করলেন, 'ওই বয়সের একটি তরুণের সঙ্গে একা শান্তাকে থাকতে দেব ? যদি ঋষিপুত্র বিবাহ না করেন তাহলে শান্তাকে পাত্রস্থ করা— ।'

'আপনি অমূলক ভাবছেন। নরনারীর শারীরিক সম্পর্কের কথা ইনি জানেন না। কিন্তু যেহেতু ইনি পুরুষ তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মহারাজ, নিজের যৌবনের কথা স্মরণ করুন। ধমনীতে যদি জোয়ার আসে তাহলে পুরুষের অজেয় কিছুই থাকে না।' প্রবীণা হাসল।

মহারাজ বললেন, 'বেশ যাও। ঋষিপুত্রের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি এই রাজ্যকে রক্ষা করেছেন। অতএব— ! তুমি রাজকুমারীকে নিয়ে এস।'

কক্ষের ভেতরে তখন অন্য দৃশ্য। নবীন সন্ন্যাসী নিজেকে দেখছিল। জীবনে প্রথমবার সে মুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অবলোকন করছিল। এটা যে মুকুর, অন্য কোন মানুষ তার সামনে নেই তা বুঝতে তার কিঞ্চিৎ সময় লেগেছিল। নবীন সন্ন্যাসী মুগ্ধ হয়ে নিজের ললাট, চোখ অধর এবং বুকে হাত বোলাল। এই সে। এই তার রূপ। নদীতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাতে নিজেকে এমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। জগৎসংসার বিস্মরিত নবীন সন্ন্যাসী তার শৃঙ্গে হাত দিল। কি কুৎসিত। এই ক্ষুদ্র বস্তুটিকে সে এতকাল বহন করেছে। কিন্তু শৃঙ্গটির গায়ে এত দাগ কেন ? চৌচির হয়ে যাওয়ার আগে পক্ক শ্রীফলের গাত্রত্বক এই অবস্থায় আসে। সে প্রাণপণে শৃঙ্গটি টানতে লাগল। কিন্তু চেষ্টা বৃথা হল। জীবনে প্রথমবার তার হৃদয়ে আক্ষেপ এল। পিতৃদেব, অঙ্গদেশের সমস্ত মানুষের ললাট কি মসৃণ, তাহলে ঈশ্বর তাকে এই কুৎসিত বস্তুটি কেন বহন করতে বাধ্য করছেন। সে বিস্মৃত হল, আগে চিন্তান্বিত হলে শৃঙ্গের গায়ে হাত বোলালে চিত্ত শান্ত হত। মুকুরে নিজেকে দর্শনের পর শৃঙ্গের সেই ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়েছে।

প্রাসাদের অন্য একটি কক্ষে তখন প্রবীণা বলছিল, 'রাজকুমারী, মহারাজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন কি কারণে তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝেছেন। সেই অনুপম রূপলাবণ্য, অসাধারণ ইন্দ্রিয় সংযম, অলোকসামান্য বলবীর্য, মহতী তেজস্বিতা, বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়নে কৃতবিদ্য, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষের সমস্ত গুণের অধিকারী অপাপবিদ্ধ আপনার দর্শনের আশায় রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়েছেন। হে নিবিড়নিতম্বিনী ! যাতে তিনি আপনার চরণলাভ করতে পারেন তার উপায় বিধান করা কর্তব্য।'

রাজকুমারী শান্তা বলল, 'তুমি যা যা বললে তা ঠিক। কিন্তু আমি সখীদের মুখে শুনেছি তিনি ভালবাসায় অজ্ঞ। এমন মানুষের সঙ্গ আমি কি করে করব ?'

প্রবীণা হাসল, 'মন্মথের শর যার ভ্রূভঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় তিনি একথা বলছেন। যে মানুষ রুক্ষ খরাকবলিত রাজ্যে এক মুহূর্তে বর্ষণ আনতে পারেন তার কুমার-হৃদয়ে আপনি যদি ভালবাসা সঞ্চারিত না করতে পারেন তাহলে এই রূপলাবণ্য বৃথা।'

শান্তা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি শুনেছি তোমার কন্যার সঙ্গে ওঁর

সম্পর্ক হয়েছে।' প্রবীণা হাসল, 'ভ্রাতা এবং ভগিনীর সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। নারী চিরকাল প্রেমিককে জয় করে তার মাতৃপ্রেম কিংবা ভগিনীপ্রেম ম্লান করে। এক্ষেত্রে যদি সেরকম সন্দেহ আসেও তবে তোমার ক্ষমতা প্রকাশ করাই কি কর্তব্য নয়।'

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে প্রবীণা সঙ্গীদের সাহায্যে সুগন্ধ, পুষ্পমাল্যে রাজকুমারীকে সজ্জিত করল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি স্বল্প বসনে অঙ্গ আবৃত করলে রাজকুমারী লজ্জিত হয়ে উঠলে প্রবীণা তাকে বলল, 'জন্মমাত্র মানুষের লজ্জিত হওয়া সম্ভব নয় কারণ তার জ্ঞানের জন্ম হয়নি। প্রেমিক প্রেমিকা কিংবা স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের কাছে নির্লজ্জ না হয় তাহলে ভালবাসা রক্তশূন্য হয়। মৃত্যুর পরে লজ্জিত হওয়া অসম্ভব কারণ তখন বোধ অন্তর্হিত হয়।'

তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী নিজের কক্ষ থেকে একা বের হয়ে মন্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হয়ে নবীন সন্ন্যাসীর কক্ষাভিমুখে যাত্রা করল। তাকে দেখলে সুধাকর-সন্দর্শনে শশধরও লজ্জিত হতেন। সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীর পীনোন্নত পয়োধরযুগল প্রতি পদক্ষেপে কম্পিত হচ্ছিল। মেঘবর্ণ অতিসূক্ষ্ম বসন পরায় অভ্রাবৃত কৃশ চন্দ্রলেখার মত সে বিরাজিত হচ্ছিল। কক্ষদ্বারে উপস্থিত হয়ে সে একমুহূর্ত স্থির হল। এইবার তাকে নবীন সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়াতে হবে। তার হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। সে পেছন ফিরে তাকাতে দেখল সখীদের সঙ্গে দূরে দাঁড়িয়ে প্রবীণা তাকে সাহসী হতে ইঙ্গিত করছে। দ্বারাবরণ সরিয়ে সে নম্রচরণে কক্ষে প্রবেশ করল।

এবং তখনই সে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করল। অনিন্দ্যসুন্দর নবীন সন্ন্যাসী মুকুরের ওপর নিজের শরীব রেখে নীরবে কেঁদে চলেছেন। তাঁর অশ্রুধারায় মুকুর ইতিমধ্যেই প্লাবিত। সে যে এই কক্ষে প্রবেশ করেছে তাতেও কোন চৈতন্য আসেনি। বিশাল মুকুরে যেন দুটি শরীর প্রায় এক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শান্তা কি করবে বুঝতে পারছিল না। কয়েক পা এগিয়ে সে চিত্রার্পিতের মত নবীন সন্ন্যাসীর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দন স্তব্ধ হলে নবীন সন্ন্যাসী আবার মুকুরের দিকে তাকাল। অশ্রুসিক্ত হওয়ায় মুকুরে নিজেকে দেখতে না পেয়ে সে কিঞ্চিত অধৈর্য হয়ে ডান হাতে মুকুর পরিষ্কার করতেই যেন হৃদয়ের শব্দ বহু গুণ বর্ধিত হল! এ কে? একি মায়া না প্রহেলিকা? একি যক্ষী, অপ্সরা, দেবী না মানবী? সে অন্ধের মত মুকুরে মুখ স্পর্শ করতে চাইল। এই দৃশ্য দেখে রাজকুমারী শান্তা হেসে ফেলতেই ক্ষীণ শব্দ উচ্চারিত হল। নবীন সন্ন্যাসী চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃদুস্বরে শান্তা বলল, 'হে নবীন সন্ন্যাসী, অনিমেষ লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। আমি সামান্যা নারী।' সে উচ্চারণ করল, 'অহো! কি সুন্দর!'

নিজের রূপের সুখ্যাতি শান্তা অনেক বার শুনেছে কিন্তু মনে হল এমন অকপটভাবে কেউ কখনও বলেনি। তার শরীরে কদম্ব ফুটল। জঘন শক্তিহীন হল। নবীন সন্ন্যাসী ততক্ষণে তার সামনে এসে যেমন ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ আগে আত্মদর্শন করছিল তেমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

নিজের শরীরের রক্ত জীবনে প্রথমবার অনুভব করল শান্তা। কোনরকমে

উত্তর দিল, 'পিতার আদেশে আপনার শুশ্রূষা করার জন্যে এখানে এসেছি। হে মনুজশ্রেষ্ঠ, আমাকে সবাই শান্তা বলে ডাকে।'

'শা-ন্তা!' নবীন সন্ন্যাসীর বিস্ময় যেন শেষ হচ্ছিল না।

শান্তা যখন সঙ্কোচের শেষ সীমায় তখনই তার বোধ হল ওই দৃষ্টিতে কোন মালিন্য নেই, কামনার আগুন নেই.। শুধুই বিস্ময়, শুধুই মুগ্ধতা। এই উজ্জ্বলদেহী পুরুষ যাকে দেখামাত্র সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে নিজের অজান্তে অনঙ্গের শরে বিদ্ধ হয়ে তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সে কিছুটা চেষ্টার পর নিজেকে অতিক্রম করল। 'কি দেখছেন অমন করে?'

'তোমাকে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।'

শান্তা ধীরে ধীরে পুষ্পসজ্জায় আলস্যভরে বসল। তার মুখে রহস্যময় হাসি মাখানো ছিল। নবীন সন্ন্যাসী দ্রুত চলে এল তার সামনে, 'সে ঠিকই বলেছে। তুমিই পরমাসুন্দরী।'

'কে বলেছে?' শান্তার চোখে বিস্ময় ফুটল।

'যে পিতৃদেবের আশ্রমে গিয়ে আমাকে জ্ঞানচক্ষু দান করেছে।'

'ও, বেশঘোষা। ছিঃ।'

'ছিঃ কেন? তুমি তাকে হেয় করছ কেন?'

'আমাকে দর্শনের সময় যদি কোন পুরুষের চোখে অন্য নারীর ছায়া থাকে তাহলে আমার জীবনধারণ বৃথা ব'লে মনে করি। সেই বারবিলাসিনী কি আপনাকে মুগ্ধ করেছে?'

'মুগ্ধ? হ্যাঁ। কিন্তু সে—।'

নবীন সন্ন্যাসীর কথা শেষ না হওয়া মাত্র শান্তা উঠে দাঁড়াল, 'হে সন্ন্যাসী, আপনি তার সঙ্গ লাভ করুন। আমাকে আপনার প্রয়োজন নেই।'

সে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না। কোথায় যাচ্ছ তুমি? তোমাকে দর্শনের জন্যে আমি পিতাকে না জানিয়ে এতদূরে ছুটে এসেছি।'

'কিন্তু। বেশ, আমার মুখের দিকে তাকান। এই মুহূর্তে কি তার কথা মনে পড়ছে?'

নবীন সন্ন্যাসী শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশঘোষাকে স্মরণ করতে চাইল। কিন্তু হায়, পদ্মের পাশে সামান্য বনফুলকে অবিকল স্মরণ করা অসম্ভব। সে ধীরে ধীবে মাথা নাড়ল, না। শান্তা হাসল, 'পুরুষেরা রমণীর হৃদয়রঞ্জনের জন্যে অনর্গল মিথ্যাভাষণ করে থাকে। আপনি নিশ্চয়ই সেই রকম আচরণ কবছেন না।'

'মিথ্যা? মিথ্যা কি আমি জানি না।'

'যা সত্য নয় তাই মিথ্যা। যা আমি নই তাই মিথ্যা।' সগর্বে বলল শান্তা।

'যা তুমি নও তাই মিথ্যা?'

'হ্যাঁ। কারণ এখন থেকে আমিই তোমার সমস্ত সত্তা জুড়ে থাকব।' শান্তার কথা শেষ হওয়ামাত্র সে তার ললাটে হাত রাখল অন্যমনস্কভাবে। সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গের স্পর্শ পেল সে। তার মনে হল ফাটলধরা শৃঙ্গের একাংশ শিথিল হয়ে আসছে। সে শঙ্কিত হল। এবং সেই শঙ্কা অতিক্রম করতে প্রশ্ন করল, 'আমার এই শৃঙ্গ তোমার অসহ্য মনে হচ্ছে না?'

শান্তা হাসল, 'না। তাই তুমি অসাধারণ। ওই শৃঙ্গের কারণেই তুমি সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। সতৃষ্ণ নয়নে নবীন সন্ন্যাসী সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দর্শন করল। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি তৃপ্ত! এবার অরণ্যে ফিরে যেতে হবে।'

'তৃপ্ত? কিসে তুমি তৃপ্ত?' প্রবল বিস্ময় যেন ছিটকে উঠল শান্তার কণ্ঠে।

'তোমাকে দর্শন করে।'

'কি দেখেছ তুমি আমার? কি পেয়েছ তুমি আমার থেকে?' শান্তা বিচলিত।

'কেন? এই রূপমাধুরী যা ঈশ্বরের সৃষ্টি।'

'তৃতীয়ার চাঁদ দেখে তুমি তৃপ্ত? হায়, পূর্ণচাঁদের মহিমাই জানলে না!'

'সে কিরকম?' বিভ্রান্ত হল সে।

'শিশু যেমন একদিনে দৌড়াতে শেখে না, ধীরে ধীরে তার অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা তাকে সক্ষম করে তোলে তেমনি রমণীর রহস্য জানতে তোমার ধৈর্য ধরা প্রয়োজন সন্ন্যাসী। পৃথিবীর সব সাধনার সেরা হল রমণীর হৃদয়জয়ের সাধনা।'

শান্তার প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনল সে। তারপর বলল, 'হে ভাবিনী, তুমি যে সাধনার কথা বলছ তার কিছুই জানি না আমি। আমি ঈশ্বর সাধনায় নিবেদিত। নারীর হৃদয়সাধনায় আমার কি প্রয়োজন?'

শান্তা বলল, 'আপনি এত জ্ঞানী আর এই সামান্য সত্যটি জানেন না? যে পুরুষ একটি নারীর হৃদয় জয় করতে পারে না সে কি করে ঈশ্বরকে লাভ করবে? আপনার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হবে যদি একটি নারীকে না জানতে পারেন।'

কথাগুলো নিজের কানেই বেসুরো শোনাল শান্তার। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আর কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না যা বলে এই অজ্ঞ সন্ন্যাসীকে ধরে রাখা যায়। এক মুহূর্ত চিন্তা করে নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'কিন্তু পিতৃদেবের মতে নারী সর্বনাশের মূল।'

'তাই?' শান্তা মোহিনী মায়া ছড়াল হাসিতে, 'আপনি পিতৃদেবকে নিয়েই থাকুন তাহলে।'

'বেশ। তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। পিতৃদেব বলেছেন—।'

'ক্ষমা করুন। আপনার পিতৃদেবের কথা এখন থাক। আপনিই বলুন সন্ন্যাস মানে কি?'

'সংসারবাসনা ত্যাগ করে চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম গ্রহণ করাই সন্ন্যাস।'

'কিন্তু আমি যদি বলি যার সহসা সংজ্ঞালোপ পায় এবং দেহ জড়ীভূত হয় সেই হল সন্ন্যাসী তাহলে আপনার আপত্তি আছে?'

'কিভাবে সেটা সম্ভব?'

শান্তা হাসল, 'আমি আপনাকে সেই পথের সন্ধান দিতে পারি।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'তোমার কথায় আমার চিত্তে কেবলই কৌতূহল জন্মাচ্ছে। বেশ, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সন্ন্যাসে আমি নবীন।'

'কৃতার্থ হলাম। তাহলে আরও একটা দিন অপেক্ষা করুন।'

'আরও একটা দিন ? অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব ? আমি আপনাকে বলেছি ধৈর্য গ্রহণ করতে।'

নবীন সন্ন্যাসী এবার হাসল, 'তুমি আমাক একবার তুমি আবার পরেই আপনি সম্বোধন করছ।'

'খুব স্বাভাবিক যে মুহূর্তে আপনাকে আপনজন মনে হচ্ছে আমার জিহ্বায় তুমি এসে যাচ্ছে।'

'আপনজন!' সে মাথা নাড়ল, 'হায়। এই শব্দটি আগে কেউ বলেনি আমায়। কি মধুর ব্যঞ্জনা একটি শব্দে। শোন, আমি তোমার আপনজন হতে চাই।'

'আমিও। তবে আজকের মত যেতে অনুমতি দাও। রাত শেষ হয়ে এল। তোমার কৃতিত্বে এখনও বর্ষণ চলছে। এবার তুমি বিশ্রাম নাও।' শান্তা দ্বারের দিকে পা বাড়াল।

কাতর স্বরে সে উচ্চারণ করল, 'না, তুমি যেও না।'

শান্তা বলল, 'মুকুল থেকে সুপক্ক ফলে রূপান্তরিত হতে সময় প্রয়োজন সন্ন্যাসী।'

মহারাজ লোমপাদ সন্তুষ্ট। তাঁর চিত্তে আর কোন শঙ্কা নেই। আকাশের দিকে তাকাতেই বোঝা যায় বর্ষণের সাময়িক যতি হয়েছে মাত্র, অঙ্গদেশে মেঘের অভাব ঘটবে না অচিরে। কৃষকেরা মাঠে নেমে পড়েছে। রাজ্যের সর্বত্র খুশির প্রকাশ। মহারাজ জেনেছেন গত রাত্রে রাজকুমারী ঋষিপুত্রের সঙ্গে কেবল বাক্যবিনিময় করেছেন মাত্র। সেই নবীন সন্ন্যাসী কোনভাবেই রাজকুমারীকে অপমান করেনি। ব্যাপারটি তাঁর সম্যক বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি যখন এও জানলেন শুধু দর্শনে তৃপ্ত হয়ে ঋষিপুত্র অরণ্যে ফিরে যেতে চাইছিলেন তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বনবাসী নিঃসম্বল শৃঙ্গধারী একজন সংসারানভিজ্ঞ তরুণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে কোন পিতার হৃদয় সম্মত হয় না। কিন্তু যে মানুষ অঙ্গদেশকে নবজন্ম দান করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে মহাপাপ হবে। বিশেষ করে প্রবীণা বারঘোষার কাছে তিনি তো সেরকমই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এখন নগরীর সবাই জানে ওই ঋষিপুত্র রাজকুমারী শান্তার কারণেই এখানে এসেছে। তার সঙ্গে একই কক্ষে কালাতিক্রম করেছে এ সংবাদও প্রচারিত হবে। সেক্ষেত্রে শান্তার চরিত্র নিয়ে কুকথা প্রচারিত হতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু কি উপায়ে তিনি ঋণ এবং দুর্নামমুক্ত হবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। ঋষিপুত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ তবে তার ক্রোধ কতখানি তাঁর প্রমাণ পাননি। তিনি দেখলেন রাজকুমারী শান্তা তাঁর কাছে আসছেন।

কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হৃদয় প্রসন্ন হল। নববর্ষণের পর বাইরের প্রকৃতির যে প্রফুল্ল চেহারা হয়েছে শান্তাকে সেইরকম দেখাচ্ছে। যেন ঈষৎ চপলতা তার চলনে। সামনে এসে শান্তা বলল, 'পিতা। আমি স্থির করেছি আপনার মনোনীত পাত্রই আমার একান্ত কাম্য।'

লোমপাদ বললেন, 'তোমার এই সিদ্ধান্তের কারণ ?'

সামান্য লজ্জা প্রকাশ করে শান্তা উত্তর দিল, 'অনাঘ্রাত পুষ্প তো সবারই আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়। এই প্রথম আমি একজন পুরুষকে দেখলাম যার চোখে কেবল আমারই ছায়া। কিন্তু পিতা আপনার কাছে আমার দুটি প্রার্থনা আছে।'

'কি প্রার্থনা বল! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নেই।'

'প্রথমত, ওই প্রবীণা বারঘোষার কন্যা যে অরণ্যে গিয়েছিল মোহিনী মায়া বিস্তার করতে তাকে এখনই নির্বাসনে পাঠান।' শান্তার অধব কম্পিত হল।

'সে কি? কেন?' মহারাজ উদ্বিগ্ন হলেন।

'সেই কুহকী যে কোন মুহূর্তেই আমার প্রার্থিত ধন অপহরণ করতে পারে।'

'একি বলছ জননী। তোমার সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। তুমি পরমাসুন্দরী রাজকুমারী, সে সামান্যা বারাঙ্গনা মাত্র। প্রতি নিশীথে নতুন পুরুষের হৃদয়রঞ্জন করাই তার কাজ। তারা মনেও রাখতে পারে না আগের রজনীতে কাকে সঙ্গ দিয়েছিল। তাছাড়া ঋষিপুত্রের সঙ্গে তার কোন শারীরিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়নি।'

'এসবই সত্য পিতা। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য আছে।'

'কি সেই সত্য?'

জন্মমাত্র শিশু যার স্পর্শ পায়, বোধের প্রথম উন্মোচনে যার মুখ দ্যাখে তার টান তার ভেতরে আমৃত্যু থেকে যায়। সুন্দর অসুন্দর বিচার কিংবা তুলনা করার প্রবণতা আসে না। আমি সেই বেশঘোষা সম্পর্কে ভীত হচ্ছি।'

'কিন্তু কন্যা, ওদের দুজনের কাছে আমি এবং অঙ্গদেশ কৃতজ্ঞ। গতকাল আমি নানান রত্নস্বর্ণালঙ্কার সেই যুবতীব কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান কবেছে। বলেছে সে যা করেছে তা অঙ্গদেশের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য মনে করে করেছে। এই অবস্থায় আমি কিভাবে তাকে নির্বাসনে পাঠাই?'

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। সন্তানের সুখের জন্যে কি আপনি একটু কঠোর হতে পারেন না? কোন ছলের আশ্রয় নিতে আপত্তি করবেন? আমি আজ শুনেছি সেই বারাঙ্গনা নাকি তার বৃত্তি ত্যাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। গতরাতে সে কোন পুরুষকে প্রশ্রয় দেয়নি। এমন কি তার মাতার আদেশ অমান্য করেছে। এসব কার জন্যে? নদী যখন গতি পবিবর্তন করে তখন দুর্ঘটনা অনিবার্য হয়।'

'এসব তো আমি জানতাম না।' মহারাজ বললেন, 'বেশ, দেখি কি করা সম্ভব। এব্যর তুমি দ্বিতীয় প্রার্থনাটি ব্যক্ত কর কন্যা।'

শান্তা লজ্জিত হল। তার মুখ বুকের ওপর নেমে এল, 'আজ রাত্রেই তিনি আমাকে বিবাহ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আপনি কোন মতে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক?'

'সেইটেই তো সমস্যা। এই ঋষিপুত্র দেবতাদের মানেন না। প্রচলিত ধর্মবিধিতে বিবাহ করতে তিনি রাজি হবেন বলে মনে হয় না।'

'আমরা যদি গান্ধর্বমতে বিবাহ করি তাহলে আপনার আপত্তি হবে?'

'না। কিন্তু তুমি নিজে মানসিক ভাবে প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ পিতা, আমি প্রস্তুত।'

সারাটা দিন সে একা। এই একাকিত্ব যেন আরও বোঝা চাপিয়েছে তার মনে। অথচ অরণ্যে যখন সে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াত তখন এইরকম অনুভূতি হত না। সারা দিন যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়েছে সে। তাব ব্যগ্রতার উপশম ঘটাতে দাসীরা বারংবার বলে গেছে রাজকুমারী বিশ্রাম নিচ্ছেন। সূর্যাস্তের পর চন্দ্রদেব উদিত হলে তিনি ঋষিপুত্রকে দর্শন দেবেন। কিন্তু দিন যেখানে মেঘলা সেখানে চন্দ্রদেব কিভাবে উদিত হবেন? গতরাত্রে যখন অঙ্গদেশে সে পা রেখেছিল তখন কি আকাশে চন্দ্র ছিল? সেই পরমাসুন্দরী তাকে বলেছে ধৈর্য রাখতে। কিন্তু সমস্ত চেতনায় যাব কণ্টকজ্বালা, সমস্ত শরীরে যার অস্থিরতা সে আর কিভাবে অপেক্ষা করবে? নিদ্রা আসছে না, ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ লোপ পেয়েছে। প্রতিটি মুহূর্ত সে অতিক্রম করছে একটি আশায় কখন সন্ধ্যা আসবে। আজ তার নবীন সন্ন্যাস গ্রহণের তিথি।

আজন্ম অবণ্যে পালিত সে বিস্মিত হচ্ছে না নাগরিক সভ্যতা দেখে। কারণ তার সেই বোধ অসাড়। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দাসীরা তাকে পরিবেশন করেছিল, সেগুলো অস্পৃশ্য রয়ে গিয়েছে। তার জগৎময় এখন সেই রূপবতীর মুখ যে তাকে বলেছে সন্ন্যাসী কববে। কিসের সাধনা তা তাব জানা নেই। কিন্তু তীব্র আকর্ষণে সে জর্জরিত। হঠাৎ তার মনে হল এ কোন খেলা নয় তো! পিতৃদেব বলেছেন এইবকম কুহেলিকায় ভুলিয়ে বুদ্ধিভ্রংশ করে সাধনাপথ থেকে সরিয়ে আনাই একদল রাক্ষসের কর্ম। এও তাই নয় তো? তার মস্তিষ্কে উত্তাপ এল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার স্মরণে এল বেশঘোষার মুখ। সেই নারী বলেছিল যেন কোন অবস্থায় ক্রুদ্ধ না হয়। কিন্তু বেশঘোষা কেন তাকে একটি রাক্ষসের আলয়ে রেখে যাবে? হঠাৎ তার বেশঘোষাকে দর্শনেব ইচ্ছা হল। সে স্থির করল আজ সন্ধ্যায় রাজকুমারীকে জানাবে তার অভিলাষের কথা। এই সব নানান চিন্তায় দীর্ণ হয়ে সে একসময় শৃঙ্গে হাত দিতেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তার শৃঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। একটি খণ্ড উঠে এসেছে তার হাতে। সেই বস্তুটিকে সে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। অত্যন্ত কদাকার মনে হচ্ছিল তার। সে দ্রুত ছুটে গেল মুকুরের সামনে। ললাটের মাঝখানে ভঙ্গ শৃঙ্গটি খাড়া হয়ে আছে। আর সেই মসৃণতা নেই। বরং তার তীক্ষ্ণতা বেড়ে গেছে। সে বুঝতে পারছিল না কেন এমন হল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল শৃঙ্গের অন্য খণ্ডটি যদি উঠে আসে, যদি তার ললাট সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর অন্য মানুষের মতই সে স্বাভাবিক হবে। সন্ধ্যার অন্ধকার শেষ পর্যন্ত নেমে এল পৃথিবীর পথে। আজও দাসীরা নবীন ফুলে শয্যা নির্মাণ করেছে। সুগন্ধী ছড়ানো হয়েছে সর্বত্র। নির্মল বাতাসে আর্দ্র আরাম। সে উতলা হচ্ছিল। এই সময় নূপুরের শব্দ কানে এল। সে চকিতে মুখ ফেরাতেই স্তব্ধ হয়ে গেল। রাত্রির নীল আকাশের রক্ত দিয়ে রাঙানো একটি বস্ত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করে সেই পরমাসুন্দরী তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে তীব্র আকুতিতে বলল, 'তুমি এসেছ! আমি আর কত ধৈর্য ধারণ করব? এস, কাছে এস, তোমায় দেখি।'

শান্তা দ্বার অতিক্রম করে কক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই যেন অবহেলায় সেই আবরণ খসে পড়ল। নবীন সন্ন্যাসীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যেন সমুদ্র থেকে দেবী বেরিয়ে আসছেন। সে কিছু বলার আগেই কাঁচুলি এবং আজানু

স্বচ্ছবসনাবৃত শান্তা বলে উঠল, 'এই হলাম আমি। এই প্রথম আমি কোন পুরুষের সামনে প্রকাশিত হলাম।'

নবীন সন্ন্যাসী দেখছিল তার সামনে ঈষৎ ঢলে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমারী। তার সুবর্ণের মত গাত্রত্বকে আলো পড়ে পিছলে যাচ্ছে। দুচোখে যেন দীঘির ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে কৌতুক হয়ে। কণ্ঠে এখন ফুলমালা জড়ানো। বক্ষের দমবন্ধ করা ঢেউ কাঁচুলিকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু এই সৃষ্টির কোথাও বিস্ময় থেমে থাকেনি, তা ছড়িয়ে গেছে সর্বাঙ্গে। আর সেই ছড়িয়ে যাওয়া বিস্ময় পূর্ণতায় পৌঁছে মুহূর্তে দর্শকের হৃদয় প্লাবিত করে দেয়, তার শক্তি হরণ করে। সে কোনমতে বলল, 'আমি ধন্য।'

দুহাত ডানার মত প্রলম্বিত করল শান্তা, 'নারী-জীবনের সবচেয়ে মহত্তী মুহূর্ত এখন আমার। স্রষ্টা আমাকে এই মুহূর্তটির জন্যে তিল তিল করে রচনা করেছেন। আমি এসব থাকা সত্ত্বেও অপূর্ণ। এসো, তুমি আমাকে পূর্ণ করো।'

'আমি ? কিভাবে ?' সে বিস্মিত।

'কিভাবে।' ঝরনার মত উচ্ছলিত হল শান্তা। তারপর স্বগত উচ্চারণ করল, 'আমি জানি না নির্লজ্জ হচ্ছি কিনা। কিন্তু শিক্ষায় লজ্জিত হবার কিছু নেই।' শান্তা দুচোখ বন্ধ করে বলল, 'আমায় গ্রহণ করো।'

'গ্রহণ ? কিভাবে ?'

চোখ খুলল রাজকুমারী। অজান্তেই অধর দংশন করল সে। তারপর দুই হাত সক্রিয় করল। তার কাঁচুলির বন্ধন খুলে গেল। যেন সমুদ্রমন্থিত করে অমৃতকুম্ভের উদয় হল। নবীন সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীরের তাপমাত্রা তার দর্শনে বহুগুণ বর্ধিত হল। এবং এই প্রথম তার স্পর্শাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত। যেভাবে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখলে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ নিতে ইচ্ছে করে সেইভাবে ওই বর্তুলাকৃতি অথচ তীক্ষ্ণ দুটি মাংসপিণ্ড তাকে আকর্ষণ করছিল। শান্তা সেই চঞ্চলতা দর্শনে পুলকিত হয়ে বলল, 'তুমি চতুর্দশীতে পৌঁছেছ এবার।'

'পূর্ণিমা ? পূর্ণিমায় নয় কেন ?'

'আমাদের মানবসমাজের সাধনার শেষ অঙ্গ, পুরুষেরাই এই নীবিবন্ধ মুক্ত করে পূর্ণিমায় পৌঁছে যায়। এবার তোমাকে সক্রিয় হতে হবে সন্ন্যাসী।'

নবীন সন্ন্যাসী মোহগ্রস্ত হয়ে এগিয়ে এল। কম্পিত আঙুলে নীবিবন্ধ মুক্ত করতেই সে যেন পূর্ণিমার দর্শন পেল। লতার মত শান্তা তাকে জড়িয়ে ধরতেই নবীন সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীরে স্বেদ নির্গত হল। শান্তার শরীরের স্পর্শ বিদ্যুতের মত তার শরীরকে প্রভাবিত করল। এবং তখনই তার পিতৃদেবের শীর্ণমুখ মনে পড়ল। পিতৃদেব যেন বলছেন, ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করলে স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হলে নরকলাভ হয়ে থাকে। তার মনে এই সব ভাবনা আসতেই শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে কোনমতে আলিঙ্গনাবস্থায় উচ্চারণ করল, 'তুমি আমাকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছ ? স্বর্গ না নরক ?'

শান্তা চমকে উঠল। তার নিজের শরীরে তখন অজস্র কদম্ব। সে প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কি হল সন্ন্যাসী ? এই সময় একথা কেন ?'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

শান্তা অনেক কষ্টে নিজেকে সুস্থ করল, 'হে সন্ন্যাসী, তোমাকে আমি আর কি

বলব ? তুমি সব জানো কিন্তু জীবনের সত্যটি জানো না। ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমার জন্যে। আমাকে পূর্ণ না করলে তোমার জীবন বৃথা। তোমার কি সহসা চৈতন্যলোপ এবং দেহে জড়তা এসেছে ? তাহলে তুমি সাধনায় সিদ্ধ হবে কি করে ? পুরুষের শরীর হল রথ, আত্মা নিয়ন্ত্রণ এবং ইন্দ্রিয়গুলো হল তার অশ্ব। যে ধীর পুরুষ, আত্মনিষ্ঠ, সে অশ্বটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে একমুখী করে। আজ থেকে অন্য নারী নয়, একমাত্র আমিই তোমার লক্ষ্য। আমাকে সুখী করলেই তুমি সুখী হবে। সেই সুখ তোমাকে স্বর্গে পৌঁছে দেবে। আর দ্বিধা করো না। এসো, আমরা পরস্পরের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটাই।'

শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেল নবীন সন্ন্যাসীর। প্রথমে সে স্থির করতে পারছিল না কোথায় রয়েছে। সে শয্যায় উঠে বসতেই অজস্র ফুলের মধ্যে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দেখতে পেল। সে কক্ষের চারপাশে তাকাল। এই নিখিলভুবনে যেন আর কেউ জাগ্রত নেই। সমস্ত শরীরে যেন এখনও সুখানুভূতি। এবং মিলনের মুহূর্তে তার সমস্ত চৈতন্যলোপ পেয়েছিল, শরীর জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। একেই কি সন্ন্যাস বলে, কিন্তু তারপর থেকেই মনে হচ্ছে এই নারী আমার। সে নিজের গলার মালায় হাত বোলালো। মিলনের আগে রাজকুমারী তাকে মালা পরিয়েছে, সে তা বিনিময় করেছে। রাজকুমারী বলেছে চতুরাশ্রম না জানলে ঈশ্বর জানা যায় না। প্রথম থেকেই যদি শেষ আশ্রমে মানুষ আবদ্ধ থাকে তাহলে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়। কথাটা ঠিক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এখন তার পাশে। সে তার রক্ষক। রাজকুমারী বলেছে, স্বামী। শান্তার দিকে তাকিয়ে তার বুক ভরে উঠল।

এই নারী তাকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত করেছে। দুটি শরীর মন্থিত আনন্দ মিশ্রিত হলে যে জ্ঞানসৃষ্টি হয় তার স্বাদ গ্রহণ করা ওর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। সেই মুহূর্তের পর মনে হয়েছিল সমস্ত শরীর নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু তারপর রাজকুমারী নানাবিধ সরস সংলাপের পর দাসীদের খাদ্যদ্রব্য আনতে নির্দেশ দিয়েছিল। রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করার পর থেকেই তার ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পেয়েছিল। কিন্তু তখন সেই স্বর্গীয় পরিবেশে রাজকুমারী যখন নিজের হাতে তাকে পৃথিবীর সেরা স্বাদের খাবার পরিবেশন করছিল তখন তার মনে হয়েছিল এমন প্রসন্ন মুহূর্ত তার জীবনে কখনও আসেনি। তার পরিচিত কোন ফলমূল নয়, বিভিন্ন স্বাদের পরিপক্ক খাদ্য সামনে তুলে ধরছিল রাজকুমারী। শক্ত হাড়যুক্ত নরম মাংসের স্বাদ সে প্রথম গ্রহণ করতেই শরীরে তৈলাক্ত অনুভূতি হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি খাদ্য ?'

রাজকুমারী হেসে বলেছিল, 'শক্তিবর্ধনকারী এই খাদ্য গ্রহণ করলে পুরুষ তেজোদ্দীপ্ত হয়। মৎস্য এবং মাংস পুরুষের শরীরের অভাব পূরণ করে। তোমার কি খেতে খারাপ লাগছে ?'

সে বলল. 'বড়ই সুস্বাদু কিন্তু মনে কেমন অস্বস্তি আসছে।'

'অনভ্যাসই এর কারণ। অভ্যস্ত হয়ে গেলে', শান্তা হাসল, 'তুমি তো এতদিন কুমার ছিলে, কিন্তু আজ আমাকে পেয়ে তোমার কি অস্বস্তি হচ্ছে ?'

সে দ্রুত মাথা নাড়ল, 'না।'

মহারাজ লোমপাদ বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের ক্ষমা করলেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, নিজস্ব ধর্মমতে জীবনযাপন করতে, রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে শিষ্ট থাকতে। বিদ্রাহের আগুনের লেলিহান শিখা যা অভ্রংলিহ্ হয়ে উঠেছিল তা অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। প্রজারা দুধেভাতে থাকলে কিংবা থাকার প্রতিশ্রুতি পেলে কখনই বিরুদ্ধাচরণ করে না, এই সত্য রাজাকে আরও কর্তব্যনিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু মহামন্ত্রীর প্রতি তিনি কোন হিংসাভাব অবলম্বন করলেন না। তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে একজন বুদ্ধিমান এবং বিনীত রাজপুরুষকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলেন। বর্ষণে যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল, এখন যজ্ঞভূমি পরিষ্কার করা হল। গতরাত্রে রাজকন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। রাজার মনে আর কোন দুঃখ নেই। কারণ আজ কন্যার মুখ দর্শন করে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। তিনি নিজে জামাতার মুখোমুখি হতে চান না এখনই। মুনিদের মতিগতি বোঝা দুষ্কর। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যের প্রজাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করলেন। শেষপর্যন্ত তিনি নতুন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজ্যের সর্বত্র কি এখন শান্তি আছে?'

মন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ। মানুষ আবার রাজা এবং ধর্মে আস্থাশীল হয়েছে।'

মহারাজ লোমপাদ বললেন, 'এবার তোমাকে একটি কাজ করতে হবে মন্ত্রী। যে প্রবীণা বারঘোষা স্বকন্যা আমার জামাতাকে এই রাজ্যে এনেছে তাদের অবিলম্বে রাজ্য ত্যাগ করাতে হবে।' সবিস্ময়ে মন্ত্রী বললেন, 'সে কি মহারাজ! কেউ যখন উদ্যোগী হতে সাহসী হচ্ছিল না তখন ওরাই এগিয়ে গিয়েছিল ঋষিপুত্রকে নিয়ে আসতে। এতে তারা প্রাণের ঝুঁকিও নিয়েছিল।' মহারাজা বললেন, 'এসব কাহিনী আমার অজানা নয়। কিন্তু প্রয়োজন আবেগকে অস্বীকার করে' মন্ত্রী বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি নিশ্চয়ই এও জানেন রাজ্যের সমস্ত মানুষ জেনেছে তাদের কারণেই ঋষিপুত্র এখানে এসেছেন, তারা না আনলে এরাজ্যে বর্ষণ হতো না। যদিও তারা বারবনিতা তবু এখন তাদের সবাই দেবীর মত দেখছে। এই অবস্থায় কোন অপরাধে তাদের রাজ্য ত্যাগ করতে বলব। প্রজারাও এই আদেশ মানবে না।'

মহারাজ বললেন, 'আগে হলে বলতাম রাজার ইচ্ছাই আদেশ। কিন্তু এখন সেকথা বলব না। তুমি প্রবীণা এবং তার কন্যাকে বল বিভাণ্ডকপুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করে স্থির করেছে যে তাদের বিস্মরিত হতে চায়।'

মন্ত্রী এবার যেন বুঝতে পারলেন, 'আপনার জামাতা তাদের আর এরাজ্যে সহ্য করবেন না, এই তো? হ্যাঁ, এখন আমি স্বচ্ছন্দ হতে পারি কারণ ঋষিপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলবে না।'

মহারাজ বললেন, 'প্রবীণা বারঘোষার বিরুদ্ধে অবশ্য তেমন অভিযোগ নেই। সুখে এবং দুঃখে আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তার কন্যার নির্বাসন অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু শাখা ছেদ করার চেয়ে বৃক্ষ উৎপাটনই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

মন্ত্রী তখনই রথ নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে এলেন। অন্য কোন কর্মচারীর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করার চেয়ে নিজেরই কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত বলে মনে হল তাঁর। কয়েকটি রাজকর্মচারী অবশ্য সঙ্গে নিতে ভুললেন না যদি কোন বাধা

আসে প্রতিপক্ষ থেকে এই আশঙ্কায়। প্রবীণা বারঘোষা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। যে এলাকায় সে থাকে তা যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু। তার সদরে পৌঁছে মন্ত্রী বিস্মিত হলেন। শোকার্তের ক্রন্দন ভেসে আসছে গৃহ থেকে। দাসদাসীরা অবনত মস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, মন্ত্রীর রথ দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। শশব্যস্তে প্রবেশ করে মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'কি ঘটেছে? এত কান্না কেন?'

কেউ উত্তর দিল না। একজন দাসী সজোরে কেঁদে উঠল। মন্ত্রী ভাবলেন তাঁর আসার কারণ নিশ্চয়ই এরা জানতে পেরেছে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হল? তিনি আরও ক্রুদ্ধ হলেন। গম্ভীর পদক্ষেপে ভেতরে প্রবেশ করে তিনি প্রবীণার মুখোমুখি হলেন। প্রবীণা পাথরের মত বসেছিল। কাঁদছিল দাসী এবং আত্মীয়ারা। মন্ত্রীকে দেখেও প্রবীণার পরিবর্তন ঘটল না। মন্ত্রী ঈষৎ অপমানিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে এ বাড়িতে?'

প্রবীণা তাকাল। তারপর অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'আমার কন্যা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে।'

মন্ত্রী সচকিত হলেন, 'কখন?'

'আজ প্রভাতে। সমস্ত রাজধানী খুঁজে এসেছি কোথাও সে নেই। যদি কৌশকী নদীতে আত্মঘাতী হয়ে— !' প্রবীণা অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল।

মন্ত্রী চারপাশে তাকালেন। এটা কোন কৌশল নয় তো! আদেশ এড়াবার জন্যে এরা বেশঘোষাকে লুকিয়ে রেখে এমন পরিবেশ তৈরি করেনি তো? তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন সে না বলে চলে গেল? তার প্রেমিককে কি তুমি অনুমোদন করোনি?'

'তার তো কোন প্রেমিক ছিল না।'

'তাহলে সে যাবে কোথায়? আছে নিশ্চয়ই এই গৃহের কোথাও আত্মগোপন করে। আমার লোকদের বলছি একবার খুঁজে দেখতে।' মন্ত্রীর ইঙ্গিতে কর্মচারীরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রবীণা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ আপনি এখানে?'

মন্ত্রী চমৎকার বললেন, 'এই পথে যাচ্ছিলাম। ক্রন্দন শুনে খবর নিতে এলাম। তুমি কি অনুমান করতে পার কি কারণে তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করেছে?'

'পারি কিন্তু উচ্চারণ করতে ভয় হয়।'

'আচ্ছা, ভয় কি, বল না।'

'হ্যাঁ, আর ভয় কিসের।' প্রবীণা নিঃশ্বাস মোচন করল, 'আমাদের জীবিকায় ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের কোন স্থান নেই। অভাগী সেই ভুল করে বসেছে। আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু অভিনয় আর জীবন সে মিলিয়ে ফেলল। গতরাত্রে রাজকুমারীর সঙ্গে ঋষিপুত্রের বিবাহের সংবাদ পাওয়ার পরই সে উন্মাদিনীর মত আচরণ শুরু করল।'

মন্ত্রী বললেন, 'আহা! বামন হয়ে চাঁদের স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হলে এমনই হয়। আর চিন্তা করো না। দেখি সে কোথায় আছে। খবর পেলে তোমাকেও সেখানে পাঠিয়ে দেব।' রাজকর্মচারীরা শূন্য হাতে সেই সময় ফিরে

এলে মন্ত্রী দ্রুতবেগে রথে ফিরে এলেন। সংবাদ জানার পর মহারাজ লোমপাদ খুশি হলেন। কন্যাস্নেহে যে কাজ তাঁকে করতে হচ্ছিল তাতে তাঁর হৃদয়ের সম্মতি ছিল না। এখন সেই দায় থেকে বাঁচা গেল। যে নিজে থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে সে তাঁর ধন্যবাদের পাত্রী। তিনি অলসভরে বললেন 'খোঁজার আর কি প্রয়োজন ? প্রবীণাকে আর বিরক্ত করো না। তার বিরুদ্ধে জামাতার কোন অভিযোগ নেই।'

ধীরে ধীরে নবীন সন্ন্যাসী সংসার জীবনের সবরকম স্বাদ আস্বাদন করছিল। সব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা সুস্থ ছিল না বটে কিন্তু এর রহস্যের টান যে গভীর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সে যে চীরবল্কল পরিধান করত রাজকুমারী শান্তা তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিল, 'তবে কিনা অরণ্যে যা সুন্দর নগরে তাই চক্ষের পীড়া উৎপাদন করে।' রাজকুমারীর অনুরোধে সে অতি সূক্ষ্ম বসনে শরীর আবৃত করল। কিন্তু অনভ্যাসের কারণেই রাজকুমারীর ইচ্ছায় দাসীরা সেই বসনকে এমন সংক্ষিপ্ত আকার দিল যে নবীন সন্ন্যাসীর আর কোন অসুবিধে রইল না।

দিবস রজনী রাজপ্রাসাদের উদ্যানে ফুল-ফলে পরিবৃত হয়ে নবীন সন্ন্যাসী রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে বিহার করে। তখন নির্মল বাতাস রইল কি রইল না, আকাশে চাঁদ থাকল কি থাকল না তাতে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। নবীন সন্ন্যাসী আবিষ্কার করল জ্ঞান শুধু কারো কাছ থেকে পাওয়াই যায় না, স্ব-আবিষ্কারের মাধ্যমে তা অর্জন করা যায়।

উদ্যানের নির্মল কোমল তৃণসজ্জায় শায়িতা মদনোন্মত্তা শান্তার নিরাবরণ শরীরের দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর যে কোন সুন্দর বসনের চেয়ে সুন্দরতর হল এই সৌন্দর্য। যে কোন অমৃতের চেয়ে সুস্বাদু ওই অধরের স্বাদ। সে শিশুর মত রাজকুমারীর সর্বাঙ্গের স্পর্শ নিতে নিতে আবিষ্কার করল শরীর কথা বলে। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে যদি মনঃসংযোগের প্রয়োজন হয় তাহলে শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি অথবা উপত্যকায় সামান্য স্পর্শে যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে তার জন্যে প্রয়োজন ভালবাসার। এই ভালবাসা হচ্ছে এক সাধনা যা শরীর এবং হৃদয়কে একত্রিত করে নিজেকে পরিস্ফুট এবং আত্মাকে তৃপ্তি দিতে পারে। রাজকুমারী তাকে বলেছে এই ভালবাসার সাধনায় যে সিক্ত সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এই অর্থে সে এখন নবীন সন্ন্যাসী।

শরীর থেকে শরীরে যে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত তাতে সে ক্রমশ অবশ হয়ে পড়েছে। রাজকুমারী গাঢ় স্বরে বলল, 'হে সন্ন্যাসী, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি পুরুষোত্তম। ভালবাসার মানবীকে পাওয়ামাত্র যে পুরুষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় তাকে ধিক্। কিন্তু যে পুরুষ নিত্য নব নব উপায়ে স্বীয় কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবীর শরীর এবং হৃদয়ে ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে চলে সেই সার্থক সাধক।'

সে বলল, 'মৃগনয়না। তুমি আষাঢ়ের মেঘের মত আমার হৃদয়ের সমস্ত তাপ নিঃশেষ করেছ। আজন্ম এমন আনন্দ আমি কখনও অনুভব করিনি। আমি এইটুকু বুঝেছি তোমাকে তৃপ্ত করতে পারলেই আমার তৃপ্তি। তোমার পরিচর্যা, দম, শৌচ ও সৌন্দর্যে আমি প্রীত। তোমার শরীরে এত রহস্য যে বিশাল

অরণ্যও এর কাছে ম্লান হয়ে যায়।'

লজ্জাবনতমুখী শান্তা বলল, 'হে তপোধন, আমি ঋতুস্নাতা। আমার ঋতুকাল আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। এই কাল অতীত হয়ে গেলে আমি আপনার সঙ্গে পরবর্তী ঋতু পর্যন্ত সহবাস করব না।'

সে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন ? আমি কেন বঞ্চিত হব ?'

শান্তা মাথা নাড়ল, 'যে কর্মে আপনার ধর্ম লুপ্ত হবে তা আমি করতে পারি না।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ধর্ম কি ?'

প্রার্থনার স্বরে শান্তা বলল, 'তুমি, তুমি, তোমার ধর্ম আমার গর্ভে প্রভূত বীর্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করা। আমাদের দুজনের ভালবাসার সেই হবে ফসল।'

সে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে বলল, 'কিভাবে সেটা করতে হয় আমার জানা নেই। তুমি আমার পথ প্রদর্শিকা হও কল্যাণী।'

শান্তা বলল, 'এই একটি ব্যাপারে নারী ক্ষমতাহীনা। ঈশ্বর আপনার শরীরে বীজ দিয়েছেন। সেই বীজ আমার গর্ভে দান করলে গর্ভ তা লালন করবে। আপনার শরীরকে প্রশ্ন করুন। সেই উত্তর দেবে।'

সেই মুহূর্তে জগৎ বিস্মরিত হল সে। প্রবল আলোড়নের মধ্যে চূড়ান্ত লগ্নে তার বোধ হল, এইভাবেই নিজেকে অতিক্রম করা যায়। শরীরান্তর হয়ে গেলে দেহ জড়ীভূত এবং সহসা, সংজ্ঞালোপপ্রায় হল তার। শান্তার তৃপ্ত শরীরের পাশে শায়িত হয়ে সে শুধু অনুভব করতে পারছিল অবসাদেও পরম সুখ আছে। বাক্যবিনিময় অথবা অঙ্গসঞ্চালনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ হচ্ছিল না ওই মুহূর্তে। সমস্ত শরীর মন্থিত হবার পর যেন নিজেকে নতুন করে উপলব্ধি হচ্ছিল তার। আর এই সময় একটি বায়স কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। দ্রুত উঠে বসল শান্তা। এই উদ্যানে আজ কারো প্রবেশাধিকার নেই। দাসীরা উদ্যানের বাইরে পাহারায় রয়েছে। এই অবস্থায় একটি কুৎসিত বায়সের কি সাহস তাকে নিরাবরণ দ্যাখে। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হে সন্ন্যাসী, ভস্ম করে দাও ওই বায়সকে। রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি না।'

বায়সটি এই সময় দ্বিতীয়বার ডেকে উঠতেই তার মনে হল প্রতিটি ধমনীতে যেন আঘাত লাগছে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে বায়সের দিকে তাকাল। শান্তা ততক্ষণ পরিত্যক্ত বসন আবার টেনে নিয়ে অঙ্গ আবরিত করেছে। সে অত্যন্ত অপমানিতা হয়ে বলল, 'পতির উচিত পত্নীর সম্ভ্রম রক্ষা করা। ওই বায়সকে শাস্তি দাও।'

সে এবার ক্রুদ্ধ হল। যে দৃষ্টিপাতে শার্দুল ভস্ম হয়ে গেছে সেই দৃষ্টিতে সে তাকাল বায়সের দিকে। অথচ আশ্চর্য, বায়সটি আপনমনে দূরের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সেখানে উড়ে গেল। আচমকা যেন হোঁচট খেল সে। পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতিত কোন বিশাল প্রস্তর যেমন বিচূর্ণ হয় তেমনি তার সমস্ত বোধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সহসা সে অনুভব করল তার ক্রোধ আর তেমন শক্তিশালী নয়। কিন্তু একটি গোপন মন জন্ম গ্রহণ করল সেই মুহূর্তেই। সেই মন তাকে পরামর্শ দিল এই অক্ষমতা প্রকাশ করো না। সে মুখ ফেরাল, 'একটি সামান্য বায়সকে দেখে এত উত্তেজিতা কেন তুমি ? ও তো অবলা প্রাণী। তুমি

একসময় অসূর্যম্পশ্যা ছিলে বলে শুনেছি। এই তৃণ, পুষ্প, তরু থেকে শুরু করে সমস্ত মূক পৃথিবী তোমাকে যদি দর্শন করতে পারে তাহলে ওই বায়স কি দোষ করল ?'

শান্তা অবাক হয়ে বলল, 'তার দোষ বিচারের বিষয় নয়। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে তুমি, তাই তোমার ধর্ম। এর বদলে যদি কোন পুরুষ আমাকে এই অবস্থায় দর্শন করত কি করতে তুমি ?'

'অন্য কোন পুরুষ ?' সে উত্তেজিত হল, 'তাকে ভস্ম করব আমি।' তারপরেই সংশোধন করল শব্দটি, 'তাকে হত্যা করব।' এই কথা শুনে শান্তা অত্যন্ত প্রীত হল। সে দুহাতে তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে পরম অনুরাগে বলল, 'আমি এতকাল অঙ্গদেশের মত বিশুষ্ক ছিলাম, তুমি আমাকে রসসিক্ত করেছ। যতদিন দিন তোমার মনে ঈর্ষা জন্মাবে ততদিন আমি জানব তুমি আমাকে ভালবাস।' সে নব উদ্যমে চুম্বন করল।

কন্যা গর্ভবতী হয়েছে জেনে মহারাজ লোমপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। জামাতার নির্বাচন তাঁর ইচ্ছায় হয়নি বলে তিনি বিষণ্ণ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের দায়িত্ব ওই ঋষিপুত্রের দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভব নয় তিনি জানেন। এখন কন্যার সংবাদ তাঁকে পুলকিত করল। বিভাণ্ডক ঋষির ভূপতিত রেতঃ পান করে যদি একটি ঋতুমতী কুরঙ্গী গর্ভবতী হয় এবং পুত্রসন্তান উৎপাদন করে তাহলে সেই পুত্রের ঔরসে পুত্রের আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি ভাবী উত্তরাধিকারীকে ওই অরণ্যে পাঠাতে পারবেন না। সে যেন পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে আবার সন্ন্যাসী না হয় সেটাও দেখতে হবে। এখন কৌশলে ওই ঋষিপুত্রকে তার অরণ্যে প্রেরণ করতে পারলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আর একটি ব্যাপারে মহারাজ লোমপাদ উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবের। তিনি যদি জানতে পারেন তাঁর পুত্র সংসারী হয়েছে তাহলে সমস্ত ক্রোধ এই অঙ্গদেশের ওপরে এসে পড়বে। অতএব অবিলম্বে বিভাণ্ডক মুনির কোপোপশমের প্রয়োজন। তিনি নিশ্চয়ই যোগবলে জানতে পারবেন কোথায় তাঁর পুত্র আছে। নদীপথ ব্যবহার করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব না। তিনি হয়তো পর্বত অতিক্রম করে অঙ্গদেশে আসার চেষ্টা করবেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী দূতদের সেই পথে প্রেরণ করে নির্দেশ দিলেন তারা যেন পথের দুপাশের সমস্ত কৃষক এবং গো-পালককে জানিয়ে দেয় রাজাদেশে তারা বিভাণ্ডক মুনির দর্শন পেলে বলে, 'এই সমস্ত ভূমি, পশু এবং আমরা আপনার পুত্রের অধিকৃত। আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী দাস। অতএব আপনার প্রিয়কর্ম সম্পাদনের জন্যে আমরা প্রস্তুত।'

প্রচণ্ডকোপ বিভাণ্ডক সম্পর্কে মহারাজ লোমপাদ ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। আশ্রমে প্রত্যাগমন করে তিনি পুত্রের দর্শন না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি যোগবলে জানতে পারেন অঙ্গদেশের মহারাজা তাঁর পুত্রকে হরণ করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই দেশ ভস্ম করার প্রবৃত্তি হল তাঁর। কিন্তু নদীপথে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে তিনি পর্বত অতিক্রমের চেষ্টা করলেন। তিনি ঋষি

বলেই সেই দুরূহ কর্ম শেষ করতে পারলেন কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তখন মহারাজ প্রেরিত দূতের দ্বারা শিক্ষিত গোপালক এবং কৃষকগণ এগিয়ে এসে তাঁকে সমুচিতভাবে সৎকৃত করল। নৃপতির মত প্রথম যামিনী অতিক্রম করে বিভাণ্ডক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে গোপগণ! তোমরা কার দ্বারা অধিকৃত?'

শিক্ষিত গোপেরা উত্তর দিল, 'মহর্ষি! আপনার তনয় এই সমস্ত ধনের অধিকারী।' এই বাক্য শোনামাত্র বিভাণ্ডক মুনির প্রজ্বলিত কোপানল একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেল। এই বিশাল জনপদ যে তাঁর পুত্রের অধীনে এতে তিনি গর্বিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জানো আমার পুত্র এখন কেমন আছে? সে সরলমতি, সংসারানভিজ্ঞ।'

গোপগণ জবাব দিল, 'তিনি অঙ্গদেশের আকাশে সূর্যের মত বিরাজ করছেন। রাজকুমারী শান্তা তাকে সবরকম অভিজ্ঞতা দিয়েছেন। যদি অপরাধ না নেন তাহলে জানাই, তিনি এখন আপনার চেয়েও সব বিষয়ে অভিজ্ঞ।'

এই কথা শ্রবণ করে বিভাণ্ডক অবাক হয়ে গেলেন, 'আমার চেয়েও অভিজ্ঞ?'

একজন বৃদ্ধ গোপ বলল, 'হ্যাঁ মহর্ষি। কারণ সারাজীবন আপনি মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে শুধু দেবতার আরাধনায় মগ্ন আছেন। শরীরকে যাবতীয় ক্লেশ দিয়েছেন এবং জাগতিক রসাস্বাদ করেননি।' বিভাণ্ডক বললেন, 'তাই হবে। কিন্তু আমি পুত্রের দর্শনে অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরীতে যাব।' বৃদ্ধ বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবেন। পুত্রের অধিকৃত স্থান মানে পিতার সম্পত্তি। তবে যাওয়ার আগে আমাদের অভিলাষ, আপনি এই স্থানে কিছুদিন থেকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ গ্রহণ করুন।' বিগলিত বিভাণ্ডক বললেন, 'তথাস্তু।'

এই সংবাদ যথাসময়ে মহারাজ লোমপাদ জানতে পারলেন। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি স্থির করলেন ঋষিপুত্রকে তার পিতার আগমনবার্তা জানাবেন। কিন্তু সেই সময় অঙ্গদেশের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে একদল দুরাচারী রাক্ষস রাজ্যের উত্তর দিকে অত্যাচার শুরু করল। সৈন্যদল তাদের পরাস্ত করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। মহারাজের মনে হল জামাতাকে বললে রাক্ষসরা এক মুহূর্তেই পরাস্ত হবে। দেবতারা যার আদেশ মান্য করতে বাধ্য সেই ঈশ্বরের কৃপা যে পেয়েছে তার কাছে রাক্ষসরা তো কিছুই নয়। মহারাজ অন্দরমহলে সংবাদ পাঠালেন, তিনি জামাতার দর্শনপ্রার্থী।

চম্পানগরীতে আসবার পর সে আর রাজপ্রাসাদের বাইরে পা বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করেনি। বস্তুত উদ্বিগ্ন-সময় অতিক্রান্ত হবার পর এখন নিরবচ্ছিন্ন সুখে সে কালাতিপাত করছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য, মূল্যবান সুগন্ধি, অমূল্য পরিধান, নির্বাচিত দাসীদের পরিচর্যা এবং সযত্নে পরিবেশিত সুমধুর সঙ্গীতের সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে সে এক অভিনব বৈকুণ্ঠ রচনা করে নিয়েছিল। শরীর এবং মনের মিলিত আকাঙ্ক্ষায় মিলনপর্বের প্রাথমিক স্তরে যে উন্মাদনা তা যদি মনঃসংযোগের আদিরূপ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে চূড়ান্ত মুহূর্তে যে প্রচণ্ড কম্পনে শরীর কল্লোলিত এবং মন জড়ীভূত অবস্থায় পৌঁছে যায় তাকে অনন্ত সময়ে পৌঁছে দিলে কি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটবে না?

সাধনার এই নবীন পথটি তাকে প্রতিক্ষণ আপ্লুত করছে। হ্যাঁ, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথ শুধু একটিই থাকবে তা হতে পারে না। তাহলে তো সেই পথ জনাকীর্ণ হবে। ঈশ্বর নানাবিধ পথ রেখেছেন। হয়তো এটাও সেই পথ। সাধারণ মানুষ তাৎক্ষণিক সুখে বিভ্রান্ত থাকে বলে সেই মুহূর্তটিকে পলকেই হারিয়ে ফেলে। সে চেষ্টা করে ওই মুহূর্তটিকে প্রলম্বিত করে চেতনাকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে। ইদানিং এই কারণেই রাজকুমারী শান্তা বিরক্ত হচ্ছে। শান্তা জানছে না নবীন সন্ন্যাসীর অভিপ্রায়। তাছাড়া ইতিমধ্যে সে শান্তার গর্ভাধান করার পর থেকেই রাজকুমারীর অনুরাগের চাপল্য কমে এসেছে।

মহারাজ দর্শনপ্রার্থী জেনে সে সুখী হল না। ইতিমধ্যে সে জেনেছে এই রাজ্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব পুরুষদের ওপরেই। যদিও রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকায় সে তাদের দর্শন না করেই আছে। রাজকুমারীর ধারণা এখনও একই আছে যে, পুরুষদের দেখলেই ঋষিপুত্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হবে। কিন্তু নির্জনে একাকী সে অনেকবার চেষ্টা করেও একটি সামান্য জীর্ণপত্রকেও দগ্ধ করতে পারেনি। মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত রাজকুমারীর সঙ্গত্যাগ করে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে ব্রতকালের অভ্যস্ত প্রক্রিয়ায় সাধনা শুরু করে সে কিছুতেই চেতনাকে সেই স্তরে নিয়ে যেতে পারে না যেখানে সে কিছুদিন আগেও স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারত। প্রায়ই সে নিজেকে প্রশ্ন করছে, তার কি পতন হয়েছে? এতকালের পরিশ্রমলব্ধ দক্ষতা কি তার ম্লান হয়ে গেল? সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তা মনে উদিত হয়, এতকাল সে কি পেয়েছে? নিজের সঙ্গে তার নিজের লড়াই শুরু হচ্ছে প্রায়শই।

এই সময় মহারাজ লোমপাদ তাঁর কক্ষের বাইরে উপস্থিত হলেন। এখন দিবা দ্বিপ্রহর। রাজকুমারী শান্তা এই সময় স্নানে গিয়েছে। সন্তানবতী হবার আগে রাজপ্রাসাদের ভেতরে নির্মিত কৃত্রিম প্রস্রবণে তারা একত্রে অবগাহন করত। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাকে মেনে নিতে হয়েছে। ইদানিং রাজকুমারী তাকে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। যেন অধিকারবোধ প্রবল হয়ে সমস্ত কিছু দখল করে নিয়েছে।

মহারাজ কক্ষে প্রবেশ করে বিস্মিত হলেন। বেশ কিছুকাল পরে তিনি ঋষিপুত্রের দর্শন পেলেন। এই সময়েই তার শরীরে অদ্ভুত জৌলুস এসেছে। মুখচোখে ভোগবিলাসজনিত তৃপ্তির চিহ্ন পরিস্ফুটিত। অঙ্গে দৃষ্টিনন্দন পোশাক। মাথার কেশ সুবিন্যস্ত এবং শৃঙ্গটি সযত্নে লুকায়িত। মহরাজ অভ্যাসে সামান্য নত হতে গিয়ে সামলে নিলেন, 'কোন রকম অসুবিধে হচ্ছে না তো!'

সে উত্তর দিল, 'অসুবিধে হলে তো জানতেই পারতে।'

মহারাজ থতমত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন. 'আমি একটি বিষয়ে আলোচনার জন্যে এসেছি। মহামুনি বিভাণ্ডক সম্ভবত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন পুত্রের অদর্শনে।'

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল সেই শীর্ণ মুখ। সে বলল, 'পিতৃদেব বিচলিত?'

'হ্যাঁ, এবং ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধের উপশম কিভাবে করা যায়?'

দুহাত বুকে ভাঁজ করে রেখে সে কয়েকবার পদচারণা করল, 'পিতৃদেব

অত্যন্ত অকারণে ক্রুদ্ধ হন। সারাজীবন সাধনা করার পরেও তো তাঁর ওপরে দেবতাদের কৃপা বর্ষিত হল না। কিন্তু তুমি কি করে জানলে তিনি বিচলিত আমার অদর্শনে?'

মহারাজ বললেন, 'তিনি পর্বত অতিক্রম করে চম্পানগরীতে আসতে চেষ্টা করেছিলেন।'

সে দ্রুত মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। সে-কাজ পিতার শরীর সহ্য করবে না।'

মহারাজ বললেন, 'আমার মনে হয় একবার তাঁর মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলে আসা ভাল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বললে বুঝবেন।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আমার পিতৃদেবকে চিনি। তিনি নারীজাতিকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। অপ্রাপ্তি থেকে যে বিতৃষ্ণা জন্মায় তা দূর করা অসম্ভব, বিশেষ করে যদি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তিনি কিছুতেই রাজকুমারীকে মেনে নেবেন না।'

'কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে চম্পানগরীকে ভস্ম করতে পারেন। এ ব্যাপারে যা করা উচিত তাই করলে ভাল হয়। দ্বিতীয় আর একটি অনুরোধ আছে আমার।' মহারাজ সামান্য নত হলেন।

'কি অনুরোধ?'

'আমার রাজ্যের উত্তরদিকে রাক্ষসরা প্রায়ই অত্যাচার করছে। সৈন্যরা তাদের সামাল দিতে পারছে না। অবশ্য তারা চম্পানগরীর দিকে আসতে সাহস পাচ্ছে না। এদের ধ্বংস করে দিলে ভাল হয়। এই রাজ্যরক্ষা করা তো এখন রাজজামাতার কর্তব্য।'

'কিভাবে ধ্বংস করব? আমি তো যুদ্ধবিদ্যা জানি না।'

'যুদ্ধবিদ্যা? সে তো অর্বাচীনদের জন্যে। আপনি কোপানল প্রজ্জ্বলিত করলেই ওরা দগ্ধ হবে।'

শৃঙ্গে হাত বোলাতে গিয়েও সামলে নিল নবীন সন্ন্যাসী। তারপর হেসে বলল, 'হবে, সব হবে। এত ব্যস্ত কেন? আমি এখানে আছি তা জানলে ওরা নিশ্চয়ই সাহসী হবে না। আমি ইচ্ছে করলে এখানে বসেই তাদের ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু শুধু শুধু প্রাণীহত্যা করে কি লাভ। আর হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে পিতৃদেব এখানে এলে কি করতে কি করে বসবেন তার ঠিক নেই। অসংসারী মানুষেরা চিরকালই অবুঝ হয়। তার চেয়ে বোধহয় আমাদের যাওয়াই ভাল, যাই, ক'দিন ঘুরেই আসি।'

মহারাজ চমকিত হলেন। এ কি কথা শুনছেন তিনি। এতো পাকাপোক্ত নাগরিক কথাবার্তা। এত পরিবর্তন হল কখন? কিন্তু ঋষিপুত্র যে 'আমাদের' শব্দটি উচ্চারণ করল। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিয়ে কন্যার দর্শনে গেলেন।

নবীন সন্ন্যাসী একা হতেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল। তার মনে হল পিতৃদেব অযথা ঝামেলা করছেন। তিনি যদি চলে আসেন তাহলে বিপাকে পড়তে হবে। কিন্তু এরা তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। ব্যবহৃত হতে তার আপত্তিও নেই। কিন্তু তার সেই শক্তি কোথায় গেল। ব্যাপারটা যত সে ভাবছে ততই মনে আক্ষেপ জন্মাচ্ছে। সে দুহাতে নিজের ললাট চেপে ধরতেই হাতে

আঘাত লাগল। দ্রুত হাত মুখের সামনে আনল সে। ভগ্নশৃঙ্গের আঘাতে অঙ্গের জন্যে রক্তপাত হয়নি। সে কেঁদে ফেলল এবার। কেন, কেন ঈশ্বর তার ক্ষমতা কেড়ে নিলেন? অথচ এরা সবাই জানে সে ক্ষমতাবান। ওই ক্ষমতা তাকে ফিরে পেতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল অরণ্যের পরিচিত পরিমণ্ডলে ফিরে গেলে তার ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে। সে নিজের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে আবার ফিরে আসবে। হঠাৎ সেই অরণ্য তাকে যেন আকর্ষণ করতে লাগল।

দ্বারে পদশব্দ হতে সে আত্মসংবরণ করল। আজকাল মনের ভাব গোপন করার কৌশল সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। রাজকুমারী শান্তা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করে তাকে আলিঙ্গন করল। যদিও স্বাভাবিক কারণেই ঘনিষ্ঠতায় তার সর্তকতা থাকে। সে বলল, 'প্রিয়ে, তুমি এবার মহার্ঘ আভরণ ও সূক্ষ্মবসন পরিত্যাগ কর।'

রাজকুমারী বিস্মিত, 'সেকি, কেন?'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আমরা অরণ্যে ফিরে যাব।'

রাজকুমারী হাসল, 'হে তপোধন, চীরবল্কল এবং অজিন পরিধান করলে আমাকে মেঘে ঢাকা চাঁদের মত মনে হবে। তুমি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চাঁদ দেখতে চাও না।'

'চাই, চাই।' সে মাথা নাড়ল, 'কিন্তু তোমাকে যে যেতে হবে সেখানে।'

'নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু এই প্রাসাদে যেরকম শয্যায় আমরা শয়ন করি সেইরকম শয্যায় সেখানে শয়ন করতে চাই। তুমিও এইরকম মালা ও বসনভূষণ পরিধান করে থাকবে আর আমি দিব্য-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।'

'কিন্তু— ।'

'কোন কিন্তু নয়। তপস্বীদের পবিত্র কাষায়বসন পরিধান করে তোমার সঙ্গে মিলিত হলে মহাপাপ হবে। তোমাকে দেখব অথচ মিলিত হতে পারব না, তা তো সম্ভব নয়।'

নবীন সন্ন্যাসীর কথাটা মনঃপূত হল। সে বলল, 'প্রিয়ে, তোমার পিতার মত এত ধনসম্পত্তি আমার নেই। আমি কি করে তোমাকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দেব?'

শান্তা মদির হাসল, 'স্বামী। তোমার তপঃপ্রভাবে এই পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ এক মুহূর্তেই তুমি আহরণ করতে পার। যার আহ্বানে ঈশ্বর প্রীত হন তার অসাধ্য কি।'

নবীন সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছ।' কিন্তু মনে মনে সে অবিলম্বে পথ বদলালো। ক্ষমতার প্রদর্শনে নিজেকে হাস্যকর করার কোন ইচ্ছা তার নেই। এরা যেন কেউ না জানতে পারে তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীর গলায় বলল, 'হে কোমললোচনে, তপঃপ্রভাবে অর্থ আহরণ করতে গেলে তপঃক্ষয় হয়। তুমি নিশ্চয়ই তা চাও না।'

'চাই না। যে কর্মে তোমার ধর্মলুপ্ত হয় তা আমি করতে বলব না। তাহলে তুমি একাই কিছু দিনের জন্যে ঘুরে এস। স্বল্পবিরহ ভালবাসাকে আরও গভীর করে। পরস্পরের জন্যে আকর্ষণ দশগুণ বর্ধিত হয়। ফিরে এলে তুমি তোমার

পুত্রের মুখ দর্শন করবে আর আমি নবীনা হয়ে তোমার ভালবাসায় প্লাবিত হব।' শান্তা নবীন সন্ন্যাসীর বক্ষে মুখ রাখল।

কৌশকী নদীতে তরী প্রস্তুত। নবীন সন্ন্যাসীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমন কি বিদায় নেবার মুহূর্তে শান্তার সঙ্গে সে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কিন্তু তার মন আগে থেকে ভেবে নিয়েছিল এই ব্যবস্থা অতীব উত্তম। একাকী অরণ্যে সে তার লুপ্ত ক্ষমতা সাধনায় ফিরে পাবেই। সেই লতা, পুষ্প, কুরঙ্গী এবং অরণ্যের গন্ধে তার অভ্যস্ত চিন্তার প্রয়োগে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু বিদায়ের সময় তার অন্তর দীর্ণ হল। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসার অঙ্গীকার করে সে তরীতে উঠে বসল।

তরীতে উঠেই সে সচেতন হল। বিশালদেহী মাল্লারা তরী চালাচ্ছে। একটি দাসীও তরীতে নেই। এই অনভ্যস্ত মুখদর্শন করে সে ক্রুদ্ধ হল। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশে কোন লাভ হবে না এখন। সে জানল রাজকুমারীর নির্দেশে দাসীর বদলে দাস তার সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। সে উদাস হয়ে জলের দিকে তাকাল। ভাসমান তরীতে বসে তার মনে হল রাজকুমারী তাকে বিশ্বাস করে না। সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে সে পীড়িত হতে লাগল। সেই অভিমান একসময় অপমানবোধে রূপান্তরিত হল। মহাহ্রদের দিকে তরী এগোচ্ছে। চারপাশে শুধু জল আর দূরে তীর। দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্ধ্যা নামলে মাল্লারা তরী তীরে ভেড়ালো রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে। এবং তখনই নবীন সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে এল একটি নারী একাকিনী নদীতীরে বসে আছে। তাব কেশভার রুক্ষ, যেন অনেকদিন পরিচর্যিত হয়নি। তার অঙ্গে অর্ধছিন্ন পোশাক। কিন্তু যৌবন সে পোশাকের আড়াল অমান্য করছে। সে একজন দাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওই রমণী ?'

দাস সংবাদ নিয়ে এসে বলল, 'এই রমণী উন্মাদিনী। দস্যুরা একে ব্যবহার করে এখানে ফেলে রেখে গেছে। এই জনশূন্য প্রান্তরে ও একাই আছে।'

'উন্মাদিনী ? কি কারণে উন্মাদিনী ?'

'তা জানি না প্রভু। তবে ওর নিকটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

দাসের কথা শুনে নবীন সন্ন্যাসী উঠল। তারপর ধীরে ধীরে তরী থেকে নেমে প্রায়ান্ধকার তটে পা রেখে পৌঁছাল সেই রমণীর কাছে। রমণীর মুখ এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল। সে একদৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। কাছাকাছি হতেই নবীন সন্ন্যাসী চমকে উঠল, 'এ কি, বেশঘাষা।'

কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে রমণীর কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সে পাথরের মত বসেই রইল। নবীন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হাত রাখল রমণীর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে একটি আর্ত চিৎকারে সেই সন্ধ্যার তটভূমির সমস্ত নৈঃশব্দ চুরমার হল। বীভৎস মুখ করে উন্মাদিনী উঠে দাঁড়াল। নবীন সন্ন্যাসী নিজেকে কোনমতে সংবরণ করে প্রশ্ন করল, 'বেশঘোষা, একি হয়েছে তোমার ?'

'ভালবাসা ? মার লাথি ভালবাসার মুখে।' বলতে বলতে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল রমণী, 'এই এসো, এসো না। তোমাকে ভালবাসা শেখাই।'

নবীন সন্ন্যাসী কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না বেশঘোষা ?'

'কে তুমি ? তুমি কে গো ? কোন গাছের কাঁটা ! আমাকে বিঁধতে চাও ?

আর বিঁধিয়ো না গো। কাঁটা বিধে বিধে আমার রক্ত বেরিয়ে গেছে সব। আচ্ছা, বলতে পার সে কেমন আছে?' দ্রুত পায়ে উন্মাদিনী কাছে এগিয়ে এল।

এবং তখনই নবীন সন্ন্যাসী আবিষ্কার করল রমণী পূর্ণগর্ভা। উন্মাদিনীর গর্ভে সন্তান আসে? কার সন্তান? সে তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কার কথা বলছ?'

'সে গো সে! যে কখনও নারী দ্যাখেনি। আমি তাকে দেখালাম আবার দেখালামও না। আমি তাকে ভালবাসা শেখালাম আবার শেখালামও না। সব শিখেশুখে সে আসবে, ঠিক আসবে আমার কাছে। দেখো।' উন্মাদিনী দুচোখ বন্ধ করল নদীর দিকে মুখ করে।

এইসময় দাস এসে জানাল আহার্য প্রস্তুত। প্রভুর উচিত হবে না ওই হিংস্র রমণীর কাছে থাকা। কারণ ইতিমধ্যে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। দস্যুদের সন্তান গর্ভে আসার পর যে উন্মাদিনী হয়েছে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। নবীন সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল, 'সে আমি বুঝব। মনে হয় ও অনেকক্ষণ অভুক্ত। ওকে জোর করে তরীতে নিয়ে এস।'

অনিচ্ছায় দাসরা আদেশ পালন করতে এগোল। তাদের এগোতে দেখে আতঙ্কিত উন্মাদিনী খানিকটা দৌড়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নবীন সন্ন্যাসী উদ্বিগ্ন হয়ে চিৎকার করল, 'বেশঘোষা!' প্রায়ান্ধকার নদীতে রমণীর শরীর ওঠানামা করছে। আদেশ পাওয়ামাত্র মাল্লারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। অনেক চেষ্টার পর যখন তারা উন্মাদিনীকে উদ্ধার করল তখন দৌড়ে গেল নবীন সন্ন্যাসী। নদীতটে চিত হয়ে পড়ে আছে রমণী, তার উদর স্ফীততর। সে তীব্রস্বরে ডাকল, 'বেশঘোষা। আমি, সেই আমি এসেছি।'

একজন মাল্লা নিচু গলায় জানাল, 'প্রভু! এ আর বেঁচে নেই।'

বেঁচে নেই? তার মানে মৃত? জীবনে প্রথমবার মৃত্যুকে দেখল সে। কিন্তু মুখে গলায় হাত বোলাল নবীন সন্ন্যাসী। এখনও উত্তাপ আছে অথচ এরা বলছে মৃত। সে প্রাণপণে রমণীকে ডাকতে ডাকতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। শরীর নিটোল থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে। কোন চেষ্টার দ্বারা এই প্রাণবায়ু পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে আনা যায়? সে বেশঘোষার স্ফীত উদরের ওপর হাত রাখল। এইখানে কি শিশু আছে? সেই শিশু কি এখনও জীবিত? মাল্লারা বলল সেটা সম্ভব না। উন্মাদিনী প্রচুর সলিল পান করেছে। উদরস্থ শিশুও সেই সলিলে ডুবে মরেছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নবীন সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়াল। সে বেশঘোষার মৃত শরীরের দিকে তাকাল। এই রমণী ওই অপরূপ দেহ নিয়ে একদিন তার কাছে গিয়েছিল। সেই দেহের মায়াময় ঝংকারে সে চমৎকৃত হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর কীর্তি হল বেশঘোষা। গভীর অরণ্য থেকে চম্পানগরীর রাজপ্রাসাদের দ্বার পর্যন্ত সে এসেছে ওই রমণীর জন্যে। সে কি এই রমণীতে আকর্ষিত হয়নি? তার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার বীজ তো এই রমণীই বপন করেছিল প্রথমে। এখন সেই দেহ, সেই অপূর্ব সুষমাসৃষ্টিকারী বর্তুলাকার মাংসপিণ্ড মৃত্তিকাবৎ পড়ে আছে। স্বচ্ছন্দে কীটেরা উঠে আসছে ওখানে। প্রাণের অভাব যাবতীয় আকর্ষণকে হরণ করে শরীর থেকে? এখন ওই শরীরের চেয়ে একটি তরু অনেক বেশি আকর্ষণীয়। হঠাৎ যেন নতুন করে জ্ঞানোন্মোচন

ঘটল নবীন সন্ন্যাসীর। এই পৃথিবীর শরীরকেন্দ্রিক যাবতীয় আনন্দ প্রাণনির্ভর। সে স্মরণ করল এই উপলব্ধি বেশঘোষাই তাকে দিয়ে গেল। সে দুহাতে মুখ ঢেকে তীব্র চিৎকার করল। সেই চিৎকারে ক্রন্দন মিশেছিল। মাল্লা এবং দাসরা ঋষিপুত্রের এই প্রতিক্রিয়ার অর্থ বুঝতে পারছিল না। বেশঘোষাকে তারা কখনও দ্যাখেনি। চম্পানগরীর মানী এবং ধনীদের জগতেই সে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবীণ মাল্লা বলল, 'প্রভু, শোক সংবরণ করুন। যে কোন জীবিত প্রাণীকেই তার নির্দিষ্ট সময়ে মরে যেতে হয়।'

'কিন্তু এই রমণী কেন উন্মাদিনী হল ? উন্মাদিনী না হলে তো মারা যেত না এখনই !'

সে শোকগ্রস্ত হয়ে প্রশ্নটি উচ্চারণ করল।

'হয়তো কোন ভয়াবহ আঘাত পেয়েছিল হৃদয়ে, হয়তো কোন পুরুষকে ও ভালবাসত যে ওর মর্ম উপলব্ধি করেনি। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা এই দেহ দাহ করে দিচ্ছি।' প্রবীণ মাল্লা ঘোষণা করল।

রাত গভীর হলে নবীন সন্ন্যাসী তরীতে বসে প্রান্তরে প্রজ্বলিত চিতার দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেবলই প্রশ্ন করতে লাগল, বেশঘোষা কি তাকে ভালবাসত ? রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেবার পর তো বেশঘোষাকে সে কখনও দ্যাখেনি ! কেন ? শান্তার কাছে তাকে পৌঁছে দিয়ে বেশঘোষা কেন আড়ালে সরে গেল ? বেশঘোষা কি তারই ব্যবহারে আঘাত পেয়ে উন্মাদিনী হয়েছে ? বুকের ভেতর নিরন্তর একটি চাপ অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করছিল। সে রূপবতী বেশঘোষাকে স্মরণ করল। ওই শরীর সে স্পর্শ করেছে অজ্ঞান হয়ে। শরীরের যাবতীয় রহস্যের দ্বারগুলো বেশঘোষা ইচ্ছে করেই তার কাছে রুদ্ধ রেখেছিল। কেন, কেন ? যে রমণীর শরীরে শরীর ডুবিয়ে নিঃশেষ না হওয়া যায় তাকে কি ভালবাসা যায় ? না গেলে ও কেন উন্মাদিনী হল ? নিভন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে সে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল, 'ভা-ল-বা-সা।' ভালবাসা কাকে বলে ? সে কি রাজকুমারী শান্তাকে ভালবাসে ? ভালবাসা মানে যদি আকর্ষণ, তাহলে চম্পানগরী ত্যাগ করার সময় রাজকুমারীর জন্যে যেভাবে হৃদয় মথিত হচ্ছিল এখন তা হচ্ছে না কেন ? কেন অদর্শন তার আকর্ষণ লুপ্ত করেছে ? সে কি বেশঘোষাকে ভালবাসত ? তাহলে আজ কেন তাকে দেখে সে উদ্বেলিত হল ? নবীন সন্ন্যাসী পৃথিবীর মানুষের জীবন-ধারণের সাধনার সবচেয়ে জটিল প্রক্রিয়াটির কোন অর্থ বুঝতে পারছিল না। সে শুধু মনে মনে উচ্চারণ করছিল, 'ভা-ল-বাসা। আমি কাকে ভালবাসি, কাকে ?'

অরণ্যের প্রান্তে তাকে নামিয়ে যথাবিধি সম্মান জানিয়ে মাল্লারা তরী নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর নবীন সন্ন্যাসী অরণ্যের দিকে তাকাল। গভীর অরণ্য থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। দীর্ঘদিনের অদর্শন তার মনে সঙ্কোচ সৃষ্টি করছিল। তার মনে হল অনেক বৃক্ষ এর মধ্যে জরাগ্রস্ত হয়েছে, অনেক ক্ষুদ্র তরু বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। সে পা বাড়াল।

একদা তার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির সঙ্গে তাকে এখন বোঝাপড়া করতে হবে। সে সাহস সঞ্চয় করছিল। পিতৃদেব যদি তার সঙ্গে

ক্ষিপ্ত ব্যবহার করেন তাহলে সে যুক্তি দেখাবে। এই অরণ্যে সে আর তিন পক্ষকাল থাকবে। তারপর অঙ্গদেশের তরী এসে তাকে নিয়ে যাবে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। পিতৃদেবকে সে জানাবে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তরুলতার বনজগন্ধ তাকে আলোড়িত করল। এ যেন দীর্ঘদিন পরে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার মত আরাম। তরী থেকে অবতরণের সময় সে চীর-বল্কল পরিধান করেছিল। পরার সময় যে অস্বস্তি ছিল তা এই মুহূর্তে দূর হয় গেল। সে তাদের আস্তানাটিকে দেখতে পেল। বুকের মধ্যে নরম উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। সে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকাল। এই স্থানেই তার শৈশব, বাল্যকাল এবং যৌবনের প্রথম প্রহর কেটেছে। সে কয়েক পা এগিয়ে নিচুস্বরে ডাকল, 'পিতৃদেব।'

সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দ কানে এল। মুখ ফিরিয়ে সে দেখল বৃদ্ধা কুরঙ্গীটি প্রবল গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে। সে কিছু বোঝার আগেই কুরঙ্গী আনন্দিত ভঙ্গিতে নৃত্য করতে লাগল। বারংবার তার শরীরে নিজের দেহ ঘর্ষণ করছিল কুরঙ্গী। সে দুহাতে কুরঙ্গীটিকে জড়িয়ে ধরতেই সেই অবলা প্রাণী তার গণ্ডদেশে জিহ্বার স্পর্শ দিচ্ছিল বারংবার। যেন দীর্ঘদিনের অদর্শনের জন্যে জমে থাকা অভিমান এই মুহূর্তে গলে পড়ছিল তার আচরণে। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে সে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল।

প্রথমেই তার নজরে পড়ল নিত্যযত্নের একান্ত অভাবের চিহ্ন সর্বত্র। চাতালটি ধূলিধূসরিত, শুষ্ক পাতায় ছেয়ে আছে। সে একটু উঁচু গলায় এবার ডাকল, পিতৃদেব।'

এবারও কোন সাড়া এল না। নবীন সন্ন্যাসী দ্রুতপায়ে পিতৃদেবের কক্ষে প্রবেশ করল। তার বুঝতে অসুবিধে হল না পিতৃদেব দীর্ঘকাল ওই কক্ষে প্রবেশ করেননি নিজের কক্ষটিকে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল সে। তাহলে কি পিতৃদেব এই আশ্রম পরিত্যাগ করে অরণ্যের অন্য কোথাও আশ্রম নির্মাণ করেছেন? সে উদভ্রান্তের মত বাইরে বেরিয়ে এল কুরঙ্গীটি অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখেই জীর্ণ শরীরে নৃত্য করতে লাগল সে কুরঙ্গীটিকে প্রশ্ন করল, 'পিতৃদেব কোথায়?'

কুরঙ্গী স্থির হল এক মুহূর্ত। তারপর পর্বতের দিকে লক্ষ্য রেখে সামান্য ছুটে গেল। নবীন সন্ন্যাসী সেই দিকে হাঁটতে লাগল। লতাগুল্মে ছাওয়া সেই নিবিড় অরণ্যে কোথাও আশ্রমের চিহ্ন নেই। শরীরের ওই অবস্থায় পিতৃদেবের পক্ষে কি নতুন আশ্রম নির্মাণ করা সম্ভব? সে বিহ্বল হল। তারপর চিৎকার করে পিতৃদেবের নাম উচ্চারণ করে অরণ্যে অরণ্যে দৌড়াতে লাগল। সেই চিৎকার পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে বহুগুণ বর্ধিত হয়ে ফিরে এল। পাখিরা আতঙ্কিত হয়ে বৃক্ষশাখা ত্যাগ করে আকাশে উড়ল। নিরীহ জন্তুরা আশ্রয়ে ফিরে গেল এবং হিংস্ররা নিরাপদ দূরত্ব থেকে সাগ্রহে লক্ষ রাখল।

অপরাহ্নে শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত নবীন সন্ন্যাসী পরিক্রমা বন্ধ করে নদীতটে ফিরে এল। এখন তার কণ্ঠ থেকে স্বর স্পষ্ট বের হচ্ছে না। অনর্গল চিৎকার সেখানেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পিতৃদেব এই অরণ্যে নেই। তবে কি মহারাজ

লোমপাদ তাকে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন ? সে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হল। পিতৃদেব পর্বত অতিক্রম করে চম্পানগরীতে যাওযার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাকে জানিয়েছিলেন মহারাজ। তিনি অতিক্রম কবতে সমর্থ হবেন না বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু কোনপ্রকারে যদি তিনি অতিক্রম করে ফেলেন তাহলে ? মহারাজ তো সেই সংবাদ তাকে দেননি। সে এই অবণ্যে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে কি মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যাতে পিতাপুত্রের সাক্ষাত না হয় ? সে কোন সত্যে পৌঁছাতে পারছিল না।

কিন্তু এখন তার কি করণীয় ? পিতৃদেবেব অন্বেষণ না হৃতক্ষমতার পুনরুদ্ধাব। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ক্ষমতাবিহীন মানুষকে কেউ সম্মান প্রদর্শন করে না। সে উঠে দাঁড়াল। নিচু হয়ে থাকা একটি বৃক্ষেব শাখা তার মুখে স্নেহের স্পর্শ দিল। সে বুক ভবে বাতাস নিতেই অরণ্যের আদিম গন্ধ তাকে প্রশান্ত করল সেই নদীতটে দাঁড়িয়ে সে শুধু আদিগন্ত নিবিড় সলিলধাবা দেখতে পেল। চম্পানগরী থেকে যে তরীটি এসেছিল তার চিহ্ন কোথাও নেই। তৃষ্ণার্ত সে নিচু হয়ে অঞ্জলিভরে জল নিতে গিয়েই সতর্ক হল। হিংস্র জলজন্তুরা ওত পেতে আছে। পিতৃদেব কখনই এই জল ব্যবহাব করতেন না। তৃষ্ণা বড় না প্রাণ ? সে উঠল। আবাব দীর্ঘ অরণ্য অতিক্রম করে তাকে ফিরে যেতে হবে পর্বতেব কাছে, যেখানে প্রস্রবণ বযেছে। সে টলতে টলতে হাঁটছিল। কুবঙ্গীটি তার সর্বসমযের সঙ্গিনী। এই সময তার চোখে সুপক্ক ফল দৃশ্যমান হল। হাত বাড়িযে সেটি গ্রহণ করে মুখে দিল নবীন সন্ন্যাসী। সামান্য কষা স্বাদ কিন্তু ক্ষুধাব মুখে তাই অমৃতের মত। কয়েকটি ফল খাওযাব পর তার শরীব কিঞ্চিৎ স্থির হল। তৃষ্ণার জ্বালাও কমে এল।

যে আসনে বসে সে ঈশ্বরাবাধনা কবত সেখানে বসে সে স্থির হতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই সে মনঃসংযোগ করতে পাবছিল না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পব সে প্রাথমিক স্তর অতিক্রম কবতে পারল মাত্র। কিন্তু সেই অনন্ত শূন্যে কেবলই প্রেত আত্মাব ভিড়। সেই শূন্য অতিক্রম করে সে একসময় বহুদূরের পথ পাড়ি দিতে পাবত কিন্তু এখন সেখানেই পাক খেতে লাগল। সেই প্রেতরা নিজের জ্বালায় জ্বলছে। সর্বত্র কেবল করুণ বিলাপ। বিশালদেহী যমদূতেরা মাঝে মাঝেই এক একজনকে ধবে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তির জন্যে। হঠাৎ সে লক্ষ করল একটি নারী শান্তভঙ্গিতে বসে আছে। এই বিচিত্র আক্ষেপকারীদের মধ্যে সে ব্যতিক্রম। কাছাকাছি হতেই সে চমকে উঠল, বেশঘোষা। সে অবাক হয়ে দেখল বেশঘোষার মনোমুগ্ধকর রূপরাশি এখন নেই কিন্তু তবু তাকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছিল না বেশঘোষার প্রস্তরবৎ ভঙ্গির জন্যে। এই সময় দুজন যমদূত বেশঘোষার কাছে উপনীত হল। একজন স্পর্শ করতে গিয়েও পিছিয়ে এল। দ্বিতীয়জনকে সে প্রশ্ন করল, 'এই রমণীকে আমি স্পর্শ কবতে পারছি না কেন ?'

দ্বিতীয়জন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'রে পাপিষ্ঠা, বল তুই কি পাপ করেছিস ?'

বেশঘোষা মুখ না তুলে জবাব দিল, 'তাকে পাপ বলে কিনা জানি না।'

'পাপ না করলে কেউ এখানে আসে না।' যমদূত জানাল।

'আমি ভাল বেসেছিলাম।'

যমদূতেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। যেন ভালবাসা কতখানি পাপ তা তারা বুঝতে পারছিল না। এই পাপের শাস্তি কি হওয়া উচিত তাও তাদের জানা নেই। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে বলল, 'এই রমণী আপাতত এখানেই থাক। সব কাজ শেষ হবার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করতে হবে।'

সচেতন হতেই নবীন সন্ন্যাসী কুরঙ্গীর স্পর্শ পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অন্তর বেশঘোষার জন্যে হু হু করে উঠল। ভালবাসা কি পাপ? এই উত্তর কে দেবে? ঈশ্বর? তার ঈশ্বরের দর্শন চাই। সে পুনরায় আসনে বসল।

দিন গেল এবং রাতও। নবীন সন্ন্যাসীর শরীর কৃশ থেকে কৃশতর হল। ক্রমশ সেই শরীর থেকে জ্যোতি নির্গত হতে লাগল। একমাত্র কুরঙ্গী ছাড়া অন্য কোন প্রাণী সেই জ্যোতির সম্মুখে আসতে সাহস পেল না। অরণ্যের হিংস্র জন্তুরা যারা লালায়িত হয়েছিল তারাও দূরে সরে যেতে লাগল। নবীন সন্ন্যাসী ক্রমশ স্তর থেকে স্তরান্তরে যাত্রা করল। এক সময় দেবতারা তার সামনে এসে দাঁড়াল। বরুণদেব দুহাত তুলে তাকে আত্মসংবরণ করতে বলে বললেন, 'একবার তুমি আমাকে আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছ। এবার কি চাও?'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'ঈশ্বরের দর্শন।'

'কেন? মুনি ঋষিরা আমাদের দর্শনেই তৃপ্ত হয়। তুমি কেন ঈশ্বরের দর্শন চাইছ?'

'কারণ যে প্রশ্নের উত্তর আমার দরকার তা তোমাদের জানা নেই।'

'কি সেই প্রশ্ন?'

'ভালবাসা কি? দেবতারা ভালবাসার মর্ম বোঝে না। মানুষই তা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তারাও জানে না ভালবাসা কি! একমাত্র ঈশ্বরই এর ব্যাখ্যা করতে পারেন।'

'এই প্রশ্নের উত্তর তো একদিনে পাওয়া সম্ভব না। তুমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতার্জন করেছ। এই প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেলে তোমার জীবদেহে ফিরে যাওয়া অনর্থক হয়ে যাবে। একদা তুমি তোমার পিতৃদেবকে যে কারণে স্বার্থপর বলে মনে করতে তুমি কি সেই কারণটির পুনরাবৃত্তি করবে না? স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য, পুত্রের প্রতি তোমার দায়িত্ব এবং পিতার প্রতি তোমার সেবা তুমি কি উপেক্ষা করছ না? রোহিণী যেমন শশধরের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের তেমনি শান্তা তোমার প্রণয়িনী। হে ঋষি, তুমি নিজের জীবন দিয়ে যদি ওই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেষ্টা কর তাহলে কি সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ হয় না!'

চেতনা ফিরে আসতে বিলম্ব হল। নবীন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠে বসল। কিছুক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকার পর তার আবার ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ হল। সে উঠে বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করে মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলল। কি কষায় স্বাদ! এই ফল সে এতকাল কি করে ভক্ষণ করেছে? সে অন্য জাতের ফল সংগ্রহ করল। এতে শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে কিন্তু প্রাণের আরাম হয় না। রসনা অতৃপ্ত থাকে। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাজপ্রাসাদে পরিবেশিত কত রকমের খাদ্যদ্রব্য। সেগুলোর স্বাদের জন্যে সে লালায়িত হয়ে উঠল। কিছুতেই

অরণ্যের ফল এবং মূল তার রুচিতে আসছিল না। সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পর্বতের নিকট গেল। আর সেই সময় একটি বৃদ্ধ শার্দুল প্রবল হুঙ্কারে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। সে হুঙ্কারধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকাতেই দেখতে পেল শার্দুলটি ভস্ম হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে এক ধরনের পুলক জন্ম নিল। তবে কি তার ক্ষমতা ফিরে এসেছে? দেবতারা কি তার কথা শুনবে এই সময়?

দ্রুতগতিতে সে আশ্রমে ফিরে এসে কামনা করল নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের যা সে রাজপ্রাসাদে খেয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না। তার মনে পড়ল পিতৃদেবের কথা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে ক্ষমতার প্রয়োগ করলে তপঃক্ষয় হয়। অতএব এ চেষ্টায় সে বিরত হল। কিন্তু ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। অথচ অরণ্যের ফল তার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হচ্ছে না। পাখির কূজনের চেয়ে দাসীদের সঙ্গীত অনেক আকর্ষণীয় বোধ হচ্ছে। রাজপ্রাসাদের আরামের চাইতে এই অরণ্যে বাস করায় কোন আনন্দ নেই। সে যে এতকাল এখানে কি করে বাস করেছিল তা ভাবতেই বিস্মিত হচ্ছিল। কিন্তু খুব শীঘ্র চম্পানগরীর তরীর এখানে আগমনের সম্ভাবনা নেই। ওই হিংস্র জলচরবেষ্টিত নদী অতিক্রম করার সাধ্য তার নেই। একমাত্র পিতৃদেব যে পথে গমন করেছেন সেই পথ অনুসরণ করলে তবে চম্পানগরীতে প্রবেশ করা যায়। আর সেখানে পৌঁছালেই সমস্ত সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। মোহিনী শান্তার জন্যে সে আকর্ষণ বোধ করল। এবং সেই সঙ্গে আর একটি বিচিত্র অনুভূতির জন্ম নিল তার হৃদয়ে। শান্তার শরীরে যে পুত্র আসছে সে তো তারই পুত্র। সে সৃষ্টি করেছে। তারই কামনা থেকে উদ্ভূত সন্তানের মুখদর্শনের জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

প্রবল আকর্ষণ তাকে তাড়িত করে নিয়ে এল পর্বত সানুদেশে। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ বিস্মরিত হয়ে সে পর্বত অতিক্রমের চেষ্টা করতে লাগল। কুরঙ্গীটি তার সঙ্গিনী হয়েছে এবার। বিশ্রামের জন্যে স্থির হতেই তার হৃদয়ে শান্তার মুখের সঙ্গে আর একটি অদেখা শিশুর মুখ অস্পষ্ট প্রতিভাত হয় : কিন্তু তাদের সরিয়ে দিয়ে প্রস্তরবৎ বেশঘোষা চলে আসে সামনে। সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নির্জন পর্বতে সেই কান্না পাক খায়। আর অবসন্ন কুরঙ্গী তার শরীরে মাথা ঘষে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

দ্বিতীয় দিনে তারা যখন পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশে তখন সে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। দীর্ঘ সময় ওই অবস্থায় থেকে সে কোনরকমে উঠে বসে চারপাশে তাকাল। শুধু শুষ্ক কাঠ এবং গুল্মাদি ছাড়া আশেপাশে কিছু নেই। এই মুহূর্তে অরণ্যের সেই সব ফল পেলেও সে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাত। যে কোন রকমের খাদ্যদ্রব্য এখন তাকে শান্তি দেবে। কিন্তু ফলের গাছ সে ফেলে এসেছে অনেক নিচে। এখন পর্বতের যে স্থানে তারা রয়েছে সেখানে কোন প্রস্রবণও নেই। তার শীত করছিল। প্রস্তরে প্রস্তরে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে সে শুষ্ক কাঠগুলো প্রজ্বলিত করে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করল। তার মনে পড়ল নগরের মানুষেরা অগ্নিকে ব্যবহার করে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে। পিতৃদেবের নিশ্চয়ই সেই বিদ্যা রপ্ত ছিল না। তিনি শুধু ফল এবং মূল ভক্ষণ করে গিয়েছেন, মৎস্য মাংসের স্বাদ গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলেন। সে চারপাশে তাকাল। এই স্থানে মৎস্যের কোন সম্ভাবনা নেই কিন্তু মাংসের অভাব হবার কোন কথা নয়। পর্বতে অনেক শশক থাকে। শান্তা

তাকে একবার শশকের মাংস খাইয়েছিল। সে উঠল। চারপাশে সামান্য সন্ধান করতেই তার মস্তকে দুর্বলতাজনিত লক্ষণ স্পষ্ট হল। সে আবার বসে পড়ে অসহায়ভাবে অনেক নিচের অরণ্যে বন্যজন্তুদের কোলাহল শুনতে লাগল। কুরঙ্গের চিৎকার কানে আসতেই তার মনে পড়ল একদা শান্তা সুস্বাদু কুরঙ্গের মাংস নরম আগুনে ঝলসে পরিবেশন করেছিল, এবং তার তুলনা সে খুঁজে পায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওইসব দ্রুতগামী কুরঙ্গের সন্ধান পাওয়া তার দ্বারা অসম্ভব। সে কাছাকাছি পৌঁছাতে চাইলে আবার এই বিশাল পর্বত থেকে নামতে হবে। সে তাদের ভস্ম করতে পারে কিন্তু তাতে মাংস পাওয়া যাবে না।

দিশেহারা ক্লান্ত নবীন সন্ন্যাসী মুখ ফেরাতেই স্পর্শ পেল। বয়োবৃদ্ধা কুরঙ্গীটি অবসন্ন চোখে তার দিকে তাকাল। সে ঝটপট উঠে বসল। এই কুরঙ্গীটিকেই তো ভক্ষণ করা যায়। যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছে এর। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এখন অর্থহীন এর। বরং এই প্রাণীটিকে হত্যা করে সে নিজেকে জীবিত রাখতে পারে।

সে একটি তীক্ষ্ণ ধারালো প্রস্তরখণ্ড খুঁজে নিল। কুরঙ্গীটি দুই পা মুড়ে আর একটি প্রস্তরের ওপর তার মাথা রেখেছিল। আঘাত পাওয়ার মুহূর্তে সে শুধু করুণ চোখে একবার তাকাতে পারল। তারপর যখন তার উষ্ণ রক্তধারা ফিনকি দিয়ে উঠেছে তখন আকাশবাণী হল, 'আমি দেবকন্যা। এতকাল স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলাম। ভগবান ব্রহ্মার আদেশে আজ বিমুক্ত হলাম।'

নবীন সন্ন্যাসী কাউকে দর্শন করল না। কিন্তু সে বুঝতে পারল কোন দেবকন্যাই এই কুরঙ্গীরূপে এতকাল তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। মৃত এই কুরঙ্গীর মাংস ভক্ষণে তার দ্বিধা হচ্ছিল। কিন্তু সেই দেবকন্যা যখন ইতিমধ্যেই বিমুক্ত তখন এই মাংস ভক্ষণে আপত্তি কি! সে আগুনে ঝলসে যখন উদরপূর্তি ঘটাচ্ছিল তখন মনে হল এর স্বাদ শান্তার পরিবেশিত কুরঙ্গ মাংসের মত হয়নি। এর পেছনে যে কলা আছে তা তার জানা নেই। কিন্তু যা হোক, তার শরীরে আবার বল ফিরে এল। শান্ত চিত্তে সেই রাত্রে নিদ্রামগ্ন হল নবীন সন্ন্যাসী।

পর্বতাতিক্রমের শ্রান্তিতে মুহ্যমান নবীন সন্ন্যাসী যখন কোনক্রমে লোকালয়ে এসে পৌঁছাল তখন গোপগণ তাকে দেখে বিস্মিত হল। মহারাজ লোমপাদ তাদের জানিয়েছিলেন মহামতি ঋষি বিভাণ্ডক এই পথে যাবেন। তিনি অত্যন্ত পুলকিত হয়ে পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে এখন অবস্থান করছেন। বিভিন্ন লোকালয়ে সেবা গ্রহণ করে চম্পানগরীতে পৌঁছাতে তাঁর এখনও দেরি আছে। মহারাজ নির্দেশ দিয়েছেন প্রভূত সেবা প্রদর্শন করে বিভাণ্ডকের সময় হরণ করতে। কিন্তু এই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা তাদের কেউ বলেনি। মুখোমুখি হয়ে স্থানের সঠিক নির্দেশ অবগত হবার জন্যে নবীন সন্ন্যাসী প্রশ্ন করল, 'হে মানবসকল, তোমরা আমাকে বল এই স্থান কার অধিকারে?'

গোপগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলল, 'এই স্থান, এই সমস্ত পশু মহাঋষি বিভাণ্ডকের পুত্র আমাদের রাজা লোমপাদের জামাতার অধিকৃত। আমরা তার আজ্ঞাবাহী দাস। কিরকম প্রিয়কর্ম সম্পাদন করতে হবে তা আজ্ঞা করুন।'

নবীন সন্ন্যাসীর কৌতুকবোধ হল। একি কথা শুনছে সে। এই সমস্ত স্থান কি

আমার অধিকারে ? কি করে হল ? কে তাকে এই ক্ষমতা দিল ? মহারাজা লোমপাদ ? সে খুব খুশি হল। তারপর আত্মসংবরণ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমরা বল মহর্ষি বিভাণ্ডককে কি এই পথে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ।' গোপপ্রধান উত্তর দিল, 'তিনি আপনার চেয়ে শ্রান্ত হয়ে পর্বত অতিক্রম করে এসেছিলেন। তিনি যখন জানলেন এই সমস্ত স্থান তাঁর পুত্রের অধিকৃত তখন খুশি হয়ে আমাদের সেবা গ্রহণ করলেন। এখন তিনি পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে অধিষ্ঠান করছেন। শীঘ্রই তিনি চম্পানগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।'

নবীন সন্ন্যাসী পুলকিত হল। পিতৃদেব এত কাছে আছেন ? প্রথমেই তার ইচ্ছে হল ওই মুহূর্তে তাঁর কাছে ছুটে যেতে। তারপরেই দ্বিতীয় চিন্তা প্রবল হল, মুখোমুখি হলে পিতৃদেব কি আচরণ করবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা অবশ্যই বিস্ময়ের, তিনি পর্বতাতিক্রমের ক্লেশ সহ্য করেও এই সমস্ত জনপদেই অবস্থান করছেন, এখনও চম্পানগরীর উদ্দেশে ছুটে যাননি। যাই হোক, বিপদ যত বিলম্বে আসে ততই মঙ্গল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মহর্ষি বিভাণ্ডক সর্বদাই কোপানল বহন করে বেড়ান। তিনি এখানে কিরকম জীবন যাপন করছেন ?'

গোপপ্রধান বলল, 'তিনি যেরকম জীবনযাপন করছেন তা মহারাজ লোমপাদের ঈর্ষার বিষয় হবে। আমরা তাঁর জামাতাকে দর্শন করিনি। শুনেছি সেই ঋষিপুত্রের অনুগ্রহেই অঙ্গদেশ শস্যশ্যামলা হয়েছে। অতএব সেই জামাতার পিতাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে রাজকীয় সুখে রাখতে আমরা কার্পণ্য করিনি।'

'রাজকীয় সুখ ?' নবীন সন্ন্যাসী বিভ্রান্ত হল।

'হ্যাঁ। এদেশে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ফলমূল, নির্বাচিত প্রাণীদের সুস্বাদু মাংস, কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধে তৈরি পরমান্ন থেকে শুরু করে মনোহর সুপেয় পানীয় তিনি গ্রহণ করেছেন। একমাত্র তাঁর সাধনার সময় ব্যতিরেকে সুমিষ্ট সঙ্গীত দাসীরা তাঁকে পরিবেশন করত। কিছুদিন এই জনপদে অবস্থান করেই তাঁর শরীর কিঞ্চিৎ পেলব হয়েছে।'

নবীন সন্ন্যাসী আপনমনে উচ্চারণ করল, 'আশ্চর্য !'

'হে সন্ন্যাসী ! এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। পুত্রের অর্জিত ধন ভোগ করলে পিতার তৃপ্তি হয়। এই তৃপ্তিলাভে কোন ধর্মক্ষয় হয় না। সুপুত্রের পিতা হওয়ার এইটুকুই সুবিধে। যা হোক, এবার আপনি যদি আপনার পরিচয় দান করেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হই।' গোপপ্রধান করজোড়ে বলল।

নবীন সন্ন্যাসী হাসল, 'তোমরা এত জানো আর আমি কে বুঝতে পারছ না ?'

গোপগণ নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারপর প্রধান সাহস করে বলল, 'না। আমাদের ক্ষমা করবেন। ওই পর্বতে কোন সন্ন্যাসী বাস করতে সাহসী হন না। ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু এবং রাক্ষসরা প্রায়ই এই অঞ্চলে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মহর্ষি বিভাণ্ডক পর্বতের অপর প্রান্তে ছিলেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলেই ওই দুর্গম পর্বত অতিক্রম করে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু আপনি কে ? সর্বাঙ্গে রক্তের চিহ্ন বহন করে কোন সন্ন্যাসী তো কখনও আমাদের

দর্শন দেননি ! আপনি কি রাক্ষস অথবা পশুদের দ্বারা আক্রান্ত ?'

নবীন সন্ন্যাসী হাসল, 'তোমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আমি বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র, মহারাজ লোমপাদের কন্যা শান্তার স্বামী।'

সঙ্গে সঙ্গে গোপপ্রধানদের মুখে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নবীন সন্ন্যাসী তাদের চোখে স্পষ্ট সন্দেহ দেখতে পেল। শেষ পর্যন্ত গোপপ্রধান বলল, 'হে সন্ন্যাসী, অপরাধ মার্জনা করবেন। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, সন্ন্যাসীর কি অসত্যভাষণ করা উচিত ?'

নবীন সন্ন্যাসী তীব্র গলায় উচ্চারণ করল, 'তার মানে ?'

'আপনি বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র নন।'

'কি স্পর্দ্ধা! তুমি আমার জন্মপরিচয় অস্বীকার করছ ? এই মুহূর্তে তোমাকে আমি ভস্ম করে দিতে পারি তা জানো ?'

'আপনি সন্ন্যাসী, নিশ্চয়ই তা পারেন। কিন্তু অকারণে শাস্তি দেওয়া কি উচিত ? মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্রের যে কাহিনী আমরা এতকাল শুনে এসেছি, এমন কি তাঁর নিজের মুখে সেই পুত্রের যে বর্ণনা আমরা শুনেছি তার সঙ্গে আপনার কোন সামঞ্জস্য নেই।'

মুহূর্তেই ক্রোধ রূপান্তরিত হল বিস্ময়ে, 'কি শুনেছ তোমরা ?'

গোপপ্রধান বলল, 'তিনি নিরামিষাহারী ছিলেন, এবং জীবহত্যার বিরোধী। যেহেতু আপনাকে কোন রাক্ষস অথবা পশু আক্রমণ করেনি তাই বোধ হচ্ছে আপনিই জীব হত্যা করেছেন, আপনার বল্কল রক্তাক্ত।'

'মূর্খ! রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে আমার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়েছে।'

'বেশ। কিন্তু আপনার ললাট আমাদের মত মসৃণ। আপনি যদি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র হবেন তাহলে আপনার ললাটে একটি শৃঙ্গ থাকতই যা যাবতীয় মানুষদের থেকে আপনাকে আলাদা করে চিহ্নিত করত।' গোপপ্রধান সরাসরি বলে ফেলল।

নবীন সন্ন্যাসী চকিতে নিজের ললাট স্পর্শ করল। একি! তার ললাট যে অতীব মসৃণ, কোথাও শৃঙ্গের অস্তিত্ব নেই। সে ব্যাকুল হয়ে নিজের কেশরাজিতে হাত বোলাল। ভগ্ন শৃঙ্গটি যে স্থানে পীড়াদায়ক অবস্থায় ছিল সেখানে এখন তৈলাক্ত স্বেদ ফুটে উঠেছে। বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমাকে তোমরা একটা মুকুর এনে দাও।'

গোপগণ ছুটোছুটি করে মুকুর এনে দিল তাকে। নবীন সন্ন্যাসী সেই মুকুরে নিজের মুখদর্শন করল। ক্লান্ত, শুষ্ক মুখে কোথাও শৃঙ্গ নেই। কিন্তু ক্লান্তির ছাপ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে পরমসুন্দর বলে মনে হচ্ছে। শৃঙ্গের অনুপস্থিতি তার রূপের মাত্রা বহুগুণ বর্ধিত করেছে। নিজের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেই মোহিত হয়ে পড়ছিল সে। গোপগণ সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তারা লক্ষ করল নবীন সন্ন্যাসীর মুখে ছিটকে আসা রক্তের দাগ যা এখন শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে তা এতক্ষণে তার নজরে পড়েছে। এই সন্ন্যাসী যদি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র না-ও হন তবে খুব সামান্য কেউ নন বলে তাদের বিশ্বাস হল।

গোপগণের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শরীরে সব বল সংগ্রহ করে, বল্কল ত্যাগ করে শোভন পরিধানে দ্রুতগামী রথে নবীন সন্ন্যাসী রাজধানী চম্পানগরীর

উদ্দেশে যাত্রা করতে যখন উদ্যত তখন সংবাদ এল রাক্ষসরা আবার নেমে এসেছে রাজ্যের সীমানায়। যথেচ্ছ গবাদি পশু লুণ্ঠন করছে তারা। যে সমস্ত সীমান্তপ্রহরী বাধা দিতে গিয়েছিল তারাও পরাস্ত হয়েছে।

গোপপ্রধান বিনীত স্বরে বলল, 'হে সন্ন্যাসী, মহারাজা লোমপাদের আদেশ বলে এই সব অঞ্চল, পশু এবং প্রজারা মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্রদ্বারা অধিকৃত। আপনি যদি সেই ঋষিপুত্র হন তাহলে রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করা আপনার পবিত্র কর্তব্য।'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'বেশ। তোমরা আমাকে রাক্ষসদের কাছে নিয়ে চল।'

পথ প্রদর্শকদের অনুসরণ করা কালীন নবীন সন্ন্যাসীর মনে ভয় জন্ম নিল। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলাটা কি উচিত কাজ হয়েছে। সে একা রাক্ষসদের সঙ্গে কি যুদ্ধ করবে? তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যায় তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই এমনকি সে জানে না শৃঙ্গচ্যুতির পর থেকে তার তপঃশক্তি কার্যকর কিনা। কিন্তু এতদূর এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। সে ঠিক করল প্রচুর আস্ফালন দেখাবে। ভঙ্গি দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়তো সম্ভব।

শত শত রাক্ষস তখন গোহরণ এবং রক্ষী হত্যার আনন্দে বুঁদ হয়ে ছিল। হঠাৎ রথে চেপে একটি মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা অবাক হল। এত সাহস কার। সামনে উপস্থিত হয়ে নবীন সন্ন্যাসী রথের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম রাক্ষসদের দর্শন করল। ভীষণদর্শন কুৎসিৎ জীবদের দেখে তার ক্রোধের উদ্রেক হল। সে চিৎকার করে বলল, 'রে পাপিষ্ঠগণ, তোরা যদি অবিলম্বে অঙ্গদেশ ত্যাগ না করে যাস তাহলে প্রাণবায়ু ত্যাগ করতে হবে।'

রাক্ষসদের প্রধান বলল, 'কে তুমি চাঁদ? বেশ তো দেখতে। এসো তোমাকে দিয়ে আজকের খাবারটা শুরু করি।' সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে বসা এক রাক্ষসী নাকি গলায় কেঁদে উঠল, 'না না তুমি না। ওই রূপবান জটামণ্ডধারী সুকুমারকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।' রাক্ষসরা হেসে উঠে সম্মতি জানাল। আর তখনই সেই কুরূপা তাম্রকেশা কর্কশকণ্ঠী রাক্ষসী পরমাসুন্দরী রমণীতে নিজেকে রূপান্তরিত করে নবীন সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে গেল, 'কে তুমি তপস্বীর বেশে এই স্থানে এসেছ, তুমি যেই হও না কেন তোমাকে দেখে কামমোহিত হয়েছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ কর তাহলে তোমার আর প্রাণসংশয় হবে না।'

নবীন সন্ন্যাসী চিৎকার করে উঠল, 'রে পাপিষ্ঠা, তুই আমাকে ভোলাতে এসেছিস?' তখন মোহিনীবেশ ত্যাগ করে রাক্ষসী তার দিকে ধাবিত হতেই নবীন সন্ন্যাসীর অগ্নিদৃষ্টি পড়ল তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসদের মধ্যে আতঙ্কজনিত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। তারা চোখের সামনে রাক্ষসীর শরীর ভস্ম হয়ে যেতে দেখল। মুহূর্তেই প্রাণভয়ে শত শত রাক্ষস পালাতে লাগল অঙ্গদেশ ছেড়ে।

দূরে যেসব গোপ দৃষ্টির অগোচরে থেকে এসব লক্ষ করছিল তারা এবার নবীন সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি দিতে লাগল। তৃপ্ত নবীন সন্ন্যাসী কালবিলম্ব না করে চম্পানগরীর উদ্দেশে যাত্রা করল। মহর্ষি বিভাণ্ডকের পৌঁছানোর আগেই তার সেখানে পৌঁছাতে হবে। দ্বিতীয়ত সে এখন মহারাজ লোমপাদকে বলতে পারবে তাঁর রাজ্য বিপদমুক্ত। মহারাজা যখন রাজকন্যার সঙ্গে রাজ্যের একাংশের

অধিকার তাকে অর্পণ করেছেন তখন এই উপকার পেয়ে খুশি হবেন। তার চিত্ত চঞ্চল হচ্ছিল। রাজকুমারী শান্তা তাকে আকর্ষণ করছিল। মনে হচ্ছিল দীর্ঘকাল সেই পরম রমণীয় সমুদ্রে সে অবগাহন করেনি। সে এই মুহূর্তে বেশঘোষার কথা বিস্মরিত হল। চারপাশের মানুষদের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল কোন অবস্থাতেই সে অমানবিক কাজকর্ম করে কারো কাছে হাস্যাস্পদ হবে না।

চম্পানগরীতে সে যখন প্রবেশ করল তখন দিন প্রায় শেষ। যদিও রথে উপবিষ্ট ছিল তবু পথশ্রম কিছু কম হয়নি। নগরীর এই প্রান্ত সে কখনও দ্যাখেনি। এখন অবাক হল। ছিন্নবেশ মানুষেরা শীর্ণ শরীর নিয়ে পথে ভিক্ষে করছে। একটি মৃত মানুষকে ঘিরে কিছু রমণী ক্রন্দন করছে। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধবৃদ্ধারা অসহায়ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। চারিদিকে হতশ্রী, দারিদ্র্যের চিহ্ন। তার রথের দিকে তারা কৌতূহলী চোখে তাকাল কিন্তু কেউ সমীহ প্রদর্শন করল না। যেন তারা তাকে চিনতেই পারল না। সে রথ থামিয়ে চারপাশে তাকাতেই ভিখিরিরা ছুটে এল। তারা কাতর গলায় ভিক্ষা চাইতে লাগল। নবীন সন্ন্যাসীব হৃদয়ে কান্না জন্ম নিল। আহা, মানুষের কি কষ্ট। সে কি এদের কষ্ট দূর করতে পারে না ? তার দুই চোখ কি শুধু ক্রোধই উৎপাদন করবে ? পরমুহূর্তেই মনে হল সেই চেষ্টা করলে তার তপঃক্ষয় হতে পারে। বরং মহরাজ লোমপাদকে অনুরোধ করা উচিত কাজ হবে যাতে তিনি এদের দুর্দশা দূর করেন।

রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে সে বিপরীত দৃশ্য দেখতে পেল। সুন্দর অট্টালিকা, মনোহর বাগিচা, ধনবান সুপুরুষেরা যাতায়াত করছে সড়কে। সর্বত্র শান্তি বিদ্যমান। দ্বারী তাকে দেখে অবাক হল। বারংবার তারা তার ললাটের দিকে তাকাল। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'মূর্খের দল, তোমরা আমাকে চিনতে পারছ না ?'

মুহূর্তেই চারপাশে সাড়া পড়ে গেল। মহারাজ লোমপাদ ছুটে এলেন। জামাতাকে এই অবস্থায় দেখে তিনি যার পর নেই, বিস্মিত হলেন। যদিও তিনি করজোড় করলেন না তবু তাঁর গলার সম্ভ্রম ফুটল, 'কি আশ্চর্য। আপনি ?'

'হ্যাঁ। পর্বত অতিক্রম করে এসেছি। তোমার কন্যা কোথায় ?'

'সে অন্তঃপুরে। আপনার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।'

'কিরকম ?'

'আপনাকে অবিকল আমাদের মত দেখতে লাগছে।'

'তাহলে কি তুমি দুঃখিত হচ্ছ ?'

'না, না। এত তাড়াতাড়ি আসবেন জানলে আমি রাজতরী পাঠাতাম। কি সৌভাগ্য।'

'শোন, অঙ্গদেশে আর রাক্ষসরা অত্যাচার করবে না। তাদের আমি ধ্বংস করেছি।'

মহারাজ এবার প্রণত হলেন, 'আমি গর্বিত।'

'কিন্তু রাজধানীতে প্রবেশ করে কিছু লোকের দুর্দশা দেখে আমি ব্যথিত। অবিলম্বে তাদের দুঃখকষ্ট মোচন কর।' নবীন সন্ন্যাসী অদেশের ভঙ্গিতে বলল। মহারাজ লোমপাদের ললাটের রেখা গভীর হল, 'আপনি কোন পথে নগরীতে প্রবেশ করেছেন ?'

'উত্তর দিক দিয়ে। এখানে এত বৈভব, এত আলোকিত মুখমণ্ডল কিন্তু ওখানে অন্ধকার কেন?'

নবীন সন্ন্যাসীর প্রশ্ন শুনে মহারাজ হাসলেন, 'হে সন্ন্যাসী, আপনি সংসারসাধনায় নবীন। সংসার সাধনার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হল রাজনীতি। আপনি এর ব্যবহার ও রূপ সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। রাজনীতিতে হৃদয়াবেগের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। চোখের সামনে নিহত পুত্রের মৃতদেহ দেখা সত্ত্বেও এখানে মায়ের হাহুতাশ করা মানায় না। আজ যে মিত্র কাল তাকে নির্দ্বিধায় সরিয়ে দিতে হয়। মিত্রের মিত্রকে নিজের মিত্র না করলে এখানে বাঁচা অসম্ভব। রাজনীতি হচ্ছে সেই জিনিস নিজের আচরণের সঙ্গে আসল পরিকল্পনার কোন মিল থাকবে না। যে শক্তিশালী তাকে লোকচক্ষুর সামনে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে লোকচক্ষুর বাইরে মিত্র হিসেবে স্থির রাখতে হবে। এ অতি জটিল বস্তু। আপনি অযথা এ নিয়ে ভাববেন না। ওখানে যাদের দেখে এলেন তারা সেই ধরনের জনতা যাদের শরীরে মেরুদণ্ড নেই। ওদের ঘামেই আমাদের উষ্ণ বাতাস শীতল হয়। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।'

নবীন সন্ন্যাসী এসব কথার কোন অর্থই বুঝতে পারল না। হয়তো কোন জটিল শাস্ত্র, নাগরিক জীবনবেদ যার কিছুই তার জানা নেই এমন কিছু। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি জানেন আমার পিতৃদেব মহর্ষি বিভাণ্ডক অরণ্য ত্যাগ করে পর্বতাতিক্রমের পর গোপগণের গ্রামে অবস্থান করছেন? তাঁর উদ্দেশ্য এখানে আসা, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা?'

মহারাজ লোমপাদ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, এ খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। যে ঋষি এতকাল কৃচ্ছ্রসাধনে মগ্ন ছিলেন তিনি একটু সেবা গ্রহণ করতে পারেন বইকি। তাঁর অভ্যর্থনার সমস্ত দায়িত্ব আমার। আপনি এ নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। তিনি নগরদ্বারে উপস্থিত হওয়ামাত্র আমি আপনাকে সতর্ক করে দেব। আপনি পথশ্রান্ত। যান, অন্তঃপুরে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দাসীরা অপেক্ষা করে আছে।'

নবীন সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ লঘুমনে স্থান ত্যাগ করামাত্র মন্ত্রী নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'মহারাজ, অপরাধ যদি না নেন তাহলে একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

মহারাজ লোমপাদ নীরবে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালেন।

মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'আমি কখনও শুনিনি জামাতা কখনও শ্বশুরকে তুমি এবং শ্বশুর জামাতাকে আপনি বলে সম্বোধন করে। এর রহস্য কি?'

মহারাজ লোমপাদ হাসলেন, 'তুমি সদ্য মন্ত্রী হয়েছ। এত শীঘ্র যদি রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায় তাহলে—।'

মন্ত্রী হতচকিত হয়ে বললেন, 'এর মধ্যেও রাজনীতি আছে?'

'যে যেভাবে দ্যাখে। যাও, সংবাদ নাও, বিভাণ্ডক এখন কতদূরে।' মহারাজা আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। কিন্তু নির্জনে পৌঁছেই তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন। সত্যি তো, সেদিনের বালক তাঁকে তুমি বলে আর তিনি ওকে আপনি বলে যাচ্ছেন। নাঃ। যখন ঋষিপুত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন তখনকার কথা আলাদা। এখন যা সম্পর্ক তাতে পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করাই উচিত।

শৃঙ্গত্যাগের পর সেটা এখন আরও সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু সব কিছু কি সহজ হল ? ঋষিপুত্র এখন যদি বড় বেশি মানুষের মত আচরণ শুরু করে ?

রাজকুমারী শান্তার চক্ষু বিস্ফারিত, হৃদয়ে কল্লোল, অঙ্গে অঙ্গে পুলকের বিস্ফোরণ। এ কে ? এই অপূর্ব রূপবান পুরুষ কি তার স্বামী ? সেই কুৎসিত শৃঙ্গ কোথায় যা দেখে একদা তার হৃদয় বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। আহা, যেন কার্তিকের গর্ব ম্লান করে নবীন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। দ্রুত শয্যা ত্যাগ করতে যাচ্ছিল সে, দাসীরা বাধা দিল, 'না-না, অত ব্যস্ত হবেন না রাজকুমারী।'

শান্তা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করল, 'আঃ। তোমরা এখানে এখনও কেন ? যাও!' দাসীরা হাসি সংবরণ করতে করতে কক্ষান্তরে চলে গেলে শান্তা কোনমতে উচ্চারণ করল, 'প্রিয়, তুমি এত সুন্দর হলে কি করে ? আহা! দেখে দেখে আমার আশ মেটে না যে।'

'প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে।' দ্বার ত্যাগ করে এগিয়ে এল নবীন সন্ন্যাসী, 'তবে প্রশংসার বাহুল্য যে ভার সৃষ্টি করে তা কিন্তু কম নয় প্রিয়ে।'

'না, মোটেই বাহুল্য নয়। তোমার ললাটের সেই শৃঙ্গ যেন এতদিন পূর্ণিমার ওপর অমাবস্যার ছায়া ফেলে রাখত। আজ তুমি রাহুমুক্ত। কোন সাধনায় তুমি এই সাফল্য পেয়েছ ?'

নবীন সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল, 'জানি না। তোমার বিরহের ভার আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ধ্যানে জাগরণে শয়নে স্বপনে শুধু তোমার ওই মুখচন্দ্রিমা দর্শন করতাম। বোধ হয় তা থেকেই আমার এই পরিবর্তন। প্রিয়ে, আমি ফিরে আসায় তুমি খুশি হওনি ?'

শান্তা হাসল, 'এই প্রশ্ন করতে হয় ? প্রতিটি দিন যেন একটি বৎসরের মত ভারবহ হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। শুধু।' শান্তা কথা সম্পূর্ণ না করে মুখ নামাল।

নবীন সন্ন্যাসী তার পাশে এসে বলল, 'কিন্তু তোমাকে এত কৃশ দেখাচ্ছে কেন ? কেন শীতের ছোঁয়ায় যেমন অরণ্যের ঔজ্জ্বল্যে ম্লানতা মেশে তোমার মধ্যে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি ?'

'কোথায় ? আমি তো ভালই আছি।' শান্তা চক্ষু বন্ধ করে অধরযুগল এমন ভঙ্গিতে স্ফুরিত করল যে নবীন সন্ন্যাসী ঝরনার মত সেই অধরে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্তা নিজেকে সরিয়ে নিল, 'না।'

নবীন সন্ন্যাসী বিহ্বল, 'কি হল ?'

শান্তা উদাসী হবার ভান করল, 'কে জানে, এখান থেকে যাওয়ার পর আর কোন নারীর শরীরে তুমি আবার আনন্দ খুঁজতে গিয়েছ কিনা।'

'আশ্চর্য! অরণ্যে আমি নারী পাব কোথায়। এখানে আসার সময় এক রাক্ষসী কুহকী মায়া বিস্তার করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে ভস্ম করেছি। তুমি একথা বলো না প্রিয়ে।'

নবীন সন্ন্যাসী দু'হাতে শান্তার মুখ ফেরাতে চাইল। সেই অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে শান্তা দু চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে বলল, 'শুনলাম নদীপথে নাকি কে এক

সুন্দরী মেয়ের জন্যে তুমি সময় ব্যয় করেছো। সেটা কি মিথ্যে?'

নবীন সন্ন্যাসীর চোখের সামনে বেশঘোষার মুখ ভেসে উঠল। তার শরীরে এবং হৃদয়ে একটা কম্পন উঠছিল কিন্তু অতি দ্রুত সে সেটাকে অতিক্রম করতে পারল, 'দূর। সে তো একটা উন্মাদিনী। দস্যুরা তাকে ফেলে রেখে দিয়েছিল প্রান্তরে। তার কাছে গেলে সে আমাকে দংশন করত। কৌশকীর সলিলে তার সমাধি হওয়ায় আমি মাল্লাদের বললাম সৎকারের ব্যবস্থা করতে।'

শান্তা এবার মুখ ফেরাল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল মানুষটির শুধু শারীরিক পরিবর্তন নয় আরও অনেক কিছু যেন আমূল পাল্টে গিয়েছে। সে অবাক হয়ে নবীন সন্ন্যাসীর মুখ দর্শন করছিল। কিঞ্চিৎ ধন্দ নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল তোমার?'

শান্তা মাথা নাড়ল, 'কিছু না। কতকাল পরে দেখছি, প্রাণভরে দেখি।'

নবীন সন্ন্যাসী উষ্মা প্রকাশ করল এবার, 'তুমি আমার ওপর অবিচার করছ!'

'আমি? কিভাবে?' শান্তা বিস্মিত।

হাত বাড়িয়ে শান্তার শরীর আবৃত করা নানান পোশাক স্পর্শ করল নবীন সন্ন্যাসী, 'কতকাল পরে এলাম। আমার স্বর্গমর্ত্যপাতাল এখন তোমাতে স্থির। আর তুমি যতরকম আবরণে নিজেকে আড়াল করেছ। আমি তোমার এই রূপ দেখতে চাই না। তুমি কৃপা করে আবার আমায় ভুবনমোহিনীমায়ায় ভরিয়ে দাও।'

শান্তা মুখে হাত চাপা দিল, 'নাঃ। দোহাই সে লজ্জায় আমাকে ফেলো না।'

'লজ্জা! আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা?'

'না-না। তা নয়।'

'তাহলে? কোথায় সেই তোমার সূক্ষ্ম বসন যা দেখা এবং অদেখায় লুকোচুরি খেলত। যে সাজে তোমাকে আমি প্রথম মিলনরাত্রে দেখেছিলাম সেই সাজে দেখতে চাই।'

'অবুঝ হয়ো না প্রিয়ে। এখন তা সম্ভব নয়। আমি, তুমি দেখছ না, আমি শয্যাত্যাগ করছি না। এখন আর আমি আমার নই।' শান্তা সলাজ তাকাল।

'মানে?'

'তোমার দানে আমি সমৃদ্ধ। তোমার সৃষ্টিকে পূর্ণরূপে ধরণীতে নিয়ে আসাই আমার একমাত্র ব্রত। চেয়ে দ্যাখো। এখানে সে আছে। সময় উপস্থিত। যেকোন মুহূর্তে সে তার উপস্থিতি ঘোষণা করবে। নারী এই মুহূর্তে জননী, অন্য কোন ভূমিকায় তাকে দেখতে চাইলে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিৎ দৃশ্য জন্ম নেবে।'

শান্তার কথা শোনামাত্র নবীন সন্ন্যাসী আবিষ্কার করল তার শরীরে আর কোন উন্মাদনা নেই। বরং হৃদয়ে যেন নরম আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে তিরতিরিয়ে। সে ধীরে ধীরে শান্তার স্ফীত উদরে একটি হাত রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উদরের ভেতরে এই স্পর্শের প্রতিবাদে কেউ যেন নড়ে উঠল। চকিতে হাত সরিয়ে নবীন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি আমার?'

শান্তা নীরবে মাথা নাড়ল।

নবীন সন্ন্যাসী খানিকটা স্বগত উচ্চারণ করল, 'কিন্তু কি করে বুঝব।'

'মানে ?' প্রায় আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল শান্তার কণ্ঠ থেকে।

নবীন সন্ন্যাসী সন্ত্রস্ত হল, 'তুমি উত্তেজিতা হয়ো না। আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি ?'

'হ্যাঁ। শোন, পুরুষের আনন্দ নারী লালিত করে নতুন রূপ দেয়। অতএব শিশু জন্মানো মাত্র নারীর কাছেই আশ্রয় চায়। পুরুষের সেখানে কোন ভূমিকা নেই। এই সত্য ঠিক জেনো যা নারী নির্ধারণ করে। মূর্খ পুরুষমাত্র সেই সত্যে অবিশ্বাসী হয়ে দগ্ধ হয়। তুমি বুদ্ধিমান, কিন্তু অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বত্র সমীচীন নয়।'

গত রাত থেকে রাজকুমারী শান্তার দর্শন পাচ্ছিল না নবীন সন্ন্যাসী। যন্ত্রণাকাতর শান্তাকে নিয়ে গিয়েছে ধাত্রীরা। এখন পর্যন্ত সেই যন্ত্রণার উপশম হবার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছিল সে। তার সন্তান পৃথিবীতে আসছে যদিও সে বুঝতে পারছে না এই ব্যাপারে তার ঠিক কি ভূমিকা ছিল কিন্তু তবু তার শিহরণ হচ্ছে।

অবশ্য ফিরে আসার পর সে শান্তাকে কখনও আগের মত করে পায়নি। সেই উন্মাদনা, যৌবনের রকমারি বাহার—সবই এবার অনুপস্থিত ছিল। সঞ্চিত আনন্দের বোঝা একটি নারীকে কিরকম পরিবর্তিত করে দেয় তা দেখে সে হতবাক হয়েছিল। ওই শরীরের কিছুই যেন তার জন্যে অবশিষ্ট নেই, সবই অনাগত সন্তানের জন্যে নিবেদিত। সে মাঝে মাঝে ঈর্ষা অনুভব করেছে। শান্তা যেন তাকে উপেক্ষা করছে। কিন্তু এসব ভাবনা সে প্রকাশ করেনি। যেমনভাবে বেশঘোষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সে শান্তাকে বলেনি। এখন কোন কথা বলা উচিত তার কিছুটা বোধ সে রপ্ত করেছে।

এই সময় দাসী এসে জানাল মহারাজ তার দর্শনপ্রার্থী। সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই মহারাজের দর্শন পেল। ব্যস্ত পায়ে মহারাজা এগিয়ে এসে বললেন, 'এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি মহর্ষি বিভাণ্ডক নগরীর দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু, কিন্তু— ।' মহারাজা ইতস্তত করছিলেন।

'কিন্তু ?' নবীন সন্ন্যাসী তার চঞ্চলতা গোপন করতে চেষ্টা করল।

'কিন্তু তিনি পুত্রের সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমাকে দেখলে খুশি নাও হতে পারেন।'

'তিনি যখন আসছেন তখন আমাকে দেখা করতেই হবে। তবে আমাদের সাক্ষাতের সময় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কাম্য নয়। সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এই কথাটা। আর হ্যাঁ, গোপগণের সঙ্গে অবস্থানকালে পিতৃদেব যেসব সেবায় অভ্যস্ত হয়েছেন তার বহুগুণ উৎকৃষ্ট সেবার আয়োজন করুন। আমি যাচ্ছি।'

'কিন্তু ঋষিপুত্র, মহর্ষি বিভাণ্ডক কি শৃঙ্গচ্যুত ললাট দেখলে খুশি হবেন ?'

'আমি জানি না।'

'যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার নির্দেশে তৈরি কৃত্রিম শৃঙ্গ ললাটে স্থাপন করলে এই যাত্রায় তাঁক বিভ্রান্ত করা যেতে পারে।'

কিন্তু সে সময় পাওয়া গেল না। দ্বারী ঘোষণা করল মহর্ষি বিভাণ্ডক রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজা ব্যস্ত চরণে আপ্যায়ন এবং

অন্যান্য আদেশ দেবার জন্যে চলে গেলেন। নবীন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। দুই জানুতে যেন বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। সে শেষ পর্যন্ত গতি দ্রুত করল। এর দ্বারা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পিতৃদেবকে দেখামাত্র সে স্থির হয়ে গেল।

মহর্ষি বিভাণ্ডক ধীরে ধীরে রথ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তাঁর উধর্বাঙ্গ অনাবৃত, পরনে বল্কল। কিন্তু শরীরে কিঞ্চিৎ সাশ্রয়ের চিহ্ন পরিস্ফুটিত। তিনি দণ্ডায়মান পুত্রের দিকে প্রবল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন। এ তিনি কাকে দেখছেন ? এই কি সেই পুত্র, যাকে তিনি তিল তিল করে লালন করেছেন ? তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সেই শৃঙ্গ কোথায় ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি ?'

তার কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ মেশানো একটি শব্দ ছিটকে উঠল, 'পিতা।'

মহর্ষি বিভাণ্ডক দ্রুত এগিয়ে এলেন। তিনি যেন তাঁর দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। খানিকক্ষণ অবলোকনের পর তিনি শুনলেন, 'পিতা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি, আমি আপনার পুত্র।'

বিভাণ্ডক মাথা নাড়লেন, 'পুত্রই বটে। কিন্তু এ কি দশা তোমার ? যে মানুষের পরিচয় তার শৃঙ্গের মাধ্যমে, বিশ্বের তাবৎ মানুষের থেকে যে নিজেকে আলাদা করে নিতে পেরেছিল যে কারণে, তোমার সেই শৃঙ্গটি কোথায় ?'

সে ললাটে হাত বোলাল। আগে যে কোন সমস্যায় পড়লে এখানে হাত রাখলে চিত্ত স্থির হতো। এখন শৃঙ্গই যখন নেই। সে বলল, 'যিনি আমাকে ওটি দিয়েছিলেন তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিশ্বের সমস্ত মানুষদের থেকে আমি আলাদা হয়ে থাকতে চাই না। আমি তাদের মতই হতে চাই।'

'চমৎকার। এ আমি কার সঙ্গে কথা বলছি ?' মহর্ষির মুখে ধীরে ধীরে রক্ত জমছিল, 'আমি কেন এতটা দীর্ঘ পথ ছুটে এসেছি জানো ? সাবালক পুত্র অবাধ্য হলে পিতার কর্তব্য তাকে ত্যাগ করা। কিন্তু আমি পারিনি। কেন ?'

'আমি জানি না পিতা।' সে দূরে যেন মেঘের জন্ম দেখল।

'এতদিন তুমি বল্কল পরতে। সন্ন্যাসীর সমস্ত লক্ষণ তোমার অঙ্গে দেখতে পেতাম। এখন তোমার অঙ্গে প্রায় রাজবেশ, ভোগীর চিহ্ন শরীরে স্পষ্ট। বলতে পারো, এই রকম পরিণতির জন্যেই কি আমি তোমাকে তিল তিল করে বড় করেছি ?' মহর্ষি বিভাণ্ডক শেষ দিকে চিৎকার করে উঠলেন।

সে ত্রস্তস্বরে বলল, 'পিতৃদেব আপনি শান্ত হন।'

'কেন তুমি আমাকে না জানিয়ে আশ্রম ত্যাগ করে জলপথে পালিয়ে এসেছ ?'

মুহূর্তেই তার মনে একটি চিন্তা খেলে গেল। পিতৃদেব অন্তর্যামী নন। সে স্বচ্ছন্দে বলল, 'আপনি আশ্রমে ছিলেন না। এই অঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে বরুণদেব বারিবর্ষণ বন্ধ রেখেছিলেন দীর্ঘকাল। সহস্র সহস্র মানুষ অনাহারে কষ্ট পাচ্ছিল সেই অবিবেচক দেবতার খামখেয়ালিতে। ফসল নেই, একমাত্র কৌশকী ছাড়া কোথাও জল নেই। এরা আমার সাহায্য চাইল। আমি ওদের সাহায্য করার জন্যে এসেছি।'

বিভাণ্ডক একটু হতভম্ব হলেন। পুত্র যে এত সুন্দর একটি যুক্তি তাঁর সামনে

উপস্থাপন করবে তা তিনি কল্পনা করেননি। তিনি বললেন, 'তোমার ওই আচরণের মাধ্যমে তুমি দেবতাকে অসন্তুষ্ট করেছ?'

নবীন সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল, 'তাতে কিছু ভাবনার নেই। কারণ আমি সেই দেবতার স্রষ্টার উপাসক।'

'বটে!' বিভাণ্ডক অধর দংশন করলেন, 'কারা তোমাকে এখানে এনেছে?'

'কয়েকটি নিপীড়িতা রমণী যারা জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল।'

'মিথ্যে কথা। তাদের দেখে কামার্ত হয়ে তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছিলে।'

সে দুটো হাত মাথার ওপরে তুলল, 'ঈশ্বরের সমস্ত অভিশাপ এক হয়ে আমার ওপরে নেমে আসুক যদি একথা মিথ্যে হয় যে আমি সেই রমণীদের সঙ্গে শরীরের আনন্দ বিনিময় করেছিলাম।'

পুত্রের কথা বলার ধরন দেখে বিভাণ্ডক কোন কূল পাচ্ছিলেন না। এত দ্রুত কি করে সেই কিশোর নিজেকে দক্ষ করে তুলল? তিনি তবু বলতে চেষ্টা করলেন, 'বেশ। এখানে তোমার কাজ শেষ হওয়ামাত্র অরণ্যে ফিরলে না কেন?'

নবীন সন্ন্যাসী মুখ নামাল, 'আপনি একদা বলেছিলেন কারো জন্যে অর্চনা করলে সে যে দক্ষিণা দেয় তা গ্রহণ করা পবিত্র কাজ। মহারাজ লোমপাদ স্বেচ্ছায় তাঁর কন্যা শান্তাকে অর্পণ করেছেন আমার হাতে। সেই দান গ্রহণ করে আমার কর্তব্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি অরণ্যে ফিরে যেতে পারছিলাম না। কিন্তু কেবলই মনে হত—।'

'দাঁড়াও। তুমি তোমার কৌমার্য নষ্ট করেছ?'

'পিতা। নষ্ট শব্দটি ব্যবহার করবেন না। আমি অপচয় করিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলেন বিভাণ্ডক, 'তুমি কি আমাকে ইঙ্গিত করছ?'

'আপনাকে, কি ভাবে?' সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

অনেক কষ্টে বিভাণ্ডক নিজেকে সংবরণ করলেন, 'তোমার সন্ধানে আসবার সময় জানলাম বিস্তৃত জনপদভূমি এবং পশুদের তুমি অধিকার করেছ। কেন?'

'আপনার সেবার জন্যে।'

'আমার সেবার জন্যে?'

'হ্যাঁ। আমি জানতাম আপনি ওই পথে আসবেন। তাই আপনার যাতে সুখাদ্যের অভাব না হয়, বিশ্রামের জন্যে আরামদায়ক শয্যা ঠিক থাকে, সুন্দরী দাসীদের বীজনে যেন আপনি তৃপ্তি পান তার কারণেই ওই সব মানুষ-পশু-ভূমির অধিকারী হতে হয়েছে। আপনি বলতেন প্রতিটি দেশের নিজস্ব নিয়ম আছে। অরণ্যের আশ্রমে আমরা যে ক্লেশে থাকি তা কেন জনপদে এসে করব। পিতৃদেব, আপনার শরীর যে তা স্বীকার করছে এখন আপনাকে দেখলেই তা বোঝা যায়।' সে হাসল।

বিভাণ্ডক মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি ঠিকঠাক ক্রুদ্ধ হচ্ছেন না কেন? গত রাত্রে যে সুন্দরী দাসীটি তাঁর পদসেবা করছিল তাকে দেখে অপ্সরা উর্বশীর স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হয়েছিল বলে কি কিঞ্চিৎ তপঃক্ষয় ঘটেছে। তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু সেই ভাব কাটাতে বললেন, 'তুমি অরণ্যে ফিরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ পিতা। আমি আপনার সন্ধানে সেখানে গিয়েছিলাম।'

'কি দেখলে?'

'আপনার বিরহে কুরঙ্গী স্তব্ধ ছিল। তরুলতারা অসাড় হয়ে পড়েছিল। আমি সর্বত্র আপনাকে সন্ধান করে যখন ক্লান্ত তখন কুরঙ্গী ইশারায় জানাল আপনি পর্বত অতিক্রম করে গেছেন। অরণ্যেরও ফল বিস্বাদ হয়ে গেছে।'

'তা হলে তুমি আহার করলে কি!'

'বড় কষ্ট হয়েছে পিতা। আপনার কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, অরণ্যে যে সমস্ত খাদ্যবস্তুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না এখানে এসে তার স্বাদ পেয়ে আর পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। পিতা, আপনার কি এখানে স্বাদের পরিবর্তন ঘটেনি?'

'ঘটেছে। তবে তোমার বয়স অল্প, মানাতে পারো না।'

'অতএব আমি ওখানে প্রায় অভুক্তই ছিলাম। আসলে আপনার জন্যে শোক এত প্রবল ছিল যে ক্রন্দন ক্ষুধা ভুলিয়ে রেখেছিল।'

এবার মহর্ষি বিভাণ্ডক ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন, 'পুত্র, তোমার শৃঙ্গ কি কাজের পর চ্যুত হয়েছে?'

নবীন সন্ন্যাসী বলল, 'আসলে শৃঙ্গটি জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেটি চ্যুত হয়েছে পিতা। চ্যুত হয়ে ভালই হয়েছে।'

মহর্ষি বললেন, 'সবই শুনলাম। কিন্তু তুমি আমাকে না জানিয়ে তস্করের মত চলে এসে যে অন্যায় করেছ, যে কারণে আমি এত দূরে ছুটে এসেছি তা অবহেলা করার নয়। তুমি একদা আমার কাছে যে অভিশাপ প্রার্থনা করেছিলে তা মনে আছে?'

'আছে পিতা।'

'অভিশাপের ফল তুমি কি ভোগ করছ?'

'না পিতা।'

'অজ্ঞত্ব অনেক সময় দুঃখবোধকে আড়াল করে। বস্তুত সেই কারণেই মানুষ সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। তুমি সেই শ্রেণীতে পড়েছ। এতদিন তোমার ললাটে বিধাতাপ্রোথিত শৃঙ্গ ছিল। ওই শৃঙ্গ তোমাকে বিশেষ সারল্য দিয়েছিল। আজ আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার নবশৃঙ্গ জাগ্রত হোক। যে ভোগসুখে তুমি এখন অবগাহন করছ এই শৃঙ্গ চিরকাল তাতে অতৃপ্তি আনবে। তোমার ললাটেই শুধু এই শৃঙ্গ দৃশ্যমান হবে কিন্তু তোমার উত্তরাধিকারীদের ললাটে তা অদৃশ্য থাকবে। আমি চলি।' বিভাণ্ডক রথের দিকে পা বাড়ালেন।

নবীন সন্ন্যাসী ললাটে হাত দিয়ে শিহরিত হল। ইতিমধ্যে দুমুখী একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সেখানে জাগরিত হচ্ছে। সে আর্তনাদ করল, 'পিতৃদেব, আপনি এ কি করলেন? আমি যে সম্পূর্ণ মানুষ হতে চেয়েছিলাম।'

মহর্ষি বিভাণ্ডক কথা বললেন না। নবীন সন্ন্যাসী দ্রুত তাঁর কাছে এল, 'দয়া করে আপনি এখনই ফিরে যাবেন না। অন্তত একদিন বিশ্রাম নিন।'

'না। আমি কুরঙ্গীর কথা বিস্মরিত হয়েছিলাম। আমি না ফিরলে সে অভুক্ত থাকবে। তোমার কারণে তাকে কষ্ট দিতে পারি না।'

নবীন সন্ন্যাসীর তৎক্ষণাৎ স্মরণে এল, 'কিন্তু পিতৃদেব, ওই কুরঙ্গী সামান্যা জন্তু নয়। সে শাপগ্রস্তা দেবকন্যা।'
বিভাণ্ডক চমকে উঠলেন, 'এ কথা তুমি জানলে কি করে?'
তরুণ সন্ন্যাসী বলল, 'অরণ্যের ফল স্বাদহীন মনে হওয়ায় আমি গ্রহণ করিনি। পর্বতাতিক্রমের সময় এতই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি যে আশেপাশে কোন ফলের গাছ না পেয়ে— ! আসলে এই নগরে নিত্য মৎস্য মাংস ভক্ষণ করে আমার জিহ্বা যে স্বাদ পেয়েছে তাই বজায় রাখতে আমি মনে করেছিলাম ওই অশক্ত কুরঙ্গীকে বধ করে তার মাংস অগ্নিতে পবিত্র করে নিয়ে ভক্ষণ করব। সেই চেষ্টার সময় কুরঙ্গীর আত্মা আকাশবাণী করে ওই তথ্য জানায়।'
'কি?' মহর্ষি চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি ওই কুরঙ্গীর মাংস খেয়েছ?'
'হ্যাঁ পিতা।'
'মূর্খ। তুমি জানলে না তুমি কি করেছ। এর জন্যে আমি দায়ী। কেন আমি তোমাকে সেই অভিশাপ দিলাম।'
'কি হয়েছে পিতা!'
'বেশ তবে শোন। ওই কুরঙ্গী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। যৌবনের প্রারম্ভে মহাহ্রদের তীরে আমি কঠোর তপস্যা করছিলাম। হঠাৎ একদিন উর্বশী বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে আমার কিঞ্চিৎ দূরে এসে বসেন। তাঁকে দেখামাত্র আমার সমস্ত সংযম ম্লান হয়ে রেতঃপাত হয়। লজ্জিত হয়ে আমি হ্রদে অবগাহন করে পুনরায় তপস্যায় বসি। সেই অরণ্যে একটি শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা কুরঙ্গী হয়েছিল। ভগবান ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন, 'তুমি মৃগী হয়ে তপস্বীপুত্র প্রসব করবে।' হ্রদে জলপান করতে এসে জলের সঙ্গে মিশে থাকা আমার রেতঃ পান করে সেই কুরঙ্গী গর্ভবতী হয়। বিধিবাক্যের অমোঘত্বে তুমি তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলে। হায়, তুমি নিজের জননীকে হত্যা করে উদর পূর্তি করলে।'
বাক্যগুলো শোনামাত্র প্রবল ধিক্কারে নবীন সন্ন্যাসী আর্তনাদ করে উঠল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। সে বিলাপ করছিল, 'আমি মাতৃহন্তা। ঈশ্বর আমাকে নিহত করুন।'
তাই দেখে বিভাণ্ডকের হৃদয় মথিত হল। তিনি বললেন, 'স্থির হও। দুঃখ কি জানতে চেয়েছিলে। সারাজীবন ধরে দুঃখকে বহন করবে তুমি। আমার অভিশাপ বৃথা হয় না। তবে তোমার কাছে পৃথিবী কৃতজ্ঞ হবে। ভগবান তোমার মাধ্যমেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।'
এসব কথা তার কানে যাচ্ছিল না। ছিন্নমূল তরুর মত সে মাটিতে লুটিয়ে ছিল। এই সময় মহারাজ লোমপাদকে আসতে দেখা গেল। তাঁর দুটি হাতে সামনে কিছু ধরা। সামনে এসে তিনি প্রণাম জানিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বললেন, 'হে ঋষি। এই মাত্র আপনার এই পৌত্র জন্মগ্রহণ করেছে। একে আশীর্বাদ করুন।'
'তুমি কে?' মহর্ষি হতবাক।
'আমি লোমপাদ। এই রাজ্যের দায়িত্বে লোকে আমাকে মহারাজা বলে। আমার কন্যা শান্তার পাণিগ্রহণ করে আপনার পুত্র আমাদের ধন্য করেছেন।'
'ও। তুমিই ওকে ভুলিয়ে এখানে এনেছ।' বিভাণ্ডক এগিয়ে এলেন।
'আমাকে আপনি মার্জনা করুন ঋষি।' মহারাজ বললেন।

মহর্ষি এবার পৌত্রের মুখ দর্শন করলেন। শৃঙ্গমুক্ত অতীব সুশ্রী, দেখলেই
হ্র প্রশান্তিতে ভরে যায়। মুহূর্তে মহর্ষি বিভাণ্ডকের হৃদয় থেকে সমস্ত ক্রোধ
াও হয়ে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে পুত্রকে ডাকলেন, 'ওখান থেকে উঠে
ন।'

নবীন সন্ন্যাসীর কানে মহারাজার কোন কথাই যায়নি। সমস্ত জগৎ যেন তার
ছ বধির হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ডাকে তার চৈতন্য ফিরল। সে ধীরে ধীরে
ঠ কাছে যেতে বিভাণ্ডক বললেন, 'লক্ষ করো। কি পবিত্র এ। এই পুত্রকে
ন করে, ভূপতির সমস্ত প্রিয় কাজ সর্বপ্রযত্নে সম্পাদনা করে তুমি কাননে
রে যাবে। তোমার আহৃত পাপের শাস্তি তোমাকে এ জন্মেই পেতে হবে।
তদিন তুমি যে দুঃখ পাবে তা পূর্ণ হবে এই শিশু সাবালক হলে। এই সংসার
ন তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে তখনই দুঃখের স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আমি
লাম।'

মহারাজা লোমপাদ বললেন, 'হে ঋষি, আপনি পুত্রবধূর মুখ দর্শন করবেন
?'

বিভাণ্ডক বললেন, 'তিনি সৌদামিনীর মত শোভমানা হন। শচী যেমন ইন্দ্রের
বর্তিনী, নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদগলের সহচারিণী, হে নৃপ আপনার তনয়া
ই রকম আমার পুত্রের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী যেন হয়। এই স্থানে আমি আর
কতে পারছি না। ওই শিশুর শরীর থেকে ক্রমাগত স্নেহের পাশ নির্গত হচ্ছে।
ৎসল্যবোধ অত্যন্ত শক্তিশালী। আমার পুত্র তার শিকার হোক।'

নবীন সন্ন্যাসী তখন মুগ্ধ চোখে শিশুর মুখ দর্শন করছিল। সমস্ত জগৎ
সার, একটু আগের অর্জিত শোক সে বিস্মরিত হয়েছিল এই মুহূর্তে। সে
বিষ্ট গলায় প্রশ্ন করল, 'এ কে?'

বিভাণ্ডক যাওয়ার আগে উচ্চারণ করলেন, 'তোমার নবীন বন্ধন, তোমার
ন।'